কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম

অধ্যাপক ড. হাসান জামান

কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম

অধ্যাপক ড. হাসান জামান

জ্ঞান বিতরণী

c
লেখক
জ্ঞান বিতরণী প্রথম প্রকাশ
· একুশে বইমেলা -২০১২
প্রচ্ছদ
আক্কাছ খান
প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম
জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১৭৩৯৬৯
অক্ষর বিন্যাস
শাহীন কম্পিউটার
ইসলামী টাওয়ার (৪র্থ তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মুদ্রণ
জম জম প্রিন্টার
১৫/১ গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন,
লন্ডন, যুক্তরাজ্য
মূল্য
২০০ টাকা U.S $-7.00

Comiunist Shasana Islam Writen By Dr. Hasan Jaman
Translate By Principal Ebrahim Khan
Published By Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitarani, 38/-2ka Banglabazar
Dhaka-1100, Tel : 7173969

ISBN : 984-8747-86-9

উৎসর্গ

আযাদী সংগ্রামে
শহীদ
ককেশাসের অগণিত বীর মুজাহিদের
অমর স্মৃতির
উদ্দেশে

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক বিশিষ্ট গবেষক ও চিন্তাবিদ ড. হাসান জামানের আলোচ্য গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে। প্রথম সংস্করণে এ গ্রন্থের নাম ছিল "কম্যুনিজম ও ইসলাম"।

পরবর্তীকালে দ্বিতীয় সংস্করণে এ গ্রন্থের নাম বদলিয়ে বর্তমান নাম *'কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম'* রাখা হয়। এ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনসহ বহু দেশেই কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আজ সে অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে এখন গঠিত হয়েছে অনেকগুলো স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র, যার অনেকগুলো মুসলিম অধ্যুষিত।

তবে এসব রাষ্ট্র স্বাধীন হলেও এসব রাষ্ট্রে এখনও কমিউনিজমের প্রভাব একেবারে মুছে যায়নি।

তাছাড়া চীনে বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি পুনঃপ্রবর্তিত হলেও কমিউনিস্ট পার্টিই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বহাল রয়েছে এবং চীনের মুসলিম অধ্যুষিত সিংকিয়াং প্রদেশে কমিউনিস্ট শাসনের বদৌলতে কীভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার লংঘিত হয় তার খবর আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে মাঝে মধ্যেই জানতে পারছি।

সুতরাং যে নিরিখেই বিচার করা যাক না কেন, সাম্প্রতিক অতীতের ইতিহাস হিসেবে তো বটেই অনেকটা চলমান বর্তমানের বাস্তবতার নিরিখেও এ গ্রন্থের প্রামাদ্দিকতা একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। বহুদিন পর জ্ঞান বিতরণীর জনাব সহিদুল ইসলাম এ গ্রন্থ প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন জেনে আমি খুশী হয়েছি। অতীতের মত এ সংস্করণও পাঠক সমাজের সুদৃষ্টি লাভে ধন্য হবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা
০৫-০১-২০১২

আবদুল গফুর
ফিচার সম্পাদক

সূচিপত্র

গোড়ার কথা

কমিউনিস্ট শাসনে মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। সোভিয়েত প্রকাশিত বই-পুস্তকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। আর এগুলোকে ভিত্তি করেই প্রধানতঃ এই আলোচনায় নামা সম্ভব হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা উদ্‌ঘাটনের খাতিরে অন্যান্য অনেক বই দেখতে হয়েছে, কিন্তু সে-সব বই-এর মন্তব্য অনিবার্যভাবে গ্রহণ করা হয়নি। রুশ মুসলিম মুহাজিরদের কাছ-থেকে-পাওয়া তথ্য সব সময়েই ব্যবহার করা হয়েছে।

বাইরের মুসলমানদের অভিজ্ঞতা স্বল্প-বিশেষ করে সোভিয়েট শাসন সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও সোভিয়েট প্রোপাগাণ্ডা তাদের মনে অহেতুক সম্মোহনের সৃষ্টি করে থাকে। তাই প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করবার গুরুত্ব সমধিক। এর ফলে যে কেবল সোভিয়েট মুসলিমের স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার হবে তাই নয়, বাইরের দুনিয়ার মুসলমানরাও আসল ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন ও সেই অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবন গঠন করবার সময়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে পারবেন। স্বাধীনতার বাণী ও নিজস্ব জীবদর্শন সম্পর্কেও মুসলিম জনসাধারণ সচেতন ও সজাগ হতে পারবেন।

জাতীয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে রাশিয়া যে রীতি অনুসরণ করেছে, তা কার্যতঃ পারস্পরিক সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। এ নীতি অনুসৃত হবার ফলে রুশ সাম্রাজ্যবাদ বিলুপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, অনেকগুলো অধীন জাতির ওপর সাম্রাজ্যবাদী স্টীমরোলার জোরেসোরে চেপে বসেছে। ধনসম্পদের মোটা অংক খোদ রুশ এলাকাগুলোই আত্মসাৎ করে নেয়। জে. এ. হবসন তাঁর "The Open Door" শীর্ষক প্রবন্ধে (C. R. Buxton. Towards a Lasting Settlement, London, 1916. P 100) সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন, তা সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও প্রয়োগ করা চলে। তিনি

বলেছিলেন ঃ রাজনীতি ও বাণিজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতায় সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার লাভ করে।

ধর্মের বিলোপসাধন করা যে কমিউনিস্টদের লক্ষ্য, তা তাদের ঘোষণা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। মার্কস ও লেনিনের ঘোষণাতেই একথার হদিস মেলে। সমগ্র সাংস্কৃতিক কাঠামোকে নাস্তিক্যবাদীরূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে কমিউনিস্ট রাশিয়াতে। আনাতোল লুনাকারস্কী বলেন (Anatole Lunacharsky. Pravda, March 25, 1929) ঃ কমিউনিস্ট রাশিয়ায় শিক্ষককে নাস্তিক হতেই হবে। এ সামাজিক ব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসী শিক্ষকের কথা চিন্তাই করা যায় না। মোল্লাদেরকে পয়সা দেবার (পুরোহিততন্ত্র ধর্ম?) আর কেউ নেই। তাই কোরান পড়বার মত বড় একটা কেউ নেই। সম্প্রতি সোভিয়েট লেখকগণ একথা খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন। (Yefremov and Gabarov : The Land of Soviets : Muslims in the Soviet Union, Moscow, 1959, P 15) এঁরা স্বীকার করেছেন যে, অনেকগুলো মসজিদকে নাট্যশালা ও নৃত্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। যুদ্ধের পর এর কিছু কিছু ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিপ্লবের পর লেনিন মুসলমানদেরকে এক আশ্বাসবাণী দেন। হযরত উসমানের কোরান শরীফ মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। অবশ্য লেনিনের ঘোষণায় আশ্বস্ত হয়ে তাস্‌কেন্তের মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রাচ্যের সমস্ত মুসলিম জাতির প্রতি এক আবেদন জানান (১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৪) ঃ

"মুসলমান জাতিগণ, আপনারা সোভিয়েট দেশের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরান। এখানে অনেক স্বাধীন মুসলিম জাতি বাস করেন। সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এসব জাতির উন্নয়ন অবরুদ্ধ ছিল। আজ সোভিয়েট সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলমানদের উন্নয়নে সাহায্য করছেন।"

ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে কিন্তু এসব আশ্বাসবাণী হারিয়ে যায়। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আওতায় ১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বাকুতে এক বিখ্যাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রাচ্যের প্রধান কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়েছিলেন। এ সম্মেলনের সভাপতি জিনভিয়েভ (Zinoviev) ধর্মবিরোধী অভিযান শুরু করেন। বাকু ম্যানিফেস্টোতে ঘোষণা করা হয়, মুসলমানদেরকে আজ রসূলের

(স.) নিশান পরিত্যাগ করে লালপতাকার তলে সমবেত হবার জন্য আহ্বান জানান হচ্ছে। ইসলামের স্থানে কমিনটার্ন, রসূলের (স.) জায়গায় লেনিন ও মস্কো-লেনিনগ্রাদকে নতুন মক্কা-মদিনা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়। "ধর্মীয় শপথ বে-আইনী হয়েছে। আইনের চোখে মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির কোনও মর্যাদা নেই।"

কমিউনিস্ট চীনেও অবস্থার বিশেষ কোন ব্যতিক্রম নেই। যে-সব তথা-কথিত "ইসলামী" প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে, সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ। মুসলিম ক্ল্যাসিক ইন্‌সটিটিউটকে কমিউনিজ্‌ম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ওয়াং কেং নামক জনৈক চীনা কমিউনিস্ট বলেছেন ঃ যেসব আচার-ব্যবহার ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কমিউনিজ্‌মের সাথে সংগতি রক্ষা করে, কেবল সেগুলোই স্বীকার করা হবে (৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮)। কমিউনিস্টরা যা হুকুম করবে, তা পালন করবার পরই ধর্মীয় "স্বাধীনতা" স্বীকার করা হবে। চীনা "ইস্‌লামী" সমিতির কাজ হচ্ছে ইস্‌লামের প্রকৃত প্রভাব ক্রমে ক্রমে ক্ষীয়মাণ করে আনা। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত চীনা বৌদ্ধ সমিতির কর্তব্য হচ্ছে কমিউনিজ্‌মের প্রচার করা।

মুসলমানদেরকে বাগে আনার জন্য "The Central Bureau of the Muslim Organization of the Russian Communist Party" গঠন করা হয়। সোভিয়েট প্রচার দফতর থেকে বলা হয় যে, জারের আমলে কোন উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় ছিল না, এখন অনেকগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু তুর্কীস্তান তথা সমগ্র মুসলিম এলাকাগুলোতে যেভাবে আযাদী আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছিল, তাতে আসল ছবিটা ধরা পড়ে যায়। ১৮৯৮ সাল থেকেই এ আন্দোলন দানা বেঁধেছিল দুক্‌টি ইশানের নেতৃত্বে। ১৯১৬ সালে মারদিকার বিদ্রোহ দানা বাঁধে। আবদুল গাফ্‌ফার ছিলেন এ বিদ্রোহের নেতা। রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব থেকেই 'জাদিদ' বা আধুনিক দল শরিয়তের সংশোধনের মাধ্যমে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হন। অতঃপর মুস্তাফা চোকাই-এর নেতৃত্বে "মিল্লিজে তুর্কীস্তান বিরলিগা" তুর্কিস্তানের জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়। উজবেক-কাজাক-তাজিক, তুর্কী ও কিরঘিজগণ এ দলে সমবেত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইনি জার্মানীতে চলে আসেন ও সেখানে বহু মধ্য-এশীয় মুসলমান ড্রেসডেন ও গটিংঙ্গেনে আযাদী আন্দোলনের বিষয়ে বিবিধ শিক্ষালাভ

করেন। পরে মুস্তাফা চোকাই প্যারিসে আসেন। তাঁর মৃত্যুর পর কাইয়ুম খাঁ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

মুস্তাফা চোকাই-এর নেতৃত্বে কোকন্দে যে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয় (ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮), সেটা মাত্র দুইমাস টিকেছিল। আলাশওরদা বা কাজাকিস্তানেও একটা আযাদ কমিটি গঠিত হয়েছিল, তবে এর মধ্যে বাশকুর্দেই স্বাধীনতা অনেকদিন টিকে ছিল।

গোটা মধ্য-এশিয়ার জামাল পাশা ও আনোয়ার পাশার নেতৃত্বে বিরাট বাস্‌মাকী আন্দোলন গড়ে ওঠে। মধ্য-এশিয়ার সবগুলো জাতিকে সংঘবদ্ধ করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। "ইসলামী বিপ্লবী লীগ" গঠন করে যে সংস্থা গড়ে ওঠে, তা পাক-ভারত উপমহাদেশকে ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল।

বাকু ও অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা সহজেই বুঝতে পারলেন যে, কমিউনিস্ট প্রদত্ত স্বাধীনতার বাণী কতখানি ভুয়া ও ফাঁকা। বাকুতে মুসাওয়াত পার্টির ছিল সংখ্যাগুরুত্ব ও কমিউনিস্ট পার্টিতে জনগণের সংখ্যা নিতান্ত কম বললেও বেশি বলা হয়। এই অবস্থায় জোর করে সর্বত্র কমিউনিজ্‌মের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ভিন্নপন্থী ব্যক্তিদেরকে হয় অপসৃত করা হয়েছে, নয় গুলী করে হত্যা করা হয়েছে।

উজবেকিস্তানকে এমন করে গঠন করা হয়, যাতে এ প্রদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে। উজবেক নেতা খোজায়েভকে স্বাধীন মনোভাবের জন্য হত্যা করা হয় (১৯৩৭)। ইনি ঔজবেক উযীর সভার সভাপতি ছিলেন। উজবেক কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী ইকরামভেরও এই একই অবস্থা হয়।

দাগিস্তানে বীরনেতা শামিলের বীরত্ব এক জ্বলন্ত উত্তরাধিকার বহন করেছে দাগিস্তানীদের জন্য। সোভিয়েট শাসনের পূর্বেই এখানে ৮০০টি ধর্মীয় বিদ্যালয় ছিল। এ প্রভাব দূর করার জন্য পরোক্ষভাবে নানা ফন্দিফিকির উদ্ভাবিত হয়েছে।

বাশকীরদের স্বাধীনতার ঐতিহ্য অষ্টাদশ শতকের। বাতিরশা (১৭৫৫) ও সালাওয়াত ইউলায়েভের (১৭৩৩) নাম সর্বজনবিদিত। সোভিয়েটের সুবিধামত বাশকীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ও এখানে কমিউনিস্ট নাগপাশ জোরদার করার জন্য ভেলিদভকে পাঠানো হয়। বাশকীর নেতা আহমদ জাকী বে স্বনামধন্য বিপ্লবী নেতা আনোয়ার পাশার সহায়তায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করেন ও বাশকীর "গণতন্ত্র"-কে তুর্কী জাতীয়তার ভিত্তিমূলরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তুর্কমেনগণ বহুদিন ধরে "বৃহৎ তুর্কমেনিস্তানের" জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। গোড়া থেকেই সোভিয়েট সর্বাত্মকবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। বোরিয়েভ ও মুরাদ ওরাজভ 'তুর্কমেনী আযাদী' (তুর্কমেন আজাত লিগি) নাম দিয়ে পার্টি গঠন করেন। বারদি কারবাবাইয়েভ প্রমুখ কবিগণ তুর্কমেন ঐতিহ্যের মধ্যে বিশেষ অগ্রগণ্য।

কাজাক জাতীয়তাবাদের উত্তরাধিকার এসেছে প্রধানতঃ কাজাক খাঁ কেনেসারী থেকে। সোভিয়েটগণ কাজাকদেরকে কবলে আনার জন্য ওরেনবার্গ থেকে রাজধানী অপসারিত করে 'কিযিলওরদা"তে নিয়ে গেছে। পূর্বে কিযিলওরদার ছিল "আক মেসেদ" বা শ্বেত মস্‌জিদ। এর নতুন নাম দেয়া হয়েছে "কিযিলওরদা" বা "লাল রাজধানী"। স্বাধীন মনোভংগীর জন্য আলমা আতা বিজ্ঞান আকাদমীর সভাপতি সাতপাইয়েভকে হত্যা করা হয়েছে (১৯৫১)।

তুর্কিস্তানের মত তাজিকিস্তানেও কমিউনিস্ট শাসকগণ বিশেষ একটি নীতি অনুসরণ করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে আফগানিস্তানে ও পাক-ভারতে অনেক তাজিক বসবাস করেন। এজন্য তাজিকিস্তানকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রচারণার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাজিকিস্তানে যে বাস্‌মাকী আন্দোলনের দানা বেঁধে উঠেছিল, তা ১৯২৬ সাল অবধি কার্যকরী ছিল। তাজিকিস্তানী স্বাতন্ত্র্যের কথা প্রথমে তুলে ধরেছিলেন নসরতউল্লাহ্ মাক্‌সুম (সভাপতি) ও আবদুর রহীম খোজাইয়েভ (উযীরে আলা)। পরবর্তীকালে শোতেমর (সভাপতি) ও আবদুল্লাহ্ রহীম বাইয়েভ প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনা করেন।

কিরঘিজ অঞ্চলে বড় বড় রুশ কলোনী গড়ে উঠেছে। রাজধানীর নাম দেয়া হয়েছে রুশ ধরনে—মাইকেলফ্রুনযের নামে। ফ্রুনয এক ঔপনিবেশিক পরিবারের লোক ছিলেন। কিরঘিজ অঞ্চলকে রুশপ্রবণ করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর কাজ। প্রাচ্যে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত করার দিক থেকে কমিউনিস্টদের কাছে কিরঘিজ অঞ্চলের গুরুত্ব ছিল সমধিক।

আযরবাইজানে কমিউনিস্ট বিপ্লবের পূর্ব হতেই "মুসাওয়াত" বা সাম্য পার্টি কাজ করে আসছিল। মধ্য-এশিয়ার তুর্কী জাতিকে একতাবদ্ধ করে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। আযরবাইজানকে কমিউনিস্ট কবলে আনবার জন্য লেনিন শাউমিয়ান নামক জনৈক ইহুদীকে পাঠিয়ে দেন। শাউমিয়ান হাজার হাজার লোককে হত্যা করে। পরিশেষে আযরবাইজানী নেতা রসূলযাদা,

মুহম্মদ আমীন ও ফতেহ্ আলী খাঁকেও হত্যা করা হয়। আযরবাইজানের প্রতিরোধ আন্দোলনের ঐতিহ্য উনবিংশ শতাব্দীর।

১৮০৫ থেকে ১৮২২ অবধি রাশিয়া আযরবাইজানের বিভিন্ন শহর দখল করে নেয়। জাবিদ খাঁ যেভাবে রুশ আক্রমণ প্রতিহত করেন, তাতে তিনি জাতীয় বীরের সম্মান পান। অতঃপর ইরানের আব্বাস মির্জা আযরবাইজানী তুর্কীদের সহায়তায় রুশদের হটিয়ে দিয়ে ১৮২৪ সালে শেরওয়ান ও বাকু দখল করেন। কিন্তু ১৮২৮ সালে তিনি পরাজিত হবার ফলে আযরবাইজান রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে বিভক্ত হয়।

রুশবিপ্লবের পর ১৯১৭ সালে ক্রিমিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই কমিউনিস্ট সৈন্য ক্রিমিয়া অবরোধ করে ক্রিমীয় গণতন্ত্রের সভাপতিকে হত্যা করে। ১৯২০ সালে হাঙ্গেরীয় ইহুদী বেলাকুন সোভিয়েট সৈন্যের নেতারূপে ক্রিমিয়ায় প্রবেশ করে ও সত্তর হাজার মুসলমানকে হত্যা করে।

দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সময় থেকে ক্রিমিয়া রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রে (Protectorate) পরিণত হয় (১৭৭৪) ও ১৭৮৩ সালে ক্রিমিয়া সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার করতলগত হয়। সে অবধি ক্রিমিয়া থেকে অগণিত তাতারকে নানা জায়গায় চালান দেয়া শুরু হয়। ফলে ১৭৮৪ সালেই কমপক্ষে ৩ লক্ষ তাতার তুরস্কে হিজরত করেন। ১৮৭৫ সালে তুরস্কে ১৮ হাজার তাতার মুসলমান আগমন করেন।

সমগ্র ক্রিমিয়ায় প্যান-তুর্কীবাদের প্রেরণা যোগান ইসমাঈল বে গ্যাস-পিলিন্স্কি তাঁর "তারজুমান" পত্রিকার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে ক্রিমীয় তাতার দল "মিল্লি ফিরকা" সংগঠিত হয়। সোভিয়েট ফৌজ এই দল ভেঙ্গে দেয় এবং তাতার জাতীয়তাবাদের একচ্ছত্র নেতা ওয়ালী ইবরাহীমভকে বন্দী করে পরে ফাঁসি দেয়া হয় (১৯২৭)।

ইদিল-ইউরাল অঞ্চলে ইসলাম প্রবেশ করে দশম শতাব্দীতে। ৯২১ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম সেলজি খাঁ ইসলাম কবুল করেন ও আব্বাসী খলীফা আল্-মুকতাদির বিল্লাহ্‌র নিকট দূত প্রেরণ করেন। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পর স্বাধীন ইদিল-ইউরাল রাষ্ট্র সংগঠিত হয়। কমিউনিস্টরা এরাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার দুরভিসন্ধি নিয়ে তাতারদেরকে বাশকীরদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয় ও "ফেন-এম দীন" (ধর্ম ও বিজ্ঞান) ও "সুগিশাহান আল্লাসিজ" (সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদী) প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে

ধর্মবিরোধী প্রচারণা চালানো হয়। তবু ধর্মের আবেদন জনগণের হৃদয় হতে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। ১৯২৬ সালে তাতারদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫২.১ জন। ১৯৩৯ সালের গণনায় দেখা যায় যে, এদের সংখ্যা ৪৮.৮ এ দাঁড়িয়েছে ও কেবল রাশিয়ানদের সংখ্যা শতকরা ৪২.৯-এ।

হযরত উসমানের (রা.) সময়ে ককেসিয়া মুসলিম দখলে আসে। খলীফা আবদুল মালিকের সময় ককেসিয়ার জনগণ ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে (১০০ হিজরী)। বিখ্যাত শাম্বাল রাজবংশের শাসনাধীনে ককেসিয়ায় ইসলামী তমদ্দুনের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় "জাবিদ" বা আধুনিক দল শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবী মিলে ককেসিয়ার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন। এ সংগ্রামের ঐতিহ্য অবশ্য কয়েক শতাব্দীর।

ইরানের সাহায্য নিয়ে উত্তর-ককেসিয়ার বীর সন্তানগণ রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকেন। কেউ কেউ রাশিয়ার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কিন্তু শেখ মনসুর সংগ্রাম চালিয়ে যান। আনাবা নামক স্থানে রুশ সৈন্য শেখ সাহেবকে বন্দী করে। ১৬০৪ থেকে ১৮০১ সাল পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে রাশিয়া জর্জিস্তান ও আযরবাইজান দখল করে ও দাগিস্তান অঞ্চল ঘিরে ফেলে। জনসাধারণ গাজী মুহম্মদের নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। পরবর্তী নেতা হামযা খাঁ ও বে-দের শাসন বিলোপ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হামযা মসজিদে নামায পড়ার সময়ে এক আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

পাহাড়ী মানুষদের প্রতিরোধ আন্দোলন ১৭২২ সাল থেকে খুব বেশি দানা বাঁধতে শুরু করে ও ১৮৩৪ সালে শামিল বেগের নেতৃত্বে খুব জোরদার হয়। শামিলের সৈন্যগণ ২ লক্ষ রুশ সৈন্যকে হটিয়ে দেয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মিত্রশক্তি রাশিয়াকে পরাজিত করে। ফলে ককেসিয়ার মুসলমানগণ বড় আশা করেছিলেন যে, ইংরেজ ও ফরাসী সরকার তাঁদের আযাদী আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা প্রেরণ করবে। কিন্তু কোনও সাহায্যই তাদের কাছ থেকে আসেনি। ১৮৩৪ থেকে ১৮৫৯ সাল অবধি শামিল রুশ সৈন্যের সাথে অবিরাম সংগ্রাম করে যান ও বন্দী হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর নিজ পল্লী ও (আউল) মসজিদ রক্ষার জন্য তিনি সংগ্রাম করেন।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর ককেসীয়দেরকে কাবাদীয় চেকেন, সিরকাসিয়ান (চেরকেস), ইংগুশ, ওসেটিন, বলকার ও কারাচাই এসব "জাতিতে" বিভক্ত করা

হয়। তৈলশহর গ্রোযনীর পশ্চাদ্ভূমি থেকে চেকেনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং মানুষ চালান-দেয়া নীতিও অনুসৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান অভিযানকালে রুশ-সরকারের প্রতি বিরোধিতা প্রকট হয়ে ওঠে। কুইবিশেভ ও কাগানোভিচ—এসব মুসলিম বিরোধীদের সাহায্যে স্তালিন তাঁর ককেসীয় নীতি রূপদান করেন।

পূর্ব-তুর্কীস্তান বা সিংকিয়াং এলাকার দিক থেকে ভারতের অর্ধেক হবে ও পাকিস্তানের এলাকায় দশগুণ। এখানে ৪০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ লোকের বাস। পূর্ব-তুর্কীস্তানের শাসক খাকান বুগরা খাঁ ৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কাজাক, উজবেক ও তাতার নিয়ে এখানে শতকরা ৯০ জন মুসলমানের বাস। উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ব-তুর্কীস্তানিগণ স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে ও চীনের একটি অংশে পরিণত হয়। ইসলামী তমদ্দুনের ওপর ভিত্তি করে এদের মধ্যে এক বিরাট চেতনা ও ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে।

১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট শাসনের ফলে ধর্মীয় নেতাগণ তাঁদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ও সংখ্যাগুরু হান চীনাগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনেক হান চীনাকে মুসলিম অধ্যুষিত কানসু অঞ্চলে এনে বসানো হচ্ছে। ফলে হান চীনাদের সাথে স্থানীয় লোকের বিরোধ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অনাহার ও অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বহু তুর্কী মুসলিম পাকিস্তান ও তুরস্কে হিজরত করেছেন। তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের ওপরও হামলা এসেছে। কানসু এলাকার দৈনিক "ল্যানচাউ" পত্রিকায় (২৩ জানুয়ারি, ১৯৫৮) মা চিং মিয়েং বলেছেন, "ধর্মকে রাষ্ট্রের ওপরে মনে করা বে-আইনী।" কোয়াং মিয় পত্রিকায় (১৪ এপ্রিল, ১৯৫৮) বলা হয়েছে, "জাতীয় স্বায়ত্তশাসন কমিউনিজমের অধীনে কাজ করবে।" ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা আজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে; নেন হান জনৈক প্রবাসী চীনার কাছে লিখিত এক পত্রে একথা জানিয়েছেন। (Gopal Mittal : The March of a Conspiracy—National Academy, Delhi).

অবশ্য নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। স্বাতন্ত্র্যের প্রচেষ্টা চলে আসছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ থেকে। ১৯৫৩ সালে পল চিং চাং ও ইউয়ান চাং যির নেতৃত্বে ইস্‌লামী রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা হয়। পূর্বেও অবশ্য এ প্রচেষ্টা হয়েছিল; পাকিস্তান আন্দোলনের দ্বারা এ আন্দোলন

বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মুসলিমদের আযাদীর প্রতিশ্রুতি যেমন একবার চিয়াং কাইসেক দেন, তেমনি ১৯৪৫ সালে দেন মাও সে তুং। পিকিং শহরে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৭০ জন।

তাই দেখা গেল যে, কমিউনিস্ট শাসন সর্বত্র ধর্মীয় জীবনদৃষ্টি ও সংস্কৃতি ধ্বংস করবার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কোকন্দ অধিকার করার সময়ে ১৪ হাজার লোককে হত্যা করা হয়; আর দুর্ভিক্ষে নয় লক্ষ লোক মারা যায়। এর ফলে মুসলিম অঞ্চলে—কাজাক, আলাশওরদা ও উজবেকদের জাতীয় দলগুলো জনসাধারণের মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে (The History of Civil War in the USSR, edited by Gorky, Molotov & others, Tr. Ny. 1938, I, P. 217)

কমিউনিস্ট সেনা কর্তৃক কোকন্দ অধিকার সম্পর্কে লে. কর্নেল পি. টি. এলার্টনের বর্ণনায় (In the Heart of Asia, NY, 1926, P. 153) জানা যায় ঃ

"যতটা নৃশংসভাবে কোকন্দ অধিকৃত ও ভস্মীভূত হয়, তা মধ্যযুগীয় দেশ-জয়ী মুঘলেরও বিস্ময়ের কারণ ছিল। ১৪ হাজারের বেশি লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মসজিদ ও ধর্মস্থানের অবমাননা চরমে পৌঁছে। মুসলিম সাহিত্যের সুন্দর সুন্দর গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেয়া হয় ও অবরোধের ফলে স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাদের মজুদ খাদ্যশস্য এরই মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। কারণ, তার অধিকাংশই কমিউনিস্টগণ বাজেয়াফ্‌ত করে নেয়। ৯ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায়।"

এর ফলেই প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। কোকন্দে মোস্তাফা চোকাই, আলাশওরদায় আলী খাঁ, বু-কে খাঁ।, বাশকুর্দে তোগান ও বোখারায় উসমান খোজা ছিলেন এ আন্দোলনের পেছনে। "তরুণ বোখারা দল" আনোয়ার পাশার সঙ্গে এ জোটে কাজ করে যান। ১৯৩৫ সালে "বলশেভিক" পত্রিকায় (তৃতীয় সংখ্যা ২৩ পৃঃ) একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, অক্টোবর-বিপ্লবের পূর্বে যে-সব স্থানে লোকদের মধ্যে কমিউনিজমের নাম-গন্ধ ছিল না, সেখানে কমিউনিস্ট সংহতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয় গায়ের জোরে।

সত্যিকার জাতীয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার ধ্বংস ও মুসলমানের বিশ্বজনীন সংহতি বিনষ্ট করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। (Yefremov P. 10) ফলে ১৯৩০ সাল

থেকে ১৯৩৭ সাল অবধি বহু রুশ মুসলিম তুরস্ক ও জার্মানীতে হিজরত করেন। ১৯৩৩ সালে যেখানে মুসলিম অঞ্চলে তুর্কীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৭২ জন, সেখানে ১৯৫৬ সালে তা শতকরা ৫৯ জনে দাঁড়িয়েছে। তুর্কমেন, কিরঘিজ ও তুর্কমেনকে যে শুধু আলাদা করা হয়েছে, তাই নয়, তাদের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করে রুশ তাঁবেদারীর স্টীমরোলার চালানো হচ্ছে।

জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের অধিকার শুধু কমিউনিস্ট পার্টির জন্য, আর কারো জন্য নয়। স্তালিন অবশ্য প্রথমদিকে জাতীয় আযাদীর কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু তা ক্রমে ক্রমে "অস্থায়ী" ও "স্থানীয়" স্বায়ত্তশাসনে পর্যবসিত হয়। রুশজাতি ভিন্ন অন্যদেরকে নীচুদরের জাতি (nationality) হিসেবে অভিহিত করা হয়। রাশিয়ায় জাতিগত বিদ্বেষ নেই, কারণ রুশসাম্রাজ্যে সব জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের রুশজাতির মধ্যে যে missionis in ও messianism কাজ করেছে, তা রুশ আধিপত্য বিস্তারে চিরদিনই সাহায্য করে এসেছে। অক্টোবর-বিপ্লব এ প্রবণতাকে নতুনভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। যৌথখামার প্রতিষ্ঠার সময়ে অন্যান্য জাতির মতামত নির্মমভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। কমিউনিস্টগণ জার্মানীর জাতীয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করেছে, কিন্তু পোল্যান্ডকে স্বাধীনতা দিতে চায়নি। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুসলিম জনগণ লেনিনকে সমর্থন জানিয়েছেন, কিন্তু বলশেভিক আধিপত্য ও শ্রেণী সংগ্রামের নীতি মানতে চাননি। তুর্কী নেতা তোগানকে যখন লেনিন লিখলেন যে, প্রতিশ্রুতি পালন করা বিপ্লবীর লক্ষণ নয়, তখন এ ধরনের বিপ্লবী মোনাফেকীতে তোগান রাজী হতে পারেননি। জাতীয় সংস্কৃতিকে যে শুধু কমিউনিস্ট আওতায় আনা হয়েছে, তাই নয়, ধর্মের সাথে জড়িত জাতীয় সংস্কৃতির অংশগুলো জাতীয় সংস্কৃতি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। (Hans Kohu : Nationalism in the Soviet Union, London, 1933, P. 101) সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের ধর্ম সম্পর্কীয় ধারা পাঠ করলেই একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জাতীয় সংহতি ধ্বংস করার জন্য অগণিত ককেসীয় মুসলিমকে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে—জোর করে শ্রমিক ক্যাম্পে এদেরকে ভর্তি করানো হচ্ছে। ক্রিমীয় তাতার ও চেকেন ইংগুশ জাতি এঁদের মধ্যে রয়েছেন। চেকেন ইংগুশ স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ বিলুপ্ত করা হয়েছে, ক্রিমীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশকে ক্রিমীয় অঞ্চলে (oblast) পরিণত করা হয়েছে; আবার কারাচাইদেরকে জর্জীয়

স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের সাথে ও বলকারদেরকে কাবার্দীয়দের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। (Yefremov and Gabarov : The Land of Soviets : Moslems in the Soviet Union, Moscow, 1959, P. 12). ১৯৪৩ সালে কারাচাই ও কালমুকদেরকে চালান দেয়া হয় ও ১৯৪৪ সালে চেকেন ও ইংগুশ জাতিকে চালান দেবার ফলে চেকেন-ইংগুশ রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে বলকারদেরকে অজানা গন্তব্যস্থলে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৮৬৪ সালে প্রিন্স গোরচাকভ মধ্য-এশিয়ায় রুশিয়াকে বে "সভ্যতার মশালধারী"-রূপে চিহ্নিত করেছিলেন, তা বর্তমানের সোভিয়েট রুশীকরণের মাধ্যমেই বাস্তবে "রূপায়িত" হয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত মুসলিম অধিবাসীদের ওপর নির্ভর করে রুশিয়া চীন, ইরান, আফগানিস্তান ও পাক-ভারতের জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে। তুর্কীস্তানকে একাজে সর্বক্ষণ ব্যবহার করা হচ্ছে। ইরান ও আফগানিস্তানের জন্য তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান ও পাক-ভারতের জন্য তাজিকিস্তান, আফগানিস্তানের জন্য উজবেকিস্তান, কিরঘিজ ও কাজাকদেরকে চীনের পশ্চিমাঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের ক্রীড়ানক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রচারণার সূত্র হিসেবেই সোভিয়েট লেখক গুফুরভ মধ্য-এশিয়ার ইরানী ঐতিহ্যকে আধুনিক তাজিক সংস্কৃতির সাথে এক করে দেখেছেন। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ ও কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এই যে, আগের দিনে নিপীড়িতদের অভাব-অভিযোগ পেশ করবার উপায়ের পথ বন্ধ ছিল না, কিন্তু সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদে তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বান্দুং সম্মেলনে অবশ্য, মধ্য-এশিয়ার মুসলিম প্রতিনিধিদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিরূপে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু এসব "প্রতিনিধিদের" আসল স্বরূপ জানতে কারুর বাকী নেই। কমিউনিস্ট শাসনে কোটি কোটি মানুষ জবরদস্তিমূলক শ্রম, অনাহার ও চালান-নীতির কবলে নিষ্পেষিত হয়েছেন। জাতিগুলোর নিয়ন্ত্রণকল্পে যে সোভিয়েট গণশাসন সংস্থা (The Soviet People's Commissariat for Nationalities) রয়েছে, তার মুখপত্র "Zhizn nationalnostei" (Moscow) পত্রিকায় (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২) স্বীকার করা হয় যে, একমাত্র তাতার সাধারণতন্ত্রেই ২০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায় ও ৩,২৬,০০০টি তাতার

শিশু মারা যায়। বাশকীরিয়া জনশূন্য অঞ্চলে পরিণত হয়—মৃতদেহের স্তূপ ছাড়া সেখানে আর কিছুই ছিল না। এসময়ে (১৯২২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককোটি লোকের খাদ্য সরবরাহ করে। ১৯২৬ সালের Large Soviet Encyclopedia-তে এর জন্য শুকরিয়া জানান হয়। ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে সোভিয়েট সরকার হাজার হাজার তাতার বাশকীর ধর্মীয় নেতাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ অবধি ৩০ হাজার তাতার কৃষককে দূরে চালান দেয়া হয়। বাশকীরদের কথা ধরলে এদের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। ট্যাঙ্ক ও গোলাবারুদ নিয়ে অনেক পল্লী ধ্বংস করে দেয়া হয়। এসব চালান-দেয়া হতভাগ্য ব্যক্তিদের অনেকে সাইবেরিয়া ও কাজাকিস্তানের শ্রমিক ক্যাম্পে শীতে, অনাহারে ও অসুখ-বিসুখে মারা যায়।

মধ্য-এশিয়ার মুসলমানদের ইতিহাসকে নানাভাবে বিকৃত করবার অপচেষ্টা করা হয়েছে। জোকরভস্কি প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা জারশাসন ও জারসাম্রাজ্যবাদকে শোষণমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে অভিহিত করেন। কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ ও জোর-জুলুমকে সমর্থন জানাবার জন্য অবশ্য শীঘ্রই এসব ব্যাখ্যার অবসান হলো। জার সাম্রাজ্যবাদ ও দেশ বিজয়কে প্রগতিশীল বলে অভিহিত করা হতে লাগলো। কাজাকিস্তানকে রুশ অধীনে আনয়ন করা প্রগতিশীল বিবর্তন বলে কথিত হলো। কোন রকম বিচার-বিশ্লেষণে না গিয়েই রুশ ধনতন্ত্রবাদকে "সভ্যতার অগ্রগতি" রূপে চিত্রিত করা হলো।(Istoricheskyi Journal, 1943, No. 11-12, PP. 86-87). ইতিহাসের বৃহত্তম পটভূমিকা থেকে মধ্য-এশিয়াকে বাদ দিয়ে কৃত্রিম মনগড়া ইতিহাস লেখা হতে লাগলো। প্যান ইসলাম, প্যান-তুর্কী ও প্যান-ইরান আবেদন উপেক্ষা করেই এসব দেশের ইতিহাস রচিত হলো। আসলে কিন্তু এসব ভাবধারা থেকে মধ্য এশিয়ার ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে বিচ্ছিন্ন করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বৃহৎ সোভিয়েট এনসাইক্লোপেডিয়ায় উত্তর-ককেসাসের গণনেতা শামিল বেগকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রনায়ক হিসেবে চিত্রিত করা হয়; কারণ তিনি জার শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেন আর তাঁর আন্দোলনও মূলতঃ সামন্ততন্ত্র বিরোধী ছিল। তাই শামিলের আন্দোলন "মুরিদবাদ" ছিল গণতন্ত্রকামী ও প্রগতিশীল। Vol. LXI, 1934). ১৯৪৭ সালে যে ইতিহাস সম্মেলন বসে, তাতে এ নীতি পরিবর্তিত হয়। রুশ সাম্রাজ্যবাদ একদিনেই প্রগতিশীল ও গণদরদী ত্রাণকর্তা বনে যায় ও শামিলের আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিহিত করা

হয়। কারণ তাঁর স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল নাকি "নেকড়ে বাঘের স্বাধীনতা"। (Bolshevik, July, 1950), শামিলের আন্দোলন নিছক তুরস্ক ও ইংলন্ডের প্ররোচিত অভ্যুত্থান মাত্র। ফলে ইতিহাসের ব্যাখ্যা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো, যেখানে রুশ বিরোধিতার অপর নাম হলো কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করা।

আযরবাইজানের সাহিত্যিক ঐতিহ্য দ্বাদশ শতকের। কাগানী, শেরওয়ানী ও নিযামী গান্জেভী এ ঐতিহ্যের প্রধান বাহক। আযরবাইজানী লেখক জাফর জাবারলী "আইদীন" নামে একখানি নাটক রচনা করেন। এতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আইদীনের সংগ্রাম যথার্থরূপে চিত্রিত হয়েছে। ১৯৩৪ সালে জাবারলী লেখকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ফলে তাঁকে "অপসৃত" করা হয়। অবশ্য যুদ্ধের পর তাঁর নাটকটি পরিবর্তিত আকারে মঞ্চস্থ হয়। মেথবী, আখভারদভ ও মাহমুদ কুলীযেদ কমিউনিস্ট আদেশ অনুসারে লিখতে বাধ্য হয়েছেন। নিযামীর কবিতাও এই কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দাগিস্তানে আরবীয় সংস্কৃতির বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। সুলায়মান স্টল্স্কি (১৮৬৯-১৯৩৭) ও জাডাসার (১৮৭৪-১৯৫১) আরবি প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁরা আরবিতেই সাহিত্য সাধনা করেছেন। বর্তমানে এ ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত ও অবহেলিত অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে। নতুন কমিউনিস্ট কবি এফেন্দী কাপিয়েভ রুশ ভাষায় কবিতা লিখছেন।

কাজাকিস্তান দখলের ব্যাপারে সোভিয়েট ঐতিহাসিকগণ স্বেচ্ছায় মিলিত হবার (Voluntary Association) নীতি ঘোষণা করেছেন ও চোকান ওয়ালী খানভকে কাজাকিস্তানের সাথে রাশিয়ার বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে দেখানো হচ্ছে। ১৯৪৩ সালে কাজাকদের ইতিহাস বিকৃত করা শুরু হয় ও জারশাসিত রাশিয়াকে দুশমন মনে করার মত ভ্রান্তি আর হতে পারে না, এ কথা বলা হয়। (History of the Kazak S. S. R. 1949).

কিরঘিজরা তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর জোর দিয়েছেন ও 'মানার' আখ্যানকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাঁরা রুশ প্রভুদের সমালোচনায় জর্জরিত হয়েছেন। অধ্যাপক বার্নাসটান ও আব্রানন "কিরঘিজ সংস্কৃতির ভূমিকা" লেখেন। এঁদেরকে এজন্য সমালোচনা করা হয়। কারণ এঁরা দেখান যে, কিরঘিজরা দ্বিধাগ্রস্তভাবে রাশিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করে। তাছাড়া ওরমান খাঁকে রুশ সম্রাট আইভানের সাথে তুলনা করা হয়।

তুর্কীস্তানে ইতিহাস বিকৃতির নয়া অধ্যায়ন রচিত হলো ১৯৫৩ সালে। তুর্কমান এস. এস. আর-এর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি জি. এ. চারইয়েভ অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুর্কমান জাতির সামাজিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার " ওপর এক মনোজ্ঞ পুস্তক রচনা করেন। তুর্কমান ঐতিহ্যকে বড় করবার অপরাধে তাঁকে সুপ্রীম সোভিয়েট প্রেসিডিয়াম থেকে অপসৃত করা হয়। (Turkmens kaya Iskra, April 10, 1953).

উজবেকদেরকে তাদের নাম বদলাবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হচ্ছে। এতে বাধা দেয়ার ফলে "মিল্লী ইস্‌তিকলাল" পার্টির নেতা মাহমুদ মাকসুদ বাটুকে গ্রেফতার করা হয়। পুরানো উজবেক কবিদের নাম উচ্চারণ করার জোটি নেই। "আল-পামিশ", "কোরকুত আতা", "দেদেকোরকুত"—এসব আখ্যায়িকা নিন্দিত হয়েছে। অধুনা মীর আলীশীর নাভৈ "ফরহাদ ও শিরি" উপাখ্যানকে সোভিয়েট শাসনের সমর্থনে কাজে লাগিয়েছেন। হোসেন জাভিদের সাহিত্য কিছুদিন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। পরে সংশোধিত উপায়ে এ সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে।

তাতারদের জাতীয় বীর নেতা হলেন ইদেগাই, আর রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে কাজাক কর্মবীর জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন, তাঁর নাম খাঁ কেনেসারী কাসিম। এ সংগ্রামকে (১৮৩৭—১৮৪৬) এখন প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যে-সব আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল নামে অভিহিত করা হয়েছিল, যুদ্ধের পর তা বদলে যায়। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত পুস্তকে দেখা যায় যে, জার শাসনের বিরুদ্ধে মধ্য-এশিয়ার জনগণের সংগ্রাম ছিল বীরত্বপূর্ণ ও তাঁরা কখনই স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করেননি। Istoriya S. S. S. R.: History of the U. S. S. R. Vol. II, Russia in the 19th Century, Prof. M. V. Nechkin, 1949, P. 590). কাজাকরা যে বিনা বাধায় রাশিয়ার তাঁবেদার বনে গেছে, এ একটা ডাহা মিথ্যা কথা (Large Soviet Encyclopedia 1st ed,, Vol. XXX Col. 590). "কিরঘিজদের সম্পর্কেও একথা খাটে। (ঐ— Vol. XXXII Col. 377). তাজিকদের ইতিহাসে" গফুরভ লিখেছেন যে, সামন্ত নেতাগণ শুধু জার শাসনকে সমর্থন জানান—সাধারণ লোক চিরকাল এর বিরোধিতা করে এসেছে। (Istoriya

Tadzhikskogonaroda : The History of the Tajik People). আসলে কিন্তু তা সত্য নয়, মধ্য-এশিয়ায় কোনও শ্রেণীই রুশ তাঁবেদার হতে চায়নি।

রুশ শাসন সম্পর্কে জনৈক রুশ কর্মচারী রুশ সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেন, তার থেকেই একথার নযির মেলে। এ রিপোর্টটি ১৮৭১ সালে লিখিত হয়। রিপোর্টে কর্মচারী বলেন ঃ

"দেশের জনসাধারণের মনে আমরা কোন নৈতিক আবেদন জাগাতে পারিনি। অথচ মধ্য-এশিয়ায় প্রবেশ করার সাথে সাথে আমাদের নৈতিক মানের সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। আমাদের শাসন সম্পর্কে আমরা তাদের মনে কোনও বিশ্বাস জাগাতে পারিনি। কিন্তু তাই ছিল আমাদের নৈতিক আবেদন ও রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রধান ভিত্তি। আমাদের মধ্যে এশিয়াবাসিগণ যা দেখতে আশা করেছিল, তা পায়নি—আমরা তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তাও পালন করিনি। কাজেই তারা দ্বিধা-সংকোচহীন চিত্তে আমাদের সামাজিক ব্যাধিগুলোর দিকে অংগুলি সংকেত করতে পেরেছে। কারণ এগুলো তারা দেখেছে ও হৃদয়ঙ্গম করেছে। আমাদের কার্যাবলী বিজিত জাতি ও তাদের প্রতিবেশীদের ওপর এমন একটা প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে যা আমরা গোড়ার দিকে ভাবতেই পারিনি।" (Schyler : Turkistan, Vol. I. London, 1876, P. 225).

মধ্য-এশিয়ার জনগণের আযাদী সংগ্রামের মূল প্রেরণা এসেছে তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্থাপত্য, দারুল-উলুম মাদ্রাসা ও সাহিত্য থেকে। এক সময়ে বোখারা ও সমরখন্দ শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল ও এখানে ইসলামী সভ্যতা ও তমদ্দুনের অভাবনীয় বিকাশ সাধিত হয়। বাণিজ্যের অবনতির সাথে সাথে এর গুরুত্ব কমেনি—কারণ ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র-স্থলরূপেও এর একটা মর্যাদা ছিল। আযরবাইজানে কাজী মুহম্মদ জিলায় খানেগ নামে অনেকগুলো অট্টালিকা রয়েছে। কুশশের জিলায় খেযরা নামক গ্রামে চতুর্দশ শতাব্দীর স্মৃতিসৌধ রয়েছে। ওরদুবাদে আযরবাইজানের জাতীয় কবি মোল্লা পানাশের মাজার রয়েছে। হাজি মুরাদের মাজার অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে ও তৈমুরলঙ্গের স্মৃতিসৌধ রক্ষণাবেক্ষণেরও কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। (Soviets Kaya Rossiya, Sept. 4, 1958). সমরখন্দের স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনগুলো আজ ধ্বংসের পথে। শিরদার মাদরিনের ফোটা থেকে এ কথার সুস্পষ্ট নযীর পাওয়া যায়। (W.

P. and Zelda Coates ; Soviets in Central Asia. Vawrence and Wishart, London, 1951). তুর্কীস্তানে স্বনামধন্য সুফী হযরত খোজা আহমদ ইসায়ীর (মৃত্যু ১১২০) মাজার ও মসজিদ রয়েছে। শাহ্ খোরখুতের মাজারও এখানেই। পূর্বোক্ত মসজিদে কোরান শরীফের আয়াত খচিত রয়েছে। মসজিদটির নির্মাতাও হলেন খোজা হোসেন। স্পেনের আল্-হামরার স্থপতিশিল্প এ মস্জিদেও অনুসৃত হয়েছে। হযরত খোজা আহ্মদ "জাহ্রিয়া" মত পন্থী ছিলেন। বালিয়ান্দ নামক মসজিদের নির্মাতা ছিলেন মৈতুর লঙ্গ। তাছাড়া সমরখন্দের শাহ্ সিন্দা মসজিদের নামও উল্লেখযোগ্য। আউলিয়া আতা কিরঘিজ কারা খাঁ, খোজা আখরার, আবদুল লতীফের (উরাটেপ) মাজার ও দুঙ্গানের মসজিদের নাম করতে হয়।

মাদ্রাসার মধ্যে বারাক খাঁর মাদ্রাসা, বেকলার বেগের মাদ্রাসা, সমরখন্দের খোজা আখরারের মাদ্রাসা, শিরদর মাদ্রাসা (১৬৪৮ সালে ইয়ালাং তাশ বাহাদুর, উজবেক বীর কর্তৃক নির্মিত), তৈমুরের পৌত্র মির্জা উলুক বেগ নির্মিত মাদ্রাসা উলুক বেগ, মাদ্রাসা তিল্লাকারী, মাদ্রাসা জাবর, মাদ্রাসা খোজা জালাল, মাদ্রাসা দেওয়ান বেগী, এমনিধারা অজস্র মাদ্রাসা ও দারুল-উলুমের নযীর পাওয়া যায়। এসব মাদ্রাসার একটা মোটামুটি ফিরিস্তি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

বোখারায় ঃ	আবদুল্লাহ্ খাঁ
	আলী খাঁ
	বারাখার
তাসকেন্তে ঃ	বেকলার বেগ
	বিবি খানিয়া
	খোজা জালাল
	ইরানজেভ এলতাহ্
	জুবার
কোকন্দে ঃ	খাঁ
	কুকোল তাশ
	মীর
	মীর-ই-আরব

উরূতেজে ঃ বুস্তান বেগ

শিরদার

তিল্লাকেরী

উলুক বেগ

মধ্য-এশিয়ার সাধারণ সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে মুঘল সম্রাট বাবর রচিত গ্রন্থাবলী ও হেরাতের মীর আলী শীয়ের (১৪৪১—১৫০১) লেখা। তুগতাই ঐতিহ্যের বাহক বাবর ফারসী ভাষাকে তাঁর বাহন হিসেবে গ্রহণ করেন। ঔদার্য ও স্বদেশিকতা তাঁর সাহিত্যের মূল সুর। এ ঐতিহ্যের অধিকাংশ অবশ্য মুখে মুখে কাহিনী (দাস্তান) ও গাথার মাধ্যমেই বিকশিত হয়ে এসেছে যুগের পর যুগ ধরে। তুর্কমানদের "কোরঘলু", "দেদে কোরকুত", কাজাকদের "কুবলান্দি বাতির" (বাতির নামক বীর), উজবেকদের" "আল্পামিশ" ও কিরঘিজদের "মানাস" মধ্য-এশিয়ার জনগণকে বিরাট প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। কাজাক কবিদের মধ্যে কিনেসারী অ্যাবে (১৮৪৫—১৯৫৬), চোকান ভেলাকীন (১৮৩৭—১৮৬৫) ও যাযাবর জীবনের কবি জুমাবের নাম করতে হয়। ক্রিমিয়ার তাতারদের প্রেরণা এসেছে ইসমাঈল গ্যাস্‌পিরিলির (১৮৫১-১৯১৪) লেখা থেকে। তুর্কীস্তানের সাংস্কৃতিক প্রেরণা এসেছে খোজা আহমদ জাস্‌যাভী লিখিত "মেশরাব" থেকে। চীন তাতারিয়ার তুঙ্গান মুসলিমগণ সুফী হযরত আফাক বা খোজা সাদিকের মাজার থেকে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেছে—বিশেষ করে সমাজগত সংহতির দিক থেকে। পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত ফকীর-দরবেশ ও মসজিদ-মাদ্রাসাও এ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে।

মধ্য-এশিয়ার মুসলমানদের ধর্মীয় ঐতিহ্য খুবই শক্তিশালী। তবু তাঁদেরকে গোঁড়া বা ধর্মান্ধ বলে অভিহিত করা চলে না। অধ্যাপক তোগান তাঁর "আজকের তুর্কীস্তানে" এটা খুব ভাল করে দেখিয়েছেন। মধ্য-এশিয়ার মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শীলার বলেছেন—এঁরা ধার্মিক মুসলমান, কিন্তু ধর্মান্ধ নন (Schyler : Turkistan, London, 1876), এঁদের মধ্যে রুশ রক্তও মিশেছে আর চার্চ ও মসজিদ পাশাপাশি বিরাজ করছে। (D. M. Wallace : Russia, Vol- I, London, 1877, PP. 238—46) এঁদের জাতীয়তা ও ধর্ম একই সূত্রে গ্রথিত, কিন্তু এতে উদার হতে তাঁদের মোটেই

আটকায়নি। কারণ এঁরা ধর্মের সারবস্তুটি গ্রহণ করেছেন। শাসনের ব্যাপারে এঁরা (জারের আমলে) কখনো রাশিয়ান ও কখনো তুর্কীস্তানী নিয়োগ করে এসেছেন। বিদেশী মুসাফিরগণ একথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, বাশকিরদের মত অতিথি-পরায়ণ জাতি পৃথিবীতে বিরল। "পীর" বা "ইশান"গণ সামাজিক সংহতির ব্যাপারে যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করেছেন ও "রাইস"গণ ধর্মীয় নীতি প্রতিপালনের দিকে নযর দিয়েছেন। সমাজব্যবস্থা পুরোপুরি ইসলামী না হলেও ইসলামী জীবনবোধ শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে রুশীকরণের বিরুদ্ধে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করে রেখেছে। এ অবস্থায় রুশ কমিউনিস্ট ধর্মবিরোধী অভিযানও সফলকাম হয়নি। আযরবাইজানের কমউনিস্ট পার্টির নেতা মুস্তাফাইয়েভ অভিযোগ করেছেন যে, সোভিয়েট যুবকগণ নানাভাবে ধর্মীয় আদর্শদ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। (Literaturnaya Gazeta, January 20, 1959)

৯২২ খ্রিস্টাব্দে তাতার বাশকিরদের পূর্বপুরুষ বুলগারগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ১৫২২ সাল পর্যন্ত ইসলাম ক্রমে ক্রমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কাযানের খাঁ রুশদের হাতে পরাজিত (১৫২২) হবার পর রুশ সরকার ইসলাম ধর্মকে-বে-আইনী ঘোষণা করে। অতঃপর দ্বিতীয় ক্যাথারিনের রাজত্বকালে ইসলাম ধর্ম আবার শক্তিশালী হয়।

মধ্য-এশিয়ার মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইসলামী আদর্শ নিরীশ্বর দর্শনের কাছে পরাজিত হয়নি। সিরদরিয়া নদীর কূলে দ্বাদশ শতকের সুফী আহমদের স্মৃতিসৌধ তাদেরকে আজও ইস্লামী ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইবরাহীম আলাউদ্দীনের কবিতায় পাই এর স্পষ্ট ইঙ্গিত ঃ

তুমি একখানা কেতাব পড়,
আর কেতাবের লেখকের খোঁজ কর।
বিরাট অট্টালিকা দেখে নির্মাতার
নাম জানতে চাও,
তবে কি জমিন ও আসমানের কোন মালিক নেই?
হে মানুষ চিন্তা কর, বুঝে দেখ
আমাদের কাছে সব জিনিসই নিশানা দিচ্ছে—
মহান, সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্র।

ভ্যাম্বেরী বলেছেন, "যতই আমরা মধ্য-এশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগলাম, ততই দেখলাম সত্যিকার ধর্মীয় অনুভূতির প্লাবল্য। খিভাতে যদি হজযাত্রীর সংখ্যা ১০—১৫ জন হয়ে থাকে, তবে বোখারায় ৩০—৪০ জন ও কোকন্দ ও চীনা তাতারিয়ায় ৭০—৮০ জন।" (Vambery; Travels in Central Asia, London, 1864, P. 409). আলতাই ও তিয়েনশানের কাজাকগণ তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্য দীর্ঘ ২৫ বছর কমিউনিস্টদের সাথে লড়াই করে এসেছে। মুসলমানরা যেমন জার-শাসনকে মেনে নেয়নি, তেমনি রুশ কমিউনিস্ট তাঁবেদারীও স্বীকার করতে চায়নি। সোভিয়েট লেখক Yefremov স্বীকার করেছেন যে, ইসলামী ঐতিহ্য আজও চির উজ্জীবিত রয়েছে। (Yefremov and Gabarov : The Land of Soviets : Moslems in the Soviet Union, Moscow, 1959, P. 14), ক্লিমোভিচ বলেন ঃ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ইসলামের সাথে আমরা এঁটে উঠতে পারি না। ইসলামের দুর্দম ধর্মবিশ্বাস বিরাট শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু এ শক্তিকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ দেয়া উচিত হবে না। (Klimovich: Islam V. Tsarsky Rossii, Moscow, 1936) .

ধর্মীয় সমাজব্যবস্থা রাশিয়াতে নেই—সামাজিক ব্যাপারে ধর্মের মানবিক দিকটার কোন স্বীকৃতিও নেই। কিন্তু জনগণের মন থেকে ধর্মের আবেদন মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। Yefremov-এর পূর্বোক্ত পুস্তিকায় ১৫ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

১৯০২ সালে মসজিদের সংখ্যা—২৬,২৭৯ (মাদ্রাসা ১০৩)

১৯৪১ সালে মসজিদের সংখ্যা—১,৩১২

১৯৫৯ সালে মসজিদের সংখ্যা—৩,০০০

আরবীয় ইসলামী ঐতিহ্যের আবেদন স্তিমিত করার জন্য ৪০ বছর আরবি কোরান শরীফ পড়তে অনুমতি দেয়া হয়নি। (Yefremov P. 18) . বৃহৎ সোভিয়েট বিশ্বকোষে কোরানকে নিপীড়নের হাতিয়ার বলা হয়েছে। (১৯৫৩ অষ্টাদশ পুস্তক, ৫১৮ পৃঃ)। অথচ আল-কোরান নিজেই যুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রেরণা দিয়েছে।

সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সব রকমের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়েছে। তাতার স্কুলগুলো বন্ধ করে দিয়ে সেগুলো রুশ-তাতার স্কুলে রূপান্তরিত করা

হয়েছে। অনেক শিক্ষক তাতার ভাষা পর্যন্ত জানেন না (Kommunist Tatarii, June, 1958). মুসলমানদের প্রতি রুশ কমিউনিস্টদের ব্যবহার সম্পর্কে মোটামুটি বলা চলে ঃ

(ক) নিম্নোক্ত উপায়ে বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংস করা হয়েছে ঃ

(১) শ্রেণী সংঘর্ষের ধুয়া তুলে ; (১৯১৭- ১৯২১)

(২) বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধুয়া তুলে; (১৯২২-১৯২৯)

(৩) কুলাক ও ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধুয়া তুলে; (১৯৩০-১৯৩২)

(৪) জনগণের দুশমনদেরকে ধ্বংস করবার ধুয়া তুলে; (১৯৩৬- ১৯৩৮)

(খ) তুর্কী ও তাতারদেরকে তাঁদের আবাসভূমি থেকে জোর করে দূরাঞ্চলে চালান দেয়া হয়েছে।

(গ) রুশীকরণ নীতি চালানো হয়েছে ঃ

(১) রুশ জনগণের সাথে মুসলমানদের মিশ্রণ ঘটিয়ে;

(২) আরবি হরফের বদলে লাতিন হরফ প্রবর্তন করে; (১৯২৯)

(৩) লাতিনের জায়গায় সিরিলিক (রুশ) হরফ প্রবর্তন করে : (১৯৩৯)

এভাবে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিষ্পেষিত হয়েছে কমিউনিস্ট শাসনযন্ত্রের যাঁতাকলে । শত শত প্যাস্টারনাকের অপমৃত্যু ঘটেছে।

ল'টন বলেন ঃ

"ধর্মের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের লড়াই আদিম ও অর্থহীন। তারা বোঝে না যে, ধর্মীয় নীতি কখনও মন্দ হতে পারে না। যারা ধর্মের নামে শোষণ করে, তারা ধর্মের ক্ষতি সাধন করে। তারা এ কথাও বোঝে না যে, যারা তথাকথিত ধর্ম পালন করে, তাদের মধ্যেই ধর্মের ভূমিকা সীমায়িত। আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী নাস্তিক একজন মুনাফিক "ধার্মিকের চাইতে শ্রেষ্ঠ।" (Lawton : The Russian Revolution, London, 1927, P. 245).

প্রকৃত ধর্মীয় আদর্শে যেমন ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক একসাথে ওতপ্রোত-ভাবে মিশে যায়, তেমনি অপরের প্রতি উদার ব্যবহারও এর প্রধান ভিত্তি। এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (স.) অমুসলিমের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করেন ও ইসলামী

রাষ্ট্রে আইনের রাজত্বে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এসব স্বীকৃতি কমিউনিজমে খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল প্রচেষ্টা মাত্র। ব্যক্তি জীবন সেখানে সমাজ-জীবনের যাঁতাকালে নিষ্পিষ্ট। কাজেই এখানে মানুষের মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতি অসম্ভব।

মধ্য-এশিয়ার মুসলমানদের ঐতিহ্যের বিবর্তনে ইসলামী ঐতিহ্য যেমন কার্যকরী হয়েছে, তেমনি তুর্কী সংহতিবোধও এক্ষেত্রে কাজ করেছে। কিন্তু মোল্লাতন্ত্রের স্থায়ী আধিপত্য এখানে স্বীকৃত হয়নি। জনসাধারণের হৃদয়ের গভীর প্রদেশে সরলমনা মানুষের মনে ইসলামের অবিসংবাদিত আসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইসলামী সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে ককেশীয় ধর্মীয় নেতাদের ধারণা যে খুবই স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, নিম্নলিখিত দলিল থেকেই তার প্রমাণ মেলে। ১৮৬৫ সালে যখন জেনারেল তেহেরনাইয়েফ কোকন্দের আমীরকে পরাজিত করেন, তখন কোকন্দের ধর্মীয় নেতাগণ এক ঘোষণা লেখেন ও জেনারেলকে এটা মেনে নিয়ে সই করতে বাধ্য করেন (২ জুলাই, ১৮৬৫) । ঘোষণাটি এইভাবে লেখা হয় ঃ

"তাসকেন্তের অধিবাসীদের কাছে আমরা ঘোষণা করছি যে, তাঁরা যেন সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী কাজ করেন ও মুহম্মদের ধর্মের নীতিসমূহ মেনে চলেন। (মুহম্মদের ওপর ও তাঁর উম্মতের ওপর আল্লাহ্র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।) তিনি যে-সব আইনকানুন প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেগুলো যেন বিন্দুমাত্র বরখেলাফ করা না হয়। সবাই যেন সাধ্যমত দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করে যান। তাঁরা যেন সর্বত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন—এক ঘণ্টা বা এক মিনিটও যেন ঠিক সময়ের অবমাননা না হয়। ধর্মশিক্ষকগণ স্কুলে ইসলামী ধর্মদর্শন ও আইনকানুন শিক্ষা দেবেন ও তাঁরা এক ঘণ্টা কি এক মিনিটও অযথা ব্যয় করবেন না। এক ঘণ্টার জন্যও যেন ছাত্ররা তাদের পড়াশুনার ব্যাপারে অবহেলা না করে। শিক্ষকগণ যেন ছাত্রদেরকে এক জায়গায় নিয়ে জমায়েত করেন ও তাঁরা যেন আলস্যপরায়ণ না হয়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। দরকারমত তাঁরা যেন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন ও এমনকি তাঁরা প্রহারও করতে পারেন। শিক্ষার ব্যাপারে যদি মাতাপিতা অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তাঁদেরকে মুসলিম আইন অনুসারে নগরের রাই্স বা প্রধান বা কাযী কি লিয়ানের কাছে হাযির করা হবে ও সমুচিত শাস্তিবিধান করা হবে। দেশের জনসাধারণ যেন তাঁদের নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম সুষ্ঠুরূপে সমাধা করেন। শিল্পবাণিজ্যে লিপ্ত লোকদের সম্পর্কে একথা খাটে। এঁরা যেন অযথা সময় না কাটান, রাস্তাঘাট যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয় ও এতে নোংরা দ্রব্য নিক্ষেপ করা না হয়। ধনী-দরিদ্র তাসকেন্তের সমগ্র অধিবাসী

যেন উপরি-উক্ত নিয়মকানুন যথাযথভাবে প্রতিপালন করেন। আপনাদের ঘরবাড়ি, ফুলের বাগান, জমিজমা ও জলাশয় আপনাদের দখলেই থাকবে। এসব ছিনিয়ে নেবার অধিকার কোনও সৈনিকের নেই। আপনাদেরকে জোর করে রুশ কমাক জাতিতে রূপান্তরিত করা হবে না। আপনাদের মধ্যে সৈন্যদল বসানো হবে না; আর কোনও সৈনিক যদি আপনাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়, তবে তা তখনি আমাদেরকে জানাতে হবে। তখন তার সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। আপনাদের প্রতি মহানুভবতা দেখানো হচ্ছে; কাজেই আমরা আশা করি, শ্বেত জারজাতির মঙ্গলের জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন। যদি কেউ কাউকে হত্যা করে বা কোনও সওদাগরের ধনসম্পদ কেড়ে নেয়, তবে তার বিচার হবে রুশ-আইন অনুসারে। তবে কেউ যদি আত্মহত্যা করে, তবে তার সম্পত্তি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী উত্তরাধিকারদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কিন্তু তার ধনসম্পদ আমরা স্পর্শও করবো না।" (Ella R. Christie : Through Khiva to Golden Samarkand, London 1925, PP. 243—244)

১৯১৭ সালের অক্টোবর, বিপ্লবের পর অগণিত লোক রাশিয়া থেকে অন্যান্য দেশে হিযরত করে। প্রথম বারেই এদের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ। (Second Year Book of the League of Nations, January, 1921 to February 6, 1922, Newyork 1922, P. 33) জনৈক লেখকের মতে ১৯১১ সালে রাশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ। (Gaston Gaillard : The Turks and Europe, London, 1921, P. 358)

ভল্গা ও ক্রিমিয়া অঞ্চলে	৬০ লক্ষ
তুর্কীস্তানে	৬০ লক্ষা
ককেশাসে	৭০ লক্ষ
উত্তর-ককেশাসে	২০ লক্ষ
জর্জিয়ায়	৬ লক্ষ
আযরবাইজানে	৩ $\frac{১}{২}$ লক্ষ ইত্যাদি।

বলশেভিক একনায়কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য আয়ায্ ইসহাকী, সাদরী মাকসুদী, জাকি ওয়ালিদী ও তুক্তারভ হিযরত করেন। আযরবাইজানের মির্যা বালা কুলটুকও হিযরত করে ইরানে ও পরে তুরস্কে গমন

করেন। সেখান থেকে কিছুদিনের জন্য তিনি পোল্যান্ডে যান। ১৯১৫ সাল থেকে তিনি "আমিক সোক " (স্বাধীন কথা) "ইত্তেফাকী মুত্তায়াল্লিকীন" ও গেনক্লার সাদাসী" এসব পত্রিকায় লেখেন ও আযাদীর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তুরস্কের অনেকগুলো পত্রিকাতেও তিনি লিখতে থাকেন ও আযরবাইজানী আযাদী আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। হাম্দী ওরলু ক্রিমিয়া জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন ও "এমেল" নামক পত্রিকার মারফত তাঁর সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ১৯৪৭ সালে ইনি তুরস্কে হিযরত করেন।

এইসব মুহাযিরদের মধ্যে সাদ্‌রী মাকসুদী আরসালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি "মুসলিম সংহতি" ("মুসলমান ইত্তিফাকী') দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। এ দলে ছিলেন আযরবাইজানের আলী মারদান বে তোপচিবাশী ক্রিমিয়ার ইসমাঈল বে গ্যাস্‌পিরিলি, কাজানের আবুসাদ আহতেম ও সাইয়ীদ গিরাই আলকীন ও ইউসুফ আক্‌চুরা। বিপ্লবের পর আভ্যন্তরীণ রাশিয়া ও সাইবেরীয় রাশিয়ার মুসলিম শাসন সংস্থা তুলে দেয়া হয়। এর ফলে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে ও ভল্‌গা নদীর তীরে সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে বিরাট গণ-অভ্যুত্থান দানা বেঁধে ওঠে। মাক্‌সুদী ও ইসহাকী মুসলিম পল্লী নিয্‌নী নোভগোরোদ জুবারনিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে ফিনল্যান্ডে হিযরত করেন। ১৯২২ সালে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদ্বয় তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর তিনি জার্মানী ও ফ্রান্সে গমন করেন ও প্যারিসে "Le Temps" ও "Journal Asiatique"-এ প্রবন্ধ পাঠান। ১৯২৪ সালে মুস্তাফা কামাল পাশার আমন্ত্রণক্রমে তুরস্কে যান ও ১৯২৫ সালে তুর্কী সাহিত্য কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০—৩৪ সালে ইনি তুরস্ক জাতীয় পরিষদে সদস্য ছিলেন ও পরে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯৪৫)। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ অবধি ইনি গণতন্ত্রীদলের সদস্য হিসেবে তুরস্ক জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ সালে অধ্যাপক মাকসুদী ইন্তিকাল করেন।

১৯৫৮ সালে ককেশাসের আযাদী সংগ্রামের অন্যতম নেতা সাইয়ীদ শামিল করাচী আগমন করেন। ইনি বানদুং সম্মেলনে রাশিয়ার নিপীড়িত জনগণের তরফ থেকে আফ্রো-এশীয় দলের নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। (The Students Voice, Karachi, August, 1955, P. 6), তাছাড়া মুহাযির নেতাদের মধ্যে মুস্তাফা চোকাই, উস্‌মান খোজা ও অধ্যাপক তোগানের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রাশিয়ার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করতে গেলে মুহাযিরদের বর্ণনা থেকে যে অনেক মালমসলা পাওয়া যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। আসল খবর বেরিয়ে পড়ে বলেই রাশিয়া সব সময় মুহাযিরদের সম্পর্কে ঘৃণ্য নিন্দা-অপবাদে পঞ্চমুখ রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদীর নিয়ম সব জায়গাতেই সমান। এ ব্যাপারে বেছে নেবার বিশেষ কোন যৌক্তিকতা নেই—তা ব্রিটিশ হোক, ডাচ হোক, ফরাসী হোক আর রাশিয়া হোক। শিক্ষার উন্নতি বা রেলগাড়ীর প্রবর্তনের খাতিরে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বা বিদেশী শাসন মেনে নেয়া যায় না, রাশিয়া সম্পর্কেও একথা খাটে। রুশ প্রচার দফতর থেকে শিক্ষার প্রসার ও পানিসেচের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে সোভিয়েট শাসনের সমর্থন জানানো হয়। কিন্তু মানুষ শুধু বৈষয়িক উন্নতিই কামনা করে না, বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে মন ও আত্মার আযাদী ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও তাঁর কাম্য। এ দুটো জিনিসের সম্মিলন না হলে কোন স্বাধীন মানুষ সে অবস্থা মেনে নিতে পারে না। শ্বেত জাতির মহাকর্তব্যের (White Man's Burden) দোহাই দিয়ে ব্রিটিশ, ফরাসী জার্মান ও ডাচ যেমন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন জানিয়েছিল, "বড় ভাই নীতির" (Elder Brother Theory) মাধ্যমে রাশিয়া একই জিনিসের সমর্থন করে চলেছে। তবে পার্থক্য এই যে, ব্রিটিশ শাসনে কথা বলবার অধিকার দেয়া হয়ে থাকে, কিন্তু রুশ তাঁবেদার রাষ্ট্রে (রাশিয়া ও পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলোতে) বিন্দুমাত্র বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই। আযাদী সংগ্রামকে পিষে মারার জন্যই সব জাতিকে তাদের নিজ দেশে সংখ্যালঘু করে রাখা হয়েছে। ভল্‌গা এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা জোর করে ৫০—৫২-তে রাখা হয়েছে।

বাশকিরিয়ায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ট হলেও আইনসভায় ২২ জন সদস্যের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা মাত্র ৯ জন। এই একই কারণে চালান-নীতির আশ্রয়ে নেয়া হয়েছে।

সোভিয়েট সরকার রুশীয় মুসলমানদের প্রতি যে ব্যবহার করেছেন, তার বর্ণনা দেবার ফলে কেউ যেন মনে না করেন যে, বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে রাশিয়া অনগ্রসর রয়েছে। আমরা জানি যে, খনিজ ও সাধারণ ব্যবহারিক দ্রব্য উৎপাদনে ও ভারী শিল্পে রাশিয়া অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে সাধারণ দ্রব্যসামগ্রী ৯ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু যৌথ-খামারে উৎপাদন বাড়েনি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও পোশাক-পরিচ্ছদ অনেক জায়গাতেই

সেকেলে রয়ে গিয়েছে। বাড়ি-ঘরের সংখ্যাও অল্প। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়েছে কিন্তু রুশ তাঁবেদার বিভিন্ন জাতির নিজ নিজ ভাষায় লিখিত সাহিত্যের সংখ্যা নেহাৎ কম। তাই অনেকে রুশভাষা শিখতে বাধ্য হচ্ছে। সাহিত্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের সত্যিকার অগ্রগতি সর্বাত্মকবাদের নিষ্পেষণে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই ও কমিউনিস্ট পার্টির লোকদের জীবনমান সাধারণ লোকের জীবনমানের অনেক উর্ধ্বে। চীনা কমিউনিস্টদের অনেক গুণ আছে—তাঁরা সরল জীবনযাপন করেন ও আন্তরিকভাবে কাজ করেন। কিন্তু আন্তরিকতা দেখিয়েই মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার নৈতিক অধিকার লাভ করা যায় না। মনে রাখতে হবে যে, হিটলারও আন্তরিক ছিলেন তাঁর নাৎসীবাদী স্বৈরাচার সম্পর্কে। আন্তরিকতা আংশিক সম্মান দাবী করতে পারে। কারণ তা মুনাফিকের চাইতে উচ্চপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কোনমতেই তা স্বাধীনতাকামী মানুষের আনুগত্য দাবী করতে পারে না। তাই বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী স্বৈরতন্ত্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ থেকেই অর্থনৈতিক দিকে অনগ্রসর জাতিগুলো তাদের মত ও পথ বেছে নিতে হবে। চীনকে সিনকিয়াং-এর স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে হবে। এখানকার ৯০% লোক মুসলমান। স্বাধীনতা স্বীকৃতি দেবার ওয়াদা দিয়ে কমিউনিস্টগণ এদের সাহায্য কামনা করে। কিন্তু ১৯৪৯ সালের পর এ ওয়াদা রক্ষিত হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে সিনকিয়াং বা পূর্ব-তুর্কীস্তানের গুরুত্ব খুব বেশি। লর্ড হান্‌টিংডন একে "The Pulse of Asia" (এশিয়ার ধমনী) ও অধ্যাপক আওয়েন ল্যাটিমোর একে "The Heart of Asia" (এশিয়ার হৃৎপিণ্ড) নামে অভিহিত করেছেন।

কমিউনিস্ট শাসনে স্বাধীনতা কামনা করা বে-আইনী কাজ ও প্রতিবিপ্লবের শামিল। এই সেদিনও (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৮) তুর্কমান ও উযবেকদের জন্য অধিক স্বাধীনতার দাবী সমর্থনের অভিযোগে তুর্কমান নেতা সুখান বাবাইয়েভ, নূর জামাল দুরদাইয়েভ, উযবেক নেতা সাবির কামালভ ও মির্যা আহমদকে অপসৃত করা হলো। সোভিয়েট রাশিয়ার মুসলমানদের সম্পর্কে খবর পাওয়া খুবই মুশকিল। সেজন্য আরও অধিক সংবাদ সংগ্রহ না করতে পারলে পূর্ণাবয়ব ইতিহাস লেখা কঠিন ব্যাপার।

ইতিহাসের বিবর্তনে মধ্য-এশিয়ার সুবিপুল গতিশীলতার বিষয় অবিদিত নয়। আচার-অনুষ্ঠানের চাইতে বহিঃপ্রকৃতির মাঝে মধ্য-এশিয়ার জনগণ আল্লাহ্‌কে অধিক প্রত্যক্ষ করেছে। চিন্তা না করে শুধু গাযীর পোশাক পরলে বা ইসলামকে বাদ দিয়ে ইয়োরোপীয়দের নকল করলে সত্যিকার প্রগতিমূলক আন্দোলন গড়ে

উঠবে না। ইসলামের জীবনদৃষ্টিতে অটল থেকে তাকে পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বাস্তবায়িত করতে হবে। তবেই সত্যিকার ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

ধর্মীয় ও ধর্মবিশ্বাসমূলক সমাজ ও নাস্তিক্যবাদী সমাজ—এ দুটোর মধ্যে সত্যিকার ধর্মীয় সমাজই টিকে থাকবে। কারণ, কেবলমাত্র বৈষয়িক উন্নতির ওপর কোনও সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূল টিকে থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাত দিতে গিয়ে ও অশিক্ষিত অবস্থার মোকাবিলা করতে গিয়ে কমিউনিজম মানুষের গোটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নীতিবোধকেই অস্বীকার করেছে। "To destroy from within the whole bourgeois state machine and Parliament, itself " (2nd World Congress of the Communist International, 1920) মানুষ নিরীশ্বরবাদ ও কমিউনিজম গ্রহণ করে থাকে, কারণ সে আজ নৈরাজ্যবাদী আবহাওয়ায় "শিক্ষিত" হয়েছে; বিশ্বাসহীন মানুষের কাছে কমিউনিজমের আবেদন স্বাভাবিকভাবেই খুব বেশি হতে বাধ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পক্ষই জয়লাভ করবে যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুবিপুল নৈতিক আবেদন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবে। শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুবিচারমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠন করেই এ দৈত্যের মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে, নিছক নেতিবাচকভাবে শুধু অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নয়।

অন্যায়-অবিচার দূর করে সত্যিকার সুষ্ঠু সমাজ গঠনের ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাদের তওফীক দিন—সার্বান্তঃকরণে এই কামনা করি। কোরান ঘোষণা করেছেন ঃ "চন্দ্র-সূর্যকে মানুষের তাঁবেদার করে দিয়েছি।" কাজেই মানুষ চাঁদে গিয়ে পৌঁছালে ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত হবে— দুর্বলতা বাড়বে না।

!! এক !!

ইসলাম ও কমিউনিজম

ইসলাম খোদার একত্ব ও মানবিক খিলাফতের ওপর ভিত্তি করে মানব-স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে অধিকার রূপায়ণের ক্ষেত্রে বাস্তব সমাজব্যবস্থা ও আপেক্ষিকতার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছে "ইজতিহাদ" নীতির মাধ্যমে। নতুন সমাজ-ব্যবস্থা ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক রূপায়ণের নতুন পন্থাও আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু মানব-অধিকারের মৌলিক ভিত্তিটাকে আপেক্ষিকতার পর্যায়ে টেনে এনে ইসলাম দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ ও সামাজিক স্বৈরতন্ত্রের পত্তন করতে চায়নি।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্ম দিয়ে ইসলাম বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলোকে ইসলামী জীবনদর্শন ও মানবকল্যাণের নীতি রূপায়ণের পন্থা বা পদ্ধতি বলেই মনে করে। আজকের দিনে ইসলাম ও কমিউনিজমের পার্থক্য সম্পর্কে সুষ্ঠ ধারণা লাভ করতে হবে ও ইসলামী জীবনবোধের ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায়নীতি ও ইনসাফ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইসলামের মৌলিক আদর্শকে চলমান সমাজের সঙ্গে তাল রেখে পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী রূপায়িত করতে হবে।

দার্শনিক চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের দিক থেকে বিচার করলে একথা সহজেই হৃদয়ংগম করা যায় যে, ইসলাম কমিউনিজমের সাথে কোন রফা করতে পারে না। জড়বাদী কমিউনিস্ট-দর্শনের সঙ্গে ইসলাম কোন দিনই সমঝোতায় পৌঁছাতে পারবে না। কারণ মানবজীবন সমস্যা ও জীবনের আদি, গতি ও পরিণতি সম্পর্কে এদুটো দর্শনের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। এসব জেনে-শুনেও অনেক সরলমনা মুসলমান কমিউনিস্ট শাসনের নৃশংসতা, ভীষণতা ও বর্বরতা এবং মুসলিম দেশগুলোতে তার বিস্তৃতি সম্পর্কে বড় বেশি অবাস্তব দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়ে

থাকেন। অনেক মুসলিম দেশে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যসংখ্যার স্বল্পতা দেখে তাঁরা কমিউনিস্ট অভিশাপের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তাও করেন না। সমস্যাটাকে তাঁরা বড় বেশি গুরুত্ব দিতেও চান না। সরলমতি মুসলমানদের কমিউনিস্টরা বুঝিয়েছে যে, ধর্মের বিরুদ্ধে মার্কস্ ও লেনিনের বিষোদ্‌গার সাময়িক ব্যাপার মাত্র। মুসলমানরা তাই কমিউনিজ্‌ম সম্পর্কে মারাত্মক ঔদাসীন্য ও সমঝোতার নীতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একথা স্পষ্টরূপে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কমিউনিস্ট দর্শনের মৌলিক নীতি ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই বিবেচিত হয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামী আন্দোলনকে আধুনিক পথে পরিচালিত করা হয়নি। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বানচাল করার ফলে মুসলিম দেশগুলোতে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এমনি করেই কমিউনিস্ট অপপ্রচারে পথ খোলাসা হয়ে গিয়েছে। যাঁরা নতুনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি, আর যাঁরা ইসলামের মূল আদর্শ ধরতে পারেননি—উভয় দলই নানাভাবে এ অপপ্রচার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

কমিউনিজমের সাথে যে ইসলামের কোনও সমঝোতা হতে পারে না, তার কারণ হলো—কমিউনিজম আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, ওয়াহী ও পরলোক বা আখেরাত সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে ও ব্যক্তিসত্তাকে আদৌ স্বীকার করতে চায় না। কমিউনিস্টরা ব্যক্তির উন্নতির চাইতে ব্যক্তিকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেই অধিক উৎসাহী হয়। কমিউনিজম পরিবার প্রথা ধ্বংস করে দিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম ঘনীভূত করে তোলে ও মানবিক নীতির একক সত্তা অস্বীকার করে দল ও রাষ্ট্রের সুবিধামত তার ব্যাখ্যা প্রদান করে। প্রত্যেকটি সমাজব্যবস্থায় নীতির রূপায়ণের পন্থা আপেক্ষিক হতে বাধ্য। কিন্তু কমিউনিজম নৈতিক ভিত্তিটাকে আপেক্ষিক পর্যায়ে টেনে এনে বিরাট নৈতিক নৈরাজ্যের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তা করা হলো মার্কসীয় নীতির বিরোধিতা করেই। শ্রমিকদের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তিসাধনের ওয়াদা নিয়ে আধুনিক কমিউনিজমের জন্ম হয়েছিলো। কিন্তু শেষে দেখা গেল যে, অর্থনৈতিক চিন্তাধারার জড়বাদী ভিত্তিটাকে সমগ্র জীবনের দার্শনিক কাঠামো হিসেবে দাঁড় করাবার অপপ্রয়াস চলেছে। কার্ল মার্কস বলেছেন ঃ

"আমাদের কাছে এ জড়জগৎ ছাড়া আর কোনও সত্তা নেই।"[১]

---

1. Karl Marx : Selected Works, English Edition, Vol., P. 435.

'পৃথিবী বস্তুর নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়— এজন্য কোনও সার্বজনীন সত্তা বা খোদার প্রয়োজন নেই।"[২]

বুহারিন প্রায়োব ব্যাযেন্স্কী তাঁর "ABC of Communism" শীর্ষক বইতে বলেন ঃ " যে কমিউনিস্ট ধর্মে বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে কমিউনিজমের কোনও সংযোগ থাকতে পারে না। যে সব শ্রমিকের জীবনে ধর্মের প্রভাব রয়েছে, তাদের ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সূক্ষ্ম সুচতুর কূটনৈতিক পথে অগ্রসর হতে হবে।" এ কারণেই চীনদেশে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনেকখানি শিথিল করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে কমিউনিজমের মতবাদ সম্মিলিত জাতিসংঘের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে খুব সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। জাতিসংঘ সম্পাদিত মানব-অধিকার ঘোষণায় রয়েছে ঃ "আল্লাহ্‌র গুণাবলী দিয়ে মানুষকে তৈরি করা হয়েছে।" সোভিয়েট রাশিয়া এর বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি জানায়। সোভিয়েট প্রতিনিধি অধ্যাপক আলেক্সি প্যাডলভ বললেন যে, "মানবিক মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকে যে মানুষ স্বাধীন ও সমান, একথা আমরা স্বীকার করি না। কারণ, মানব-স্বাধীনতা সামাজিক কাঠামোরই ফলমাত্র। খোদার ওপর বিশ্বাস রাখা সামাজিক অনগ্রসরতারই নামান্তর।" সোভিয়েট অধ্যাপকের এ ঘোষণায় মানুষের মানবিক সত্তা যেমন অস্বীকৃত হয়েছে, তেমনি মানব-স্বাধীনতা ও সাম্যের মৌলিক ভিত্তির সঙ্গে স্বাধীনতা রূপায়ণের পন্থাটিও তালগোল পাকিয়ে গেছে।

ইসলাম খোদার একত্ব ও মানবিক খিলাফতের ওপর ভিত্তি করে মানব-স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে অধিকার রূপায়ণের ক্ষেত্রে বাস্তব-সমাজব্যবস্থা ও আপেক্ষিকতার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছে "ইজ্‌তিহাদ" নীতির মাধ্যমে । নতুন সমাজব্যবস্থা ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক রূপায়ণের পন্থাও আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু মানব অধিকারের মৌলিক ভিত্তিটাকে আপেক্ষিকতার পর্যায়ে টেনে এনে ইসলাম দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ ও সামাজিক স্বৈরতন্ত্রের পত্তন করতে চায়নি।

কমিউনিস্টদের মতে ধর্মের আসল ভিত্তি নাকি সামাজিক দুঃখ-দুর্দশা। সোভিয়েট বিজ্ঞান এ্যাকাডেমির গবেষণা ফেলো জুডিন ও রোজেনবার্গ বলেন ঃ

---

2. A Short History of the Communist Party of the USSR. P-P. 105 ..... 114.

“শোষণের অস্তিত্বের ফলে ধর্ম এখনও টিকে আছে।” এসব ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছে ঃ ধর্মের মূল্যবোধ ও মৌলিক নীতি ভিন্ন মানুষের সমগ্র মানবিক বৃত্তি ও ব্যক্তিত্বের সম্যক স্ফূরণ সম্ভব নয়। রসূলে আকরাম (স.) সাধারণ মুসলমানকে আলৌকিকতায় বিশ্বাস করতে নিষেধ করে গেছেন ও সমাজ-জীবনে সুবিচার কায়েম করতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। আল্ কোরানের মতে শোষক মোল্লাতন্ত্র ইসলামী জীবনাদর্শের ঘোর বিরোধী। প্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক গীঁজো (Gnizot) বলেন ঃ ইসলামই সর্বপ্রথম সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অবশ্য পরবর্তীযুগে যে ইসলামী সমাজ গঠিত হয়নি, সেজন্য ইসলামকে দায়ী করা চলে না; এজন্য মুসলমানরা নিশ্চয়ই দোষী সাব্যস্ত হবেন। কিন্তু পুরোহিততন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইসলামী জীবনদর্শনকে দায়ী করা চলে না। কারণ, ইসলাম এগুলোকে সমর্থন করা তো দূরের কথা, ... ইসলামী নীতি এগুলোর বিরোধিতা করেই এসেছে। জুডিন বলেন ঃ ইসলাম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বিরোধী। অনেক সময়ে ইসলামের নাম সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দেখা যাক, ইসলামকে এজন্য কতটা দোষী করা চলে। “গণতন্ত্র” কথাটি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ সমানভাবে ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো ঃ তাতে কি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেছে? তেমনি “ইসলামের” নামটিও পাশ্চাত্য ও কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবহার করে থাকে। কমিউনিস্ট শ্রেণীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে কোরানের আয়াতের অনেক অপব্যাখ্যাও করা হয়েছে। কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য “ইসলাম” ও “মুসলিম” এইসব শ্লোগানও ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এতে কি ইসলামের জীবনদর্শন ও মৌলিক ভিত্তিটা বরবাদ হয়ে গেছে?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষের মনকে কুসংস্কার ও খামখেয়ালী থেকে রক্ষা করে। সমগ্র নিখিল-জাহানে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের কথা ঘোষণা করে ইসলাম মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা বা মোল্লাতন্ত্রের কোনও অধিকার এ ব্যাপারে মোটেই স্বীকৃত হয়নি।

ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম—ব্যক্তিগত, জাতিগত ও শ্রেণীগত ব্যবধানের উর্ধ্বে মানবিক ভিত্তিতে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করতে চায়। রবার্ট ব্রিফল্ট

(Robert Briffault)[৩], ড্রেপার (Draper)[৪], ও লেকী (Lecky)[৫] একথা সপ্রমাণ করেছেন যে, ইসলামই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী ও বিশেষ থেকে সামান্যে পৌছাবার (Inductive) নীতির পত্তন করেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলোকে ইসলাম, ইসলামী জীবনদর্শন ও মানবকল্যাণের নীতি রূপায়ণের পন্থা বা পদ্ধতি বলেই মনে করে। বিজ্ঞানকে ইসলাম জীবনদর্শনের নীতিগত মৌলিক ভিত্তি বলে মনে করে না।

কমিউনিজম বলে, পদার্থ বা জড়জগতই বিশ্বের আদিসত্তা। এছাড়া খোদা বলে কিছু নেই। ইসলামের মতে জড়পদার্থ আসলে পদার্থ ও শক্তির সমন্বয় এবং এই শক্তি এক মহাশক্তি থেকে প্রাপ্ত। কাজেই শুধু পদার্থ নয়, পদার্থ ও শক্তি উভয়ই সমানভাবে সত্য।

কমিউনিজমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য সর্বোপরি বলে বিবেচিত হয়। ইসলামে সবকিছুই আল্লাহ্‌র জন্য, মানুষের জন্য ও মানবতার জন্য ন্যস্ত। কমিউনিজমে রয়েছে রাষ্ট্রের ভিত্তি, ইসলামে আল্লাহ্‌র কথা মনে করে কাজ করা। রাষ্ট্রকে ইসলামী সমাজে হাতিয়ার বলেই মনে করা হয়।

কমিউনিজম শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস করে ও মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদা-দানে অস্বীকার করে। ইসলাম শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদে বিশ্বাস করে।

"যারা দুনিয়ায় অন্যায় ও অবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং গোলমাল-ফ্যাসাদ এবং অনর্থক অরাজকতার সৃষ্টি করে এবাং সমাজ খারাপ হয়ে গেলে তার সংশোধন ও সংস্কারের চেষ্টা করে না, তাদেরকে অনুসরণ করো না।"[৬] এক গোষ্ঠী দ্বারা আর

---

3. Robert Briffault : The Making of Humanity. P. 202). Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. The Greeks systematized generalized and theorized; but the experimental enquiry were altogether alien to the Greek temperament. ... What we call science arose in Europe as a result of the experimental methods introduced into the European world by the Arabs,"
4. Draper : History of the Intellectual Development of Europe, Vol. I, P. 33.
5. Lecky : History of Rationalism in Europe, Vol. II, P. 206.
6. আল্ কোরান-২৬ ঃ ১৫১–১৫২।

এক গোষ্ঠীকে ঠেকিয়ে না রাখলে ধর্মস্থান বিলুপ্ত হত[৭] ও অবিচারের হত কায়েমী আসন।

জেহাদের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম সাধারণ মানবতা ও মানুষের মর্যাদাও স্বীকার করে। কমিউনিজমে যেখানে হিংসা, ইসলামে সেখানে প্রেম। ইসলামে সংগ্রাম প্রেমদ্বারা উদ্বুদ্ধ, কমিউনিজমে সংগ্রাম একান্তভাবে বিদ্বেষপরায়ণ। খাঁটি ইসলামী সমাজে মানুষের সম্মান ধন-দৌলতের ওপর নির্ভর করে না।

কমিউনিজম বলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলেই শোষণের সৃষ্টি হয়। ইসলামের মতে ব্যক্তির হাতে সম্পদ থাকলেই সাধারণ মানুষের কষ্ট হয় না। তার ধনসম্পদের পরিমাণ কি, সে কিভাবে সম্পদ লাভ করেছে ও কিভাবে খরচ করছে—এসবের ওপরই ভালমন্দ নির্ভর করবে। তাই ইসলাম দেখতে চায় যে, টাকা রোজগারের পথ যেন সৎ ও সঠিক হয় এবং একব্যক্তির হাতে এত টাকা না থাকে, যার ফলে সাধারণ লোকের অসুবিধা হতে পারে।

ইসলাম বলে, মানুষকে সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক হিসেবে মনে করা উচিত নয়। ভাল পথে খরচ করার অধিকার ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে। সে ভালভাবে খরচ না করলে সমাজ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে (হাক্‌কুল্লাহ্—আল্লাহ্‌র হক ও মাস্‌লাহাত বা জনকল্যাণ)। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন ঃ কারুর যদি খুব বেশি টাকা-পয়সা থাকে ও দেশে অভাবগ্রস্ত লোক থাকে, তবে সে টাকার ওপর সাধারণ মানুষের পরোক্ষ হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কমিউনিজম বলেছে ঃ ধর্ম বলতে বোঝায় পুরোহিততন্ত্র; ধর্ম মানুষকে শোষণ করে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, ধর্মের আসল উদ্দেশ্য মানবতা ও সুবিচারমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা। মোল্লা-পুরোহিত ও অশিক্ষা-অনাচার ধর্ম নয়, অধর্ম। ইতিহাস থেকেও আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, ধর্ম ছাড়া মানুষের জীবনে মানবতাবোধ জাগতে পারতো না। কমিউনিজমে সবার জন্য এক আইনও নয়। ইসলামে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার জন্য আইনের নৈতিক ভিত্তি এক।

কমিউনিজম বলে ঃ পরিবারে বাস করলে মানুষের মনে সাধারণ লোকের প্রতি কোন সহানুভূতিবোধ জাগতে পারে না। ইসলামের মতে, পরিবারে বাস করেই হয় মানবিকতার প্রথম উন্মেষ।

---

7. আল্ কোরান-২২ ঃ ৪০।

কমিউনিজম বলে ঃ ধনীদের জন্য যা ভাল, গরীবদের জন্য তার সবকিছুই মন্দ। আর গরীব লোকদের জন্য যা ভাল, বড়লোকদের জন্য তা মন্দ। ইসলাম বলে ঃ কেবলমাত্র পশুত্ব ও নীচস্বার্থের দিক থেকে বিবেচনা করলে তা সত্য বটে, কিন্তু নীচস্বার্থের কিছুটা ওপরে উঠতে না পারলে ভাল সমাজ গঠন করা যায় না। মানবতা ও আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে এ দুই স্বার্থকে এক করতে পারলে তবেই আসবে শান্তি । এ ছাড়া মানুষের মনে ভালমন্দ বলে একেবারে যে কিছুই নেই, এ কথা সত্য নয়। ইসলাম মানুষের সমগ্র সত্তাকে স্বীকার করেছে। বিজ্ঞানকে ইসলাম শুধু স্বীকারই করেনি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্মও দিয়েছে।[৮] পঞ্চ-ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞান স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম লতিকালব্ধ আরও পাঁচটি ইন্দ্রিয়কেও স্বীকার করেছে। এ মানসলোক যে বিশৃংখল নয় ও বৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়, একথাও ইসলাম দেখাতে চেয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশ্লেষণের পদ্ধতি ভিন্ন রকমের। ইসলাম তাই ভাববাদী নয়, জড়বাদীও নয়—ভাববাদ ও বাস্তববাদের মধ্যে মাঝামাঝি পথ।

ইসলামকে কেউ হয়তো স্বার্থে ব্যবহার করে থাকতে পারে। কিন্তু তাতে ইসলামের জীবনদর্শনের মূল্য এতটুকু কমেনি। ইসলামী জীবদর্শনের পরিবেশ প্রয়োজনানুগ রূপায়ণ না করার ফলেই পরবর্তীযুগে সৃষ্টিশীল সমাজ গঠিত হতে পারেনি। মুসলমানদেরকে এজন্য দোষ দেওয়া চলে, কিন্তু এজন্য ইসলামী আদর্শকে দায়ী করা চলে না।

ইসলামী জীবনদর্শনকে রক্ষা করতে হলে যেমন কমিউনিজমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে ও এর সাথে ইসলামের পার্থক্য সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা লাভ করতে হবে, তেমনি ইসলামী জীবনবোধের ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইসলামের মৌলিক আদর্শকে চলমান সমাজের সঙ্গে তাল রেখে পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী রূপায়িত করতে হবে। অস্তিবাচক পদ্ধতির মাধ্যমে এ সংগ্রাম শুরু করলে সাফল্য অনিবার্য।

---

৪. ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ঃ (৩) দেখুন। "নিশ্চয়ই আসমান জমীনের সৃষ্টিতে ও দিবারাত্রের পরিবর্তনে, চিন্তাশীলদের জন্য চিহ্ন রয়েছে।" (আল্‌ কোরান ৩ ঃ ৯০)

!! দুই!!

কমিউনিজম ও ইসলাম

নাস্তিক্যবাদ মার্কসবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শ্রমিকরাষ্ট্র বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকার করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিরোধী প্রচারেও সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সেজন্যই সোভিয়েট রাশিয়ায় শরীয়ত আইন বিলুপ্ত করা হয়েছে। কমিউনিস্টরা ঘোষণা করেছে—কোন ব্যক্তির পক্ষে একই সঙ্গে কমিউনিস্ট ও বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের জীবনে আমরা ধর্মের প্রভাব বরদাশত করতে পারি না।

কমিউনিজমে সুবিধাবাদই সমাজের ভিত্তি। আর ইসলামে সুবিচার ও মৌলিক নীতিবোধ সমাজের ভিত্তিমূল রচনা করে। কমিউনিজমের শ্রেণীসংগ্রামে ঘৃণা, ইসলামের জেহাদে মানবপ্রেম, ন্যায়নীতি ও আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ববোধ। পরাজিত শত্রুর প্রতি রসূলুল্লাহ্‌র (স.) উদার ব্যবহারের সঙ্গে লেনিনের নৃশংসনীতির তুলনা করলেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টি ও জীবনদর্শন, ইসলামী জীবনদর্শনের ঘোর বিরোধিতা করে এসেছে। লেনিন বলেছেন ঃ নাস্তিক্যবাদ মার্কসবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শ্রমিকরাষ্ট্র বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকার করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিরোধী প্রচারেও সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করলেও কমিউনিস্ট পার্টি কখনই জনগণের জন্য আফিমস্বরূপ ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করে না। "ইয়ং বলশেভিক" পত্রিকায় বলা হয়েছে ঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ধর্মের কোন সঙ্গতি নেই।" রাশিয়ার কেন্দ্রস্থল প্রাচীন দোশাম্বীতে স্তালিনাবাদ শহর নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এ শহরে একটিমাত্র মসজিদ, চার্চ ও মিনাগগও নেই। সোভিয়েট রাশিয়ায় শরীয়ত

আইনও বিলুপ্ত করা হয়েছে।[৯] নানা উপায়ে কমিউনিস্টগণ ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষমূলক নীতি চালিয়ে যায়— ধর্মীয় নেতাদের কারারুদ্ধ করে, ধর্মশিক্ষার স্কুলগুলো তুলে দিয়ে ও ধর্মস্থানের সম্পত্তি ও আয়ের উৎসগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে ধর্মীয় জীবনধারার জনপ্রিয়তা বানচাল করার জন্য কমিউনিস্টরা ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে। ১৯৫৭ সালের ১১ আগস্ট ককেশাস অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করা হলো— কোরান নাকি অন্যান্য জাতিকে ঘৃণা করতে মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করেছে। অবিশ্বাসীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদেরকে বিনা বিচারে হত্যা করাই নাকি মুসলমানদের কর্তব্য। এর আটবছর পূর্বে ১৯৪৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর রেডিও মস্কোতে প্রচার করা হলো ঃ কোরানে মানুষের উপর মানুষের যুলুম সমর্থন করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে "বলশেভিক" পত্রিকায় হযরত মুহাম্মদের (স.) সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি সামন্তনেতা ও পুঁজিপতি প্রতিনিধি ছিলেন। আরব গোত্রগুলোর ঐক্যসাধনে ও কেবলমাত্র নিজের ক্ষমতা বজায় রাখবার তাগিদে তিনি ইসলামকে ব্যবহার করেন।[১০] একই পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি প্রবন্ধে মীর জাফর বাগিরভ বলেন ঃ ইসলাম ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানদের কাছ থেকে শোষকদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দাবী করে।

অথচ কোরান শরীফে তৌহিদবাদের ভিত্তিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে উদাত্ত আহ্বান জানান হয়েছে বারে বারে।[১১] ডক্টর হিগিন্‌স্ সত্যই বলেছেন ঃ কোরান গরীবের বন্ধু। ধনীদের যুলুমের বিরুদ্ধে গভীর বিতৃষ্ণা এর সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়।[১২]

সার্বজনীন ন্যায়নীতি ও ইনসাফ কায়েম করবার জন্য কোরান মাজিদ মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

---

9. The Soviet Political Dictionary, 1940.

10. "বলশেভিক", ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৯৫০।

11. আল্ কোরান-১৩ ঃ ১১-আল্লাহ্ কোন জাতির পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন সাধন না করে।

12. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ঃ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নীতি বা যাকাতের ওপর বার বার আলোকপাত করা হয়েছে আল কোরানে। "ধনসম্পদ বৃথা ভোগ করো না বা কাউকে দিও না, যে এর কিছু অংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে।"

কোনও জাতির প্রতিহিংসা যেন তোমাদেরকে অন্যায় পথে নিয়ে না যায়, ইনসাফের সঙ্গে কাজ কর, তবেই সওয়াব হাসিল করতে পারবে।"[১৩]

বিনা অজুহাতে "যে ব্যক্তি কেবলমাত্র একটি লোকও খুন করে, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে খুন করে, আর যে ব্যক্তি একটি মানুষকে বাঁচায় সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রেহাই দিল।"[১৪]

"যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে না ও ধর্মের জন্য তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দেয় না, সে-সব অমুসলিমদের প্রতি ভাল ব্যবহার কর। জেনে রেখো, আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরই ভালবাসেন।"[১৫]

সোভিয়েট কবলিত মুসলিম দেশগুলোতে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ইসলামের প্রতি আনুগত্য বানচাল করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছেন। মুসলিম প্রথানুযায়ী বিবাহ পছন্দ করা হয় না। উযবেকিস্তানের মুসলিম এলাকা ভ্যাবকেন্তে দেখান কামালভ নামে এক ব্যক্তির বিবাহ মুসলিম-প্রথা অনুসারে সুসম্পন্ন হয়। এ বিবাহকে ধর্মীয় কুসংস্কার বলে প্রচার করা হয়। "কোমসো-মোল্ম কায়া প্রাভদা " নামক পত্রিকায় বলা হয়েছে ঃ কোনও ব্যক্তির পক্ষে একই সঙ্গে কমিউনিস্ট ও বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের জীবনে আমরা ধর্মের প্রভাব বরদাশ্ত করতে পারি না। লেনিন বলেছেন ঃ ধর্ম হলো জনগণকে শোষণ করবার জন্য পুরোহিতদের হাতের অস্ত্রবিশেষ।

রাশিয়ায় ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি নিছক নেতিবাচক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। কখনও কখনও সাময়িকভাবে এ নীতি শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই যে, ধর্মীয় নীতি ধর্মস্থান ছাড়া বাইরে প্রচার করা নিষিদ্ধ। স্কুল-কলেজে ধর্মশিক্ষা দেবার অনুমতি দেয়া হয় না। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হতে পারে না। ট্রেইনিন, মেনশাগীন ও ভিশিনস্কি বলেন ঃ নাবালকদেরকে ধর্মশিক্ষা দেয়া বিবেকের স্বাধীনতার বরখেলাফ। তাই বিবেকের "স্বাধীনতার" নীতি সোভিয়েট গঠনতন্ত্রে সংরক্ষিত হয়েছে।[১৬]

---

13. আল্ -কোরান- ৫ ঃ ৮
14. আল্-কোরান- ৫ ঃ ৩২
15. আল্ কোরান- ৬০ ঃ ৮
16. Trainin, Menshagin and Vyshinsky : Commentaries on the Criminal Code.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪২) মুসলমানদের খুশী করবার জন্য Bezbozhnik বা নাস্তিকসমিতি তুলে দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেখা গেল যে, "Soviet Society for Political and Scientific Research" আবার জোরেসোরে ধর্ম বিরোধী অভিযান শুরু করেছে।

চীনা কমিউনিস্টরাও এই নীতি গ্রহণ করেছে। "জেন মিন জিহ্ পাও" শীর্ষক পুস্তিকায় বলা হয়েছে ঃ

"আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস নস্যাৎ করে দেবার নীতিও সমর্থন করি।"[১৭]

চীনা কমিউনিস্টদের আসল উদ্দেশ্য হলো, চীন থেকে ইসলাম তথা ধর্মকে সমূলে উৎখাত ও চিরনির্বাসিত করা। যে-সব ধার্মিক ব্যক্তি ধর্ম পালন করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করা এদের সাধারণ নীতি বলে বিবেচিত হয়। কমিউনিস্ট প্রচার দফতরের প্রধান উযীর লুটিং-ই এই নীতি পরিচালনা করেন।

ইসলামের পয়লা নম্বরের দুশমন হলো কমিউনিজম। যে-সব দেশে কমিউনিজম বিস্তার লাভ করেছে, সেখানে মুসলমানগণের আধ্যাত্মিক অবনতি সাধনে কমিউনিজম খুব বেশি কার্যকরী হয়েছে। কমিউনিজম ধার্মিক ব্যক্তিদের কাছে প্রচার করে যে, কমিউনিজম ইসলামের বন্ধু ও কেবলমাত্র কমিউনিস্ট শাসনে ইসলামের উন্নতি সম্ভবপর হতে পারে। আবার নিছক ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের বিশ্বাসী অর্ধ-ধার্মিক মুসলমানদের কাছে কমিউনিস্টরা প্রচার করে যে, নাস্তিক্যবাদ কমিউনিস্ট দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। কমিউনিস্ট লেখক জসুয়া কুনিট্‌জ (Joshua Kunitz) তাঁর "Down over Samarkand" নামক বইতে একথা স্বীকার করেছেন যে, রাশিয়ার প্রতিটি পল্লীর চাইখানা বা রেস্তোরাঁর দেয়ালে ধর্মীয় নেতাদের উপহাসমূলক নানারঙের প্লাকাড টাঙানো থাকে।[১৮]

১৯০৭ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, ইয়োরোপীয় রাশিয়াতে মসজিদের সংখ্যা ছিল ৭,০০০। ১৯৪২ সালের ১৬ মে প্রকাশিত "Soviet War News" এ দেখা যায় যে, সমগ্র রাশিয়াতে মসজিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১,৩১২-তে। ১৯১৭ সালে ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৮০০। ১৯১৮ সালে এর

---

17. "জেন মিন জিহ্ পাও", ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩।
18. Joshua Kunitz : Down over Samarkand, PP. 250, 20.

একটিরও অস্তিত্ব ছিল না। মসজিদসমেত এসব ধর্ম-শিক্ষার কেন্দ্র নাট্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ, ক্লাব ও গুদামে পর্যবসিত করা হয়েছে। পশ্চিম তুর্কীস্তানের আশ্কাবাদের মসজিদটিকে সিনেমা-হলে রূপান্তরিত করে তার সম্মুখভাগে স্তালিনের প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। বোখারার "মসজিদে কালান", সমরখন্দের "তিলাকারী" ও ফারগানার "শেখ আনতাহুর" ও "খান" মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সমরখন্দের মসজিদ বন্ধ করে সেখানে লিখে রাখা হয়েছে ঃ মুয়াযযিন বিশ্বাসীদের আর আহ্বান করবে না, এখন থেকে তাদের ডাক দেবেন লেনিন, একমাত্র লেনিন।

চীন, আলবানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে কমিউনিস্ট চীনের মনোভাব "কোয়াং মিং জি পাও"-তে লুহুং চীর একটি প্রবন্ধ থেকে জানতে পারা যায়।[১৯] এ প্রবন্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে হযরত মুহাম্মদকে (স.) আক্রমণ করেছেন। পিকিং-এর মুসলমানগণ এতে বিরক্ত হয়ে পত্রিকাটির ছাপাখানা ধ্বংস করে দেবার হুমকি দেন। এরপর থেকে কমিউনিস্ট শাসকগণ খুব হুঁশিয়ার হয়ে যায়। ধীরে ধীরে কমিউনিজমে দীক্ষিত করার জন্য এরা বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে কয়েকটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে দেয়। মুসলমানদেরকে নিয়ে একসঙ্গে সংযুক্ত নীতিও (United Front Policy) চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ক্রমপরিবর্তন ও পরিশেষে সমূলে উৎখাতের মাধ্যমে স্বাধীন ইসলাম ও ইসলামী চিন্তাধারাকে নিঃশেষ করবার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কমিউনিস্টদের "Common Programme"-এর পঞ্চম ও আটাশি দফায় ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করার ফলে প্রথমদিকে ধর্মীয় দলগুলো আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু শেষটায় ধর্মবিরোধী অপপ্রচার রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করলো।[২০] উপাসনার বিরোধিতা করা ধর্মীয় স্বাধীনতার অঙ্গ হিসেবেই বিবেচিত হয়।[২১]

চীনদেশের বাইরে মুসলমানদের পাঠানো হয় মুসলমান দেশগুলোকে চীনের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে। চীনা উযীরে আযম চু এন লাই বান্দুং সম্মেলনে কয়েকজন মুসলিম ইমামকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এ নীতির ফলে কমিউনিস্ট চীন

---

19. "কোয়াং মিং জি পাও", ১০ জানুয়ারি, ১৯৫১।
20. "জেন মিন জিহ্ পাও", ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০।
21. Edgar Snow : Red Star Over China, P. 170.

সহজেই মিসর, সিরিয়া ও ইয়ামেনের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তথাকথিত "চীন ইসলামী সমিতি"র মাধ্যমে চেয়ারম্যান বুরহান কমিউনিস্ট প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। " চীনা হুই" বা চীনা মুসলমান সমিতি এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কোরান শরীফের আয়াত উদ্ধৃত করে মার্কসবাদের সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। মসজিদের ইমামদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তাঁরা যেন "কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের নেতৃত্বে" কোরান-ভিত্তিক ইসলামী নীতি মেনে চলেন।[২২] এটা সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে স্বল্পমূল্যে দ্রব্যাদি সরবরাহের নীতি ও শুল্ক থেকে অব্যাহতি দিয়ে ওপর ওপর মুসলমানদেরকে দলে টেনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে চীনা কমিউনিস্টদের লেখা বই ও মাও-সে তুং-এর বই আরবি ভাষায় তরজমা করে মধ্যপ্রাচ্যে বিলি করা হয়েছে। The Muslim Classical Institute-এর মাধ্যমে একই নীতি অনুসৃত হয়েছে।

১৯৪৯ সালে পূর্ব-তুর্কীস্তান বা সিনকিয়াং কমিউনিস্ট কবলে আসে। বহু আলেম, মুসলিম কর্মচারী ও নেতাকে বন্দী করা হয়। "Sinkiang Thee Pau" নামক পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, মাওয়ানের ক্যাম্পে প্রায় ৩,০০০ বন্দীকে আটক করে রাখা হয়েছে। আহমদ জান, ইসহাক বেগ, আবদুল করীম আবাসভ, দলিল খাঁ, লিসু বাং, চেং আন ফু, শাও শুফু, শাও চেং তান, চাং উং, কাযাক নেতা উরাজ বাই ও অন্যান্য অগণিত তুর্কী মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। প্রথম তুর্কীস্তানী গভর্নর জেনারেল ডাঃ মাসুদ সাবেরীকে বন্দী করে পরে হত্যা করা হয়।

মাও সে তুং তাঁর "নতুন গণতন্ত্রে" স্পষ্ট করেই বলেছেন ঃ "যাঁরা ধর্ম বা ভাববাদে বিশ্বাস করেন, রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা কমিউনিস্টরা তাঁদের সাথে সংযুক্ত-ফ্রন্ট গঠন করে কাজ করতে পারি। কিন্তু দার্শনিক ভাববাদ বা ধর্মের সাথে আমাদের কোনও কারবার থাকতে পারে না।"[২৩]

ধর্মীয় ব্যাপারে কমিউনিস্ট চীনে সম্পূর্ণ সুবিধাবাদী নীতি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। কানসু-শান্সী অঞ্চলের মুসলমানরা ১৯৪৭ সালে সাফল্যজনকভাবে

---

22. "কোয়াং মিং জি পাও", ২৫ মে, ১৯৫৫।
23. "নতুন গণতন্ত্র", অনুবাদ সরোজ কুমার দত্ত, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা, ১৯৪৫, ৫১ পৃষ্ঠা।

কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ করেন। ১৯৫০ সালে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে কমিউনিস্টরা এ অঞ্চলে প্রবেশ করে ও খুব সতর্কতার সাথে অপপ্রচার চালিয়ে যায়। মুসলমানদের খুশী করার জন্য দ্বিতীয় জাতীয় কমিটিতে মা সুং তিং ও তা পু কোন্ নামক মুসলিমকে গ্রহণ করে। লেনিনও অনুরূপ কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেবার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।[২৪]

চীনের মুসলমানরা অধিকাংশই শেন্‌সি-কানসু নিংসিয়া ও জেচুয়ান ও সিনকিয়াংকে বসবাস করেন। ১৯৩৪ সালের "কিয়াংসি যাত্রা"র পর সিয়ানফুতে কমিউনিস্টগণ সদর দফতর প্রতিষ্ঠা করে। মুসলমানরা চিয়াং কাইশেকের চৈনীকরণ নীতির তীব্র বিরোধিতা করতেন। কমিউনিস্টরা এ মনোভাবকে নিজেদের কাজে লাগায়। ১৯৩৯ সালে যখন জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল, তখন "চীনা ইসলামী জাতীয় মুক্তি ফেডারেশনের" দাবীতে ইসলামী সংস্কৃতিকে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ্য হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। ১৯৩৪ সালে "আপনাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলুন" এ শ্লোগান দিয়ে কমিউনিস্টরা মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ইসলামী সংস্কৃতি রক্ষা করবার ও চীন, বহির্মংগোলিয়া, সিনকিয়াং ও সোভিয়েট রাশিয়ার মুসলমানদের নিয়ে এক রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[২৫] কিন্তু কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ ওয়াদা আদৌ রক্ষিত হয়নি।

গোড়ার দিকে আলবানিয়াতেও ধর্মীয় শিক্ষার কথা জোর গলায় প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু পরে ধর্মীয় শিক্ষা তুলে দেয়া হয়।[২৬] কমিউনিস্ট বিষয় ছাড়া আর সব ধর্ম বা দর্শন আজ সেখানে নিষিদ্ধ। তেপেলিন, বেরাত ও তিরানার ক্যাম্পে অগণিত মুসলিম "রাষ্ট্রদ্রোহী"-কে আটক রাখা হয়েছে।[২৭] মুস্তাফা জিনিসী, কোকোশিও ও জেনারেল জোজীকে হত্যা করা হয়েছে।

যুগোশ্লাভিয়ায় সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু কার্যতঃ মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলো আজ অবলুপ্তির পথে। "রাইস্-উল্-উলামা স্পাহো" এর মধ্যে অন্যতম।

---

24. Marx-Engels, Marxism, Moscow, 1947, P. 247.
25. Edgar Snow, Red Star Over China, London, 1946, P. 320.
26. The Reader's Digest, October, 1947.
27. Dawn, August 3, 1947.

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট সরকার ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৬০ হাজার মুসলমানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁদের বুলগেরিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়। কোন কোন ব্যক্তিকে এই হুকুম দেয়া হয় যে, তাঁরা যেন ১০/১২ দিনের মধ্যে সম্পত্তি বিক্রয় করে বুলগেরিয়া পরিত্যাগ করেন। ফলে তাঁরা বিনামূল্যে সম্পত্তি হস্তান্তর করে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। চারনো শহরে স্তালিনের মূর্তি তৈরির বাবদ প্রত্যেকের কাছ থেকে ২৫ পাউন্ড করে আদায় করা হয়।[২৮]

সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা মানেই যে পুঁজিবাদের সাগরেদ হওয়া, এটা ডাহা মিথ্যা কথা ও ঘৃণ্য অপবাদ। ইসলামের বিশ্বদৃষ্টির দিক থেকেই তাঁরা কমিউনিজমের বিরোধিতা করে এসেছেন। কমিউনিস্ট শাসনে বিরোধিতার অর্থ মৃত্যুবরণ করা, তবু তাঁরা ক্ষান্ত হননি।

কমিউনিজমে সুবিধাবাদই সমাজের ভিত্তি। কিন্তু বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মুসলমানরা নিছক সুবিধাবাদকে জীবনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি। ইসলামে সুবিচার ও মৌলিক নীতিবোধই সমাজের ভিত্তিমূল রচনা করে। কমিউনিজমের শ্রেণীসংগ্রামে ঘৃণা, ইসলামের জেহাদে মানব-প্রেম, ন্যায়নীতি ও আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ববোধ। পরাজিত শত্রুর প্রতি রসূলুল্লাহ্‌র (স.) উদার ব্যবহারের সঙ্গে লেনিনের নৃশংসনীতির তুলনা করলেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজকের দিনে আমাদেরকে তাই যেমন একদিকে কমিউনিস্ট স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, তেমনি সামাজিক পরিবেশ ও আধুনিক চাহিদা অনুযায়ী ইসলামের জীবন-দর্শনকে সুষ্ঠুরূপে রূপায়িত করতে হবে। নিছক ভাব-প্রবণ "revivalism" বা পুনরুজ্জীবনে বিশেষ কোনও ফায়দা হবে না।

---

28. Morning News, February 17, 1951.

!! তিন !!

কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম

ইসলামের নেতিবাচক দিকটা নিয়ে কমিউনিস্টরা জোর প্রচার চালায়, কিন্তু মৌলিক অস্তিবাচক নীতিগুলোকে ধ্বংস করে দেবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

সত্যিকার ধর্মীয় আদর্শ ও ধর্মান্ধতা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। কারণ একটির জন্ম হয় বিবেকের স্বাধীনতা থেকে ও অপরটিকে অজ্ঞানতার কুফল বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কমিউনিস্টরা এই ধর্মান্ধতাকে কমিউনিজম প্রচারে কাজে লাগিয়েছে। তুর্কমেনিয়ার রাজধানী আশকাবাদে "নাস্তিক্যবাদী বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

ইসলাম ধর্ম ও জীবন-ব্যবস্থার উপর কমিউনিস্টরা যে হামলা চালিয়েছে, তা নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার নয়—কমিউনিস্ট নীতি ও দর্শনের সঙ্গেই এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সোভিয়েট-কবলিত মুসলিম দেশগুলোতে জীবনযাপন প্রণালী খুব উঁচু ধরনের নয়—জীবনযাত্রার মানও আজ পর্যন্ত খুব নীচুই রয়ে গেছে। এসব দেশে সত্যিকার ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব নেই। অবাধ বহুবিবাহ ও শিশুকন্যা বিবাহ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এসব প্রথা হয়তো অনেকটা কমে আসছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এসব কুপ্রথা ইসলামী জীবন-দর্শন কখনই মেনে নিতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া ইসলামের মৌলিক নীতিগুলো বিলুপ্ত করে দেবার ষড়যন্ত্রও চালিয়ে যাচ্ছে। এমন সব জড়বাদী ও নাস্তিক্যপ্রসূত "নীতি" আমদানী করা হচ্ছে, যেগুলোকে সাধারণ মুসলমান ঘৃণার চোখে না দেখে পারেন না। আরও মজার ব্যাপার এই যে, বহুবিবাহ, শিশু-বিবাহ ও স্ত্রীর প্রতি অপব্যবহারের বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির হোমরাচোমরা কর্মচারীরা রেকর্ড স্থাপন করেছেন। Pravda Vostoka" পত্রিকায় একথার স্বীকৃতি মেলে।[২৯]

---

29. Pravda Vostoka, June, 1955 and March, 1956.

উযবেকিস্তান রেলওয়ের কর্মচারী তখ্‌ত মুরাদ ইকরামভ কমপক্ষে ছ'টি বিবাহ করেছে ও সে তার কোন কোন স্ত্রী ও শিশুকে পথে বসিয়েছে। কমিউনিস্ট আভেযভ দু'বছরে ছয়টি মহিলাকে বিবাহ করে আবার তালাক দিয়েছে। তুর্কমেনিয়ার আইনাযারভেরও বহু স্ত্রী আছে।[৩০] স্কুলের ছোট ছোট মেয়েদেরকেও কমিউনিস্ট কর্মচারীদের সঙ্গে বিবাহ দেয়া হয়।[৩১]

কাজেই দেখা গেল যে, সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব পুষে রাখার জন্য কমিউনিস্টরাই অধিক দায়ী। ওরাকুলভ নামে এক কমিউনিস্ট তাসকেন্ত শহরের এক স্কুল-শিক্ষক। কিন্তু ওরাকুলভ তার মাকে কোনও সাহায্য পাঠায় না; কমিউনিস্ট সরকার কিন্তু তবু মোটেই হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু ইসলামী আদর্শ এ আচরণ বরদাশ্‌ত করতে পারে না।

ইসলামের নেতিবাচক দিক নিয়ে কমিউনিস্টরা খুব বেশি প্রচার চালায়, কিন্তু মৌলিক অস্তিবাচক নীতিগুলোকে ধ্বংস করে দেবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। "পুরোনো প্রথা" —এই নাম দিয়ে তারা মুসলিম পরিবারব্যবস্থা ধ্বংস করে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে—ধর্মীয় উৎসবাদি ও বিবাহ তারা সম্পূর্ণরূপে তুলে দিতে চাইছে। তোশা আভেজভ্‌ নামে জনৈক উযবেকিস্তানী তাঁর ছেলের "মুসলমানী" দেবার মনস্থ করেন। এতে মোল্লা সাহেবকে ডাকা সম্ভব হয়নি। কারণ, তা হলো বে-আইনী বন্ধুরাই মোল্লার কাজ করেন। এই অপরাধের জন্য আভেজভ্‌কে বরখাস্ত করা হয়। উযবাশেভ্‌ নামে জনৈক অর্থ-নীতিবিদ ধর্মীয় বিবাহের আয়োজন করেন। এতে তাঁকে ও তাঁর বন্ধুদেরকে শাস্তি দেবার জন্য কাগজে বিরাট হৈ-চৈ পড়ে যায়।[৩২] ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব পালন করার জন্য বৃদ্ধ ও যুবকদেরকে সমালোচনা করা হয়। এসব যুবকদের মধ্যে অনেকে "Komsomol" বা কমিউনিস্ট যুবদলের সদস্য। পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে মুসলমানদেরকে শূকর পালনের জন্য উৎসাহিত করা হয় ও বছর বছর অধিকতর সংখ্যায় শূকর রাষ্ট্রকে প্রদান করতে হয়।[৩৩]

কমিউনিস্টরা মুসলিমের জাতীয় আদর্শ ও জীবনপদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। কিন্তু এ আদর্শ মুসলিম জীবন-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কমিউনিস্টদের মতে নীতিবোধ সম্পূর্ণরূপে অর্থনীতি ও উৎপাদন-পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। তাই মসজিদে নামায পড়তে নিষেধ করা হয় ও আল্লার কথা ও সাধারণ মানবিক নীতির

---

30. Turkmens Kaya Iskra, January 5, 1956.
31. "ইজভেস্তিয়া", ২৫ নভেম্বর, ১৯৪৫।
32. Bakinsky Rabochy, July 16, 1955,
33. Sovetskaya Kirghizia, November 11, 1955.

কথা ভুলে যাবার জন্য নানা প্রলোভন দেখানো হয়। ক্লাবে যোগদান করিয়ে শ্রেণী -সংঘর্ষে লিপ্ত করাই কমিউনিস্ট যুবদলগুলোর মূল লক্ষ্য। মনে করা উচিত যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র এক পয়সাও খরচ করে না। মসজিদের জন্য মুসলমানরা চাঁদা তোলেন, কিন্তু সোভিয়েট সরকার এ টাকা সবসময় মসজিদে খরচ করতে দিতে চায় না। কারণ, তা নাকি একেবারেই অকেজো ব্যাপার।[৩৪] দুঃস্থ মানবতার সেবা ইসলামের মৌলিক নীতি। কিন্তু ইসলামের দিক থেকে এসব ইতিবাচক ব্যাপারে সংঘবদ্ধ হতে রাশিয়া বার বার বাধা দিয়ে এসেছে।

সোভিয়েট "Criminal Code"-এ ৫৮ ধারায় একথা খুব স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে ঃ

ধর্মপন্থী কর্মচারী ও নাগরিকদেরকে "প্রতিবিপ্লবী" হিসেবে গণ্য করতে হবে।

১২২ দফায় আছে ঃ

সরকারি বা বেসরকারি স্কুলে ধর্মীয় নীতি শিক্ষা দেয়া নিষেধ। এ আইন অমান্য করলে এক বছরের কারাবাস ভোগ করতে হবে।

রুশ কমিউনিস্ট কিরভের পীড়াপীড়িতে উত্তর-ককেশাসের মুসলমানরা মসজিদের বাইরে ও ভিতরে সোভিয়েট নেতাদের ছবি ঝুলাতে বাধ্য হন। ক্রিমীয় তাতারদের মুফ্‌তী কারাটাইস্কী কয়েকজন মুসলিম ধর্মীয় নেতার অধিকারের স্বপক্ষে কথা বলেন। এ কারণে ১৯৫২ সালে কমিউনিস্টরা তাঁকে হত্যা করে। আরয বাইজানের ধর্মীয় নেতা মীর আহমদ করীম আগা গাজী সমেত হাজার হাজার ধর্মীয় মুসলমানকে মেরে ফেলা হয়েছে। ১৯৩৭ সালে মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাশাফ তিয়াব শেমিয়ানকে গুলী করে হত্যা করা হয়। আবুতালিব আখন্দ ও শেখ গণী আখন্দেরও একই দশা হয়। হাজী মাজুমুদ্দীন, হাজী উযান ও শেখ কাজী হাসান সমেত ককেশাসের হাজার হাজার ধর্মীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। অনেক ব্যক্তিকে নির্বাসিত করা হয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলের ধর্মীয় মুসলমানরাও রেহাই পাননি—তাঁদের অনেক পরিবারকে স্ত্রী-পুত্র সমেত হত্যা করা হয়েছে।

মুসলমানরা মসজিদে নামায পড়তে যান বলে তাঁদেরকে প্রকাশ্যভাবে সমালোচনা করা হয়। বোখারার মীর-ই-আরব ও তাসকেন্তের বারাকখান মাদ্রাসা চালু করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ইসলামী আদর্শ প্রচার করবার উপায় নেই। ১৯৫২ সালে মস্কোর বড় মসজিদের ইমাম আহ্‌মদিয়ান মুস্তাফিন সোভিয়েট রাশিয়ার মুসলমানকে ঈদুল-আয্‌হা বা কোরবানীর ঈদ পালন না করতে স্পষ্টতঃ নির্দেশ দেন। ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেছেন ঃ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম খুব বেশি জোরদার করে তুলতে হবে।

---

34. Ostprobleme No. 7, 1955. P. 35.

অথচ বাইরের দুনিয়ায় রাশিয়া মুসলমানদের স্বাধীনতার কথা জোর গলায় প্রচার করে। বিভিন্ন দেশ থেকে যে-সব ব্যক্তি সোভিয়েট রাশিয়া সফর করেন, তাঁদেরকে সমরখন্দের রাগিস্তান প্রাসাদ ও বাকুর মিউজিয়মে নিয়ে যাওয়া হয় না। কারণ, এগুলো নাস্তিক্যবাদ প্রচারের কেন্দ্রস্থল। কাযাকিস্তানী মুসলমানদের "আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের" সহ-সভাপতি জিয়াউদ্দীন বাকা খাঁকে বান্দুং সম্মেলনে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এ-সব করে কি তুর্ফা, বাশকিরিয়া ও খোরেযম—এই সব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবলুপ্তির কথা লুকিয়ে রাখা যাবে? সত্যিকার ধর্মীয় আদর্শ ও ধর্মান্ধতা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। কারণ, একটির জন্ম হয় বিবেকের স্বাধীনতা থেকে ও অপরটিকে অজ্ঞানতারই কুফল বলা যেতে পারে। কমিউনিস্টরা কিন্তু এই ধর্মান্ধতাকে কমিউনিজম প্রচারের কাজে লাগিয়েছে। প্রত্যেক যৌথ খামারে (Kolkhoz) নাস্তিক্যবাদ প্রচারের কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তুর্কমেনিয়ার রাজধানী আশকাবাদে "নাস্তিক্যবাদী বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চল্লিশ বছর পরেও ইসলামের প্রভাব শেষ হয়ে যায়নি; তাই নাস্তিক্যবাদের বাহক স্নেসারেভ দুঃখ প্রকাশ করে এ বিষয়ে তদন্ত দাবী করেছেন। "আমাদের মুসলিম সংস্কৃতি", "মুসলিম স্বাতন্ত্র্য" এ-সব কথা কমিউনিস্টদের কানে খুব বেশি করে বাজে। তারা যে কেবল ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়, তাই নয় মুসলমানদের গোটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমূলে বিনষ্ট করতে তারা বদ্ধপরিকর।

কমিউনিস্টরা প্রচার করে যে, ইসলামে বাস্তবজগৎ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে যাঁদের সামান্যতম জ্ঞানও আছে, তাঁরা জানেন যে, ইসলাম একটি বাস্তব জীবনাদর্শ। আল্-কোরানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এ জীবনকে অবহেলা করো না।" তাই জীবনকে তৌহিদের উপর ভিত্তি করে সুষ্ঠুরূপে সংগঠিত না করলে ইসলামী সমাজব্যবস্থা কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ জন্যই রসূলুল্লাহ (সা.) সন্ন্যাসবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন।

ধর্মকে দমন করা সত্ত্বেও নানা জায়গায় ধর্মীয় আবেদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কারণ, ইসলাম নৈতিক নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করে মানুষের মনে শান্তি এনে দিতে পারে।

ডা. কারচার রিপোর্টে জানা যায় যে, সোভিয়েট জীবন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনেক সময় খোলাখুলি মত প্রকাশ করা হয়। "Komsomols Kaya Pravda"-তে স্বীকার করা হয়েছে : বৃদ্ধ ও যুবক সবাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৩৫]

---

35. Komsomols Kaya Pravda, July 1, 1954.

!! চার !!

কমিউনিস্ট কবলে মুসলমান

রাশিয়ার মুসলমানরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি কামনা করেন, কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনকে বানচাল করে দিয়ে তাঁরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাইতে পারেন না, নিজস্ব স্বাধীন সত্তাকে তাঁরা অবহেলিত ও পদদলিত হতে দিতে পারেন না।

বিশ্বমুসলিমকে আজ কমিউনিস্ট বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কমিউনিস্ট শাসনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও ঔদাসীন্যই অনেকের মনে অহেতুক সম্মোহনের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সোভিয়েট শাসন সম্পর্কে যাঁদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা একথা ভালভাবেই জানেন যে, সোভিয়েট শাসনের অষ্টোপাশ ও লৌহশাসনে মানবিক সত্তার অবনতি চরমে পৌঁছে।

হাজার হাজার মুসলমান কমিউনিস্ট শাসনে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে রাশিয়া পরিত্যাগ করে ইউরোপে অথবা প্রতিবেশি মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু আরও মুসলমান যে সোভিয়েট রাশিয়ায় রয়ে গেলেন, তার ইয়ত্তা নেই। রাশিয়ার মুসলমানরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি কামনা করেন। কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনকে বানচাল করে দিয়ে তাঁরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাইতে পারেন না। নিজস্ব স্বাধীন সত্তাকে তাঁরা অবহেলিত ও পদদলিত হতে দিতে পারেন না। কমিউনিস্টরা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনে যে "স্বাধীনতা"-টুকু স্বীকার করেছে, তা নিছক লোক দেখানো ব্যাপার—মুসলমান হিসেবে তাঁদের জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্য আদৌ স্বীকৃত হয়নি। ১৯৫৭ সালে "ইন্দোনেশিয়া রাজা" পত্রিকায় সত্যিই লেখা হয়েছিলো : সাময়িকভাবে কখনও কখনও ইসলামকে স্বীকার করা হয় বটে, কিন্তু তা দেখে যেন কমিউনিস্টদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধর্মীয় আদর্শে বিশ্বাসিগণ প্রতারিত না হন।

স্তালিন তাঁর "National Problem and Leninism" নামক বইতে ভাষা, স্থান, অর্থনৈতিক জীবন ও মানসিকতা নিয়ে জাতীয় সংস্কৃতি বিশিষ্ট সত্তা গড়ে উঠলে তবেই জাতীয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করতে চেয়েছেন।[৩৬] কিন্তু যে-সব জাতিকে পদদলিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এ সব মাপকাঠির সব-ক'টাই বিদ্যমান ছিল। "বলশেভিক" পত্রিকায় শ্রেণীসংঘর্ষের ভিত্তিতে জাতীয় নিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা আছে।[৩৭] কিন্তু অগণিত সাধারণ তাতারদের বেলায় তা কি প্রতিপালিত হয়েছে? এদেরকে "বুর্জোয়া" বলতে যাওয়া হাসির খোরাক যোগানো বৈ আর কিছুই নয়।

বিভিন্ন মুসলিম এলাকাগুলো রাশিয়ান দ্বারা ভর্তি করা হচ্ছে। ১৯১৪ সালে রুশদের সংখ্যা শতকরা পাঁচজনের বেশি ছিল না। ১৯৪৫ সালে এদের সংখ্যা শতকরা ৩৫ জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কাযাকিস্তান বিজ্ঞান একাডেমীতে কর্মচারীদের অধিকাংশই রুশ। ১২৯৩ জনের মধ্যে কাযাকদের সংখ্যা মাত্র ৫০০ জন।

চীনের মুসলমানদের অবস্থাও শোচনীয়। নানকিং ও অন্যান্য শহরে বহুযুগ ধরে মুসলমানদেরকে শহরের প্রাচীরের বাইরে বসবাস করতে হয়। কমিউনিস্ট শাসনে এর কোন পরিবর্তন হয়নি। "তাঁরা মুসলমান হলেন কেন"—এই বলে তাঁদেরকে আক্রমণ করা হয়। কানসু ও নিংসিয়া অঞ্চলে শতকরা ৫০ জনের বেশি মুসলমান— আর ইউনানে শতকরা ২৫ জন। চীনা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সত্তা বিলুপ্ত করবার ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা তো দূরের কথা, সাধারণ কতকগুলো অধিকার দাবী করার ফলে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে।

চীনে মুসলিম নির্যাতনের ফলে মুসলমানরা ডা. মাসুদ সাবেরীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন। ওসিমানকে হত্যা করা সত্ত্বেও মুসলমানগণ ইমিং ও আ হো মাইতি কুনি ও শাইমু-র নেতৃত্বে বিদ্রোহ চালিয়ে যান।

গত ২৩ জানুয়ারি (১৯৫৯) খবর পাওয়া গেল যে, চীনের যিংহাই প্রদেশে পাঁচজন মুসলিম ধর্মীয় নেতাকে বিশ হাজার লোকের সামনে হত্যা করা হয়েছে। আর পনরজনকে জেল দেয়া হয়েছে। লিইচিয়েনও জিয়াহুলা-কাউয়ের মসজিদের নামাযীদেরকে নাস্তনাবুদ করা হয়েছিল। এইসব নির্যাতনের ফলে সিনকিয়াং অঞ্চলে মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে।

ইসলামের সঙ্গে চীনের মুসলমানদের সংযোগ বহু শতাব্দীর। চীনের অধিকাংশ মুসলমান জাতিতে চীনা নয়, তুর্কী। হযরত মুহাম্মদের (স.) মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে

---

36. Stalin : National Problem and Leninism, Vol II, P. 333.
37. "বলশেভিক", তৃতীয় সংখ্যা ২১–৩৬ পৃষ্ঠা।

(৬২৭ খ্রিস্টাব্দে) ক্যান্টনে প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের ৪৫টি সংখ্যালঘুর মধ্যে ১০টি মুসলমান। সংখ্যালঘুদের মোট সংখ্যা হলো ৩ কোটি ৫০ লক্ষ; এর মধ্যে ১ কোটি মুসলমান। তুর্কী উইঘুর হলো সবচাইতে বৃহৎ সংখ্যালঘু—এদের সংখ্যা হলো ৩৬ লক্ষ ৪০ হাজার। চীনে সবচাইতে ক্ষুদ্র মুসলিম সংখ্যালঘু হলো পাও আন। এদের সংখ্যা মাত্র চার হাজার।[৩৮]

চীনা মুসলিমের বিশ্বদৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক মূল্যবান ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। ইসলামের সামাজিক বিধান ও কোরানের প্রতি আনুগত্য এঁদেরকে এক করে রেখেছে। চীনের মুসলমানদের অবস্থা সচ্ছল নয়। শহরে এঁরা ছোট ছোট কারবার করেন। পল্লী-অঞ্চলে এঁদের জীবিকা হলো পশুপালন ও কৃষি। শেচুয়ান অঞ্চলে এঁরা তিব্বতের সঙ্গে চায়ের ব্যবসায় পরিচালনা করেন। গরুর গোশ্‌ত ও চামড়ার কারবার এঁদের হাতেই রয়েছে। চামড়া ও ধাতুর ওপর কাজে এঁরা বিশেষ পারদর্শী।

কমিউনিস্ট রাষ্ট্র নিজেদের সুবিধামত মুসলমানদের অধিকার কখনও কখনও স্বীকার করেছে। আবার সুযোগ পেলেই ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালিয়ে সে জীবনাদর্শকে সমূলে উৎখাত করতে চেয়েছে। ছিটেফোঁটা সুযোগ-সুবিধাকে কিছুতেই কমিউনিস্টদের সাধারণ নীতি বলে মনে করা যায় না। কিন্তু সোভিয়েট প্রচার দফতর থেকে এই আপাত-সুবিধাকেই সাধারণ কমিউনিস্ট নীতি বলে খুব ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে।[৩৯] সাম্রাজ্যবাদীদের মত কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদীরাও ইসলামের নাম করে উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করছে।

বিশ্ব-মুসলিমকে আজ কমিউনিস্ট অভিশাপ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কারণ, নাস্তিক্যবাদী কমিউনিজমের সঙ্গে ইসলামের কোনও সমঝোতা হতে পারে না। কমিউনিস্ট শাসনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও ঔদাসীন্যই অনেকের মনে অহেতুক সম্মোহনের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সোভিয়েট শাসন সম্পর্কে যাঁদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা একথা ভালভাবেই জানেন যে, সোভিয়েট শাসনের অক্টোপাস ও লৌহশাসনে কিভাবে মানবিকতার অপমান ও দুর্দশা চরমে পৌঁছে।

কমিউনিস্ট কবলিত হাজার হাজার মুসলমানকে আজ সংঘবদ্ধ হতে হবে, যাতে করে নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে ও সত্যিকার মানুষের মত জীবনযাপন করতে পারে।

---

38. Current Affairs, Peking, No. 17. September, 17. 1956.
39. G. Spasov : Freedom of Religion in the Soviet Union, 1954.
    Soviet News, November, 1958, July. 958, October, 1958

!! পাঁচ!!

কমিউনিস্ট কবলে মুসলমান (২)

প্রাচীনকালে সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক দিকেই খুব বেশি প্রকট হয়ে উঠতো। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে রাশিয়া এই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

. সোভিয়েট শাসনে বিচারকদের কাজ আইনের রূপায়ণ নয়—কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের হুকুম তামিল করা। এ অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে রুশ সাম্রাজ্যবাদী যুলুমের বিরুদ্ধে কোনও বিচার লাভ করাই সম্ভব হয়নি।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে রয়েছে দু-একটা একঘেয়ে কথা—আল্-কোরানে সমগ্র মানবজীবনের মৌলিক জীবনাদর্শ। পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে ইজতিহাদের মারফত এ আদর্শের রূপায়ণ করলে যে সমাজ-ব্যবস্থা, তা নিঃসন্দেহে জড়বাদী কমিউনিজমের বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

দুনিয়ায় মোটামুটি তিন রকমের সাম্রাজ্যবাদ দেখতে পাওয়া যায়—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। প্রাচীনকালে সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক দিকেই খুব বেশি প্রকট হয়ে উঠতো। শিল্প-বিপ্লবের পর বিদেশী রাজার দখলের জন্য আবার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পত্তন হলো। ব্রিটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদকে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বলা যেতে পারে। আবার, গায়ের জোরে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে একক সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে অন্যান্য জাতিকে আবদ্ধ করাকে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে রাশিয়া এই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েট-কবলিত মুসলিম দেশগুলোতে চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। দেশগুলোর অবস্থানিক গুরুত্ব এবং খাদ্য, কৃষি ও খনিজ সম্পদের জন্য রাশিয়া লোভাতুরদৃষ্টিতে এ-দেশগুলোর দিকে চেয়ে থাকে।

বিপ্লবোত্তর যুগে লেনিন মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তি রক্ষা করার ওয়াদা দিয়েছিলেন। খুব ফলাও করে বাকু-সম্মেলনেও একথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু শেষটায় তা রক্ষিত হয়নি। মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আনবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিলো। রাশিয়ায় কমপক্ষে ছয় কোটি মুসলমানের বাস। এ-সব মুসলমানকে যেভাবে শতধা-বিভক্ত করা হয়েছে, তা থেকেই সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্দেশ্য ধরা পড়ে যায়। আভ্যন্তরীণ স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশগুলোর শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। মুসলিম অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় কমিউনিজম গ্রহণ করেননি—মস্কো থেকে সৈন্য পাঠিয়েই তাদেরকে কমিউনিজম কবলে নিয়ে আসা হয়েছে। রাশিয়ার ইতিহাস থেকে এ অধ্যায়টুকু অবশ্য একেবারে বাদ দিয়ে রাখা হয়েছে। বিপ্লবের পর থেকে আজ অবধি এ সব অঞ্চলে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করবার জন্য নির্বাধ শোষণনীতি পরিচালিত হয়েছে। ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে (মার্চ) মস্কোতে নিখিল রাশিয়া মুসলিম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ কংগ্রেসে মুসলমানগণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। ১৯১৮ সালে কমিউনিস্ট মুসলিম বিষয়ক কমিসারিয়ট গঠন করে। দু'বছর পর এ সংস্থা ভেঙে দেয়া হয়। ১৯১৭ সালের শেষ নাগাদ, মধ্য-এশিয়ার কোকন্দে আঞ্চলিক মুসলিম কংগ্রেসের বৈঠক বসে। এ সম্মেলনে এক নয়া সরকার গঠন করা হয় ও তুর্কীস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু গণপরিষদ বসার পূর্বেই স্বাধীনতাকামী তুর্কীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় ও বাড়ি-ঘর-দুয়ার পুড়িয়ে দেয়া হয়। সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণে ৮ লক্ষ মুসলমান প্রাণ হারান। আবার ১৯১৮ সালের প্রথমদিকে, বাশকিরগণ তাঁদের নিজস্ব সরকার গঠন করেন। গোড়ার দিকে এ সরকার স্বীকার করা হলেও পরে ১৯১৯ সালের শেষদিকে রাশিয়া এখানে জোর করে সোভিয়েট সরকার গঠন করে। এ অঞ্চলের মুসলমানরা সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে দু-দু বার (১৯১৯-১৯২১) বিদ্রোহ করেন। ১৯২০ সালের শেষদিকে লালফৌজ দাগীস্তান দখল করে। দাগীস্তানীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সে বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করা হয়। এ-সব আন্দোলন সম্পর্কে সপ্তম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত "বাসমাজ্জী" গেরিলা-বাহিনী রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এঁরা জেহাদ ঘোষণা করেন। পরিশেষে এ গেরিলা-বাহিনী ও লালফৌজের কাছে পরাজয় বরণ করে। ১৯২৪ সালে বোখারার আমীর ও খিভার খানের পদ দুটি বিলুপ্ত করা হয়। তুর্কীস্তানকে তথাকথিত "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" ও "স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে" বিভক্ত করা হয় ও তুর্কমেন, কাযাক ও কিরঘিজ এই সব বিভিন্ন অঞ্চলের পত্তন হয়। বাশকির ও তাতার জাতিকে জোর করে আলাদা করে রাখা হয়।

আলবানিয়ার তিন ভাগের দু'ভাগ লোক মুসলমান। এরা স্বেচ্ছায় কমিউনিজম গ্রহণ করেনি। ভূমি জাতীয়করণের কথা ও বে-দের বিরুদ্ধ নীতি অবলম্বন করার ওয়াদা দিয়ে হোক্সহা (Hoxha) মুসলমানদেরকে কমিউনিস্ট কবলে নিয়ে আসে।

কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসৃত হবার ফলে মুসলমানদের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। ১৯১৭ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, সোভিয়েট রাশিয়ার মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি। ১৯৫৫ সালের ১০ ডিসেম্বর শ্রীনগরে ক্রুশ্চেভের ঘোষণা অনুসারে তা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৫০ লক্ষে। ক্রুশ্চেভের বর্ণনাই যদি সঠিক ও নির্ভুল হয়, তবে এ প্রশ্ন করা বোধহয় অন্যায় হবে না যে, ২ কোটি ৫০ লক্ষ মুসলমান কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন? তাছাড়া এঁদের লোকসংখ্যাও কি এতদিনে মোটেই বৃদ্ধি পায়নি? সমগ্র মুসলিম অঞ্চলে "বড়ভাই নীতি" (Elder Brother Theory) চালিয়ে যাবার ফলেই ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলগুলো রাশিয়ার উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

রাশিয়ায় আইনব্যবস্থা ও আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন এক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, যার ফলে আইনগত মানবিক সত্তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সামাজিক শোষণ দূর করার জন্য হয় তো আইনের কড়াকড়ি প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলে আইনের ভিত্তিকেন্দ্রকে নিছক শ্রেণীভিত্তিক করে তুললে আইনের অন্তর্নিহিত মৌলিক ও আসল গুণটিই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই কমিউনিস্ট শাসনে আইনের শরণাপন্ন হয়ে সুবিচার লাভের সুযোগ বিলুপ্ত হতে বাধ্য। ব্যক্তিগত সংরক্ষণ (Defence) সেখানে বিদ্রোহের শামিল। সরকার যদি কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন, তবে তা অস্বীকার করার অর্থ হলো সরকার-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া। গসোভস্কী এ কথা স্পষ্ট করেই স্বীকার করেছেন—সোভিয়েট আইনে একদিকে আইনের ক্ষমতা ও অন্যদিকে শাসন বিভাগের আইনোত্তর ক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছে।[৪০] ভিশিনস্কি বলেন ঃ শ্রেণীসংঘর্ষের বাস্তবতার দরুন আমরা "OGPU" (NKVD) বা গোপনপুলিশের ক্ষমতা স্বীকার করি। Course in Criminal Code-এ (by Vyshinsky and Undrevich) বলা হয়েছে ঃ সোভিয়েট শাসনে আইনব্যবস্থা রাজনৈতিক হাতিয়ার মাত্র। বিচারকদের কাজ, আইনের রূপায়ণ করা নয়—কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের হুকুম তামিল করা। এ অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে রুশ সাম্রাজ্যবাদী যুলুমের বিরুদ্ধে কোন সুবিচার লাভ করাই সম্ভব হয়নি।

---

40. Vladimir Gsovski : The Soviet Concept of Law. Fordham Law Review, 1938, PP. 154—155.

কমিউনিস্টরা এ-সব জাতিকে "Nation" বা সত্যিকার জাতি হিসেবে গণ্য করেনি। এদেরকে কেবলমাত্র একটা নীচুদরের জাতি বা "nationality" হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোনও কোনও বিষয়ে উন্নয়ন সাধিত হলেও আযাদীর সারবস্তু তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। স্বাধীনতাকামী মুসলমানদেরকে যে শুধু মেরে ফেলা হয়, তাই নয়, খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার মুসলমানদের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। ধ্বংসনীতি এমনভাবে চালানো হয়েছে, যার ফলে অর্থনৈতিক, শিল্পগত ও বাণিজ্যিক দিকে তুর্কীস্তান প্রায় পঞ্চাশ বছরের জন্য পিছিয়ে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়েছে, একথা সর্বজনবিদিত। তবু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে তারা শান্তিপূর্ণভাবে সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছায় উঠিয়ে নিয়ে স্বাধীনতা স্বীকার করেছে। কিন্তু রাশিয়ায় কারো ভোটের অধিকার নেই। মুষ্টিমেয় ওপরওয়ালারা যা বলবেন, তা সবাইকে শুনতে হবে। Walter Kolarz তাঁর "Russia and Her Colonies" শীর্ষক বইতে সত্যিই বলেছেন ঃ

"ট্রান্স-সাইবেরীয় রেললাইন যেমন জার-শাসনের সাফল্য প্রমাণ করে না, তেমনি প্রধান তুর্কমেনীয় খালখনন সোভিয়েট ঔপনিবেশিক নীতির মহিমা ঘোষণা করে না।"[৪১]

কমিউনিস্টরা মুসলমানদের বিরাট ক্ষতিসাধন করেছে বটে, তবু তা মুসলমানদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও ধর্মীয় জীবনদৃষ্টি বিনষ্ট করতে পারেনি। আল্লার অমোঘ নিয়ম ও সার্বভৌমত্ব কেউ কোনদিন লংঘন করতে পারবে না। আল্লার শক্তির কাছে তথাকথিত "বৈজ্ঞানিক" মার্কসবাদের শক্তি একান্তভাবে সীমায়িত হতে বাধ্য। স্টালিন-ক্রুশ্চেভের সাধ্য কি রসূলে আকরামের (স.) জীবন-ধারাকে বিপর্যস্ত করে? কারণ, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে রয়েছে দু'একটা একঘেয়ে কথা—জটিল ইতিহাসকে সহজ করে তুলে ধরবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কৌণিকতা থেকে কমিউনিস্টরা মুক্ত হতে পারেনি, ধর্মের আসল নীতি হৃদয়ঙ্গম করবার অবকাশ পায়নি।

কিন্তু আল্-কোরানে পাই সমগ্র মানবজীবনের মৌলিক জীবনাদর্শ। পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ীও বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে এ আদর্শের রূপায়ণ করলে যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, তা নিঃসন্দেহে জড়বাদী কমিউনিজমের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

---

41. Walter Kolarz : Russia and Her Colonies, London 1952, Preface V.

!! ছয় !!

সাংস্কৃতিক নিষ্পেষণ

লেনিন যে কেবল আল্-কোরানকে "বাজে কথা দিয়ে ভর্তি" বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাই নয়, সমকালীন ইসলাম বিরোধীগণ হযরত মুহাম্মদের (স.) ঐতিহাসিক অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। ক্লিমোভিচ, মোরোযোভ ও টলস্টভের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কমিউনিস্টরা মুসলমানদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংস করবার নীতি অনুসরণ করছে। মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জাতির ভাষাগুলোর মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান ও বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও নাস্তিক্যবাদী সমিতির মারফত ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে হামলা ও আক্রমণ খুব জোরেসোরেই পরিচালিত হচ্ছে।

মুসলমান মুফ্তী ও তথাকথিত কমিউনিস্টপন্থী "আলেম"-দের মুখ দিয়ে রাশিয়ায় কমিউনিজম প্রচার করা হচ্ছে। ভিয়েনা "শান্তি" কংগ্রেসে এ-হেন এক শেখ-উল-ইসলাম সোভিয়েট শাসনের তারীফ করতে গিয়ে "ইন্‌শা আল্লাহ্" বলে শুরু করেন। কিন্তু এতে করে সোভিয়েট রাশিয়ায় ইসলামের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা মোটেই সম্ভব হয়নি। কারণ, গোটা ইসলামী সংস্কৃতিকে সমূলে বিনষ্ট করবার জন্য ষড়যন্ত্রজাল বিস্তৃত হয়েছে রাশিয়ার সর্বত্র, বিশেষ করে মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোতে। স্বাধীনতার কথা জোরেসোরে প্রচার করা হয় বটে, কিন্তু কোন জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার বানচাল করে দিলে সে জাতির স্বাধীনতাই হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধকে রাশিয়া "আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ" বলে অভিহিত করে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছে। মুসলমানদের জাতীয়তা ও ধর্ম একই সুরে গাঁথা। তাই ধর্মের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ ঘোষণা করে রাশিয়া মুসলমানদের জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধ্বংস করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেছে।

হাজার হাজার মুসলিম ধর্মীয় নেতা ও স্বাধীনতাকামী মুসলমান আযাদীর সংগ্রামে রুশ-সরকারের হাতে শহীদ হয়েছেন। লেনিন যে কেবল আল্-কোরানকে "বাজে কথা দিয়ে ভর্তি" বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাই নয়, সমকালীন ইসলাম বিরোধীগণ হযরত মুহাম্মদের (স.) ঐতিহাসিক অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। ক্লিমোভিচ, মোরোযোভ ও টলস্টভের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। অধিকাংশ মুসলমানকে হজে যেতে দেয়া হয় না। ১৯৫৭ সালে মাত্র ১৮ জনকে হজব্রত পালন করতে দেয়া হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে মাত্র ২০ জন মুসলমান মক্কাশরীফে হজ করতে যান। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় মুসলমানের সংখ্যা কমপক্ষে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। জার-আমলে রুশ-সরকারকে মুসলমানেরা ইসলাম-বিরোধী বলে মনে করতেন; কিন্তু সে আমলেও কমপক্ষে ১ হাজার মুসলমান প্রতিবছর হজব্রত সমাপন করতে যেতেন।

Smirnov নামক সোভিয়েট লেখক তাঁর "Essays from the Study of Islam in the USSR" শীর্ষক বইতে বলেছেন ঃ সমকালে রাশিয়ায় ইসলাম-বিরোধী পুস্তকের সংখ্যা ৪০০-তে গিয়ে দাঁড়াবে। "হজ ইসলামের ভ্যাম্পায়ার" ইসলাম-বিরোধী লেখক Klimovich-এর এ বইখানা খুব উৎসাহের সাথে প্রচার করা হয়েছে। এ বইতে মক্কা ও মদীনা শরীফকে খুব ঘৃণ্যভাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

১৯২৯ সালে সোভিয়েট সরকার এক নির্দেশে ঘোষণা করেন যে, কেবলমাত্র ৪০ বছরের অধিক বয়স্ক লোক আরবি কোরান শরীফ পড়তে পারবে। কিন্তু সে কোরান শরীফ অবশ্য সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রকাশিত হওয়া চাই। অনেকগুলো মসজিদ একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত লেনিনগ্রাদের মসজিদটি মেরামতহীন ও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে; আজ অবধি এর সংস্কার করা হয়নি। বাকুর "তাযেপীর" ও গানযার "শাহ্ আব্বাস" মসজিদ মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নাস্তিক্যবাদ প্রচারের জন্য বাকুতে একটা বড় হলওয়ালা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। বোখারায় আগে ৩০০টা মসজিদ ছিল; এখন মসজিদ রয়েছে মাত্র একটা (১৯৫৫)। ক্রাস নোভোভস্কে ও আক্রাকাবাদে কোনও মসজিদ নেই। অথচ এ-সব শহরে ১ লাখ থেকে ২ লাখ লোকের বাস।

কাযাকিস্তানের "প্রাভদা" পত্রিকায় কাযাক শ্রমিক ও কৃষকগণ অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের স্বার্থের প্রতি কমিউনিস্ট শাসকগণ নিদারুণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছে ও তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিলুপ্ত করবার নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯২৩ সালে আরবি হরফ সংস্কার করা হয় ও ১৯২৮ সালে মুসলমানদের উপর জোর করে রোমান হরফ চাপিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর ১৯২৯ সালে তুরস্কে যখন রোমান হরফ প্রবর্তন করা হয়, তখন এ-সব অঞ্চলে জোর করে রুশ সিরিলিক হরফ আমদানী করা হলো। সমগ্র বিশ্ব-মুসলিম থেকে রাশিয়ার মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যই এ নীতি অনুসৃত হয়েছিল। মুসলমানদের লেখা অনেক বই "প্রতিবিপ্লবী' আখ্যা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়। আসলে কিন্তু এগুলো সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নয়নের বিরোধী ছিল না। মুসলিম স্বাতন্ত্র্য প্রচার করার "অপরাধেই" এ-সব বই প্রকাশ করা নিষিদ্ধ হয়। ধর্মীয় নেতাদের উপর খুব বেশি করে শুল্ক ধার্য করা হয়। অনেক সময়ে শুল্ক দেবার ব্যাপারে সাধারণ কৃষকগণ নিজেদের শস্য দিয়ে তাঁদের ধর্মীয় নেতাদেরকে সাহায্য করেছেন।

১৯০৭ সাল ও ১৯৪২ সালের সংখ্যাতাত্ত্বিক গণনায় তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, রাশিয়া এ পর্যন্ত ৫,৬৮৮টি মসজিদ বিনষ্ট অথবা বন্ধ করে দিয়েছে। লেনিনগ্রাদের বড় মসজিদটি ছাড়া, তাসকেন্তের অনেক মসজিদও সংস্কারহীন অবস্থায় পড়ে আছে। কোন-কোনটি গুদামে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৩০ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি মুসলিম ধর্মীয় নেতাদেরকে জোর করে ইসলাম ধর্মকে "আফিম" বলে ঘোষণা করতে বাধ্য করা হয়েছে বারে বারে। তাতার জাতির মুফতি ফখরুদ্দীন সাহেব এ ঘোষণা করতে অস্বীকার করেন; কারণ তাঁর মতে এ হলো শয়তানের কথা । ফলে সোভিয়েট গুপ্ত-পুলিশের হাতে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। গত মহাযুদ্ধে জার্মান আক্রমণের সময় মুসলিম অঞ্চলগুলোতে সোভিয়েট কবল থেকে স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে প্রেরণা লাভ করে। ঘন ঘন কমিউনিস্ট নেতাদের রদবদল থেকে এ-সব অঞ্চলের অদম্য স্বাধীনতার স্পৃহার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কমিউনিস্টরা মুসলমানদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংস করবার নীতি অনুসরণ করেছে। জোর করে হরফ প্রবর্তনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন দেখা যাক, কী করে এ নীতি কার্যকরী করা হলো। তুরস্কে রোমান হরফ প্রবর্তন করার সময় বহুসংখ্যক তুর্কীর মতামত যাচাই করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় রুশ সরকার

জনমতের তোয়াক্কা রাখেনি। সরকার কর্তৃক জোর করে রোমান হরফ চাপিয়ে দেয়া হয়। ১৯২৬ সালে বাকুর "তুর্কী কংগ্রেসে" রোমান হরফের প্রস্তাব গৃহীত হয় ও ১৯২৭ সালে নতুন তুর্কী হরফ প্রবর্তনের জন্য বাকুতে "নিখিল সংযুক্ত রুশ কেন্দ্রীয় কমিটি" গঠিত হয়। তিন বছর পর এ কমিটি মস্কোর কেন্দ্রীয় পার্টি কমিটির সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। নতুন হরফ প্রবর্তনের ফলে এ সব জাতি তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা থেকে কিছুটা দূরে সরে যাবে—এই ছিল রাশিয়ার উদ্দেশ্য। এতে করে রাশিয়ানরা অবশ্য এ-সব জাতিগুলোর সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হতে পেরেছে। এদের সংস্কৃতির যে অংশটুকু কমিউনিস্ট শাসনে রক্ষণাবেক্ষণ করা চলবে, কেবলমাত্র সেটুকুই রোমান হরফে রূপান্তরিত করা হলো।

দশ বছর পরে (১৯৩৭—৩৮) এ হরফ বদল করে রাশিয়ান সিরিলিক হরফ প্রবর্তন করা হয় ও তুর্কী শব্দ, উচ্চারণ ও ব্যাকরণের নিয়ম জোর করে রুশীকরণ করা হয়। দুনিয়ার সভ্যতা থেকে এদেরকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যই এ ব্যবস্থা করা হলো।

মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জাতির ভাষাগুলোর মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান ও বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে করে সম্মিলিত তুর্কী-তাতার রেনেসাঁ দানা বেঁধে উঠতে না পারে। শুধু যে উত্তর-ককেশাসের বিভিন্ন জাতিকে শতধাবিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে; তাই নয়—সংযুক্ত জাতিদেরকেও বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ-সব জাতি এদের হরফ একীকরণের জন্য দাবী তুলেছিল।

আদিজ, কাবারদিনো, চারকেসিয়া, চেকেনো-ইংগুশেতিয়া, কারাচে-বুলকারিয়া ও দাগীস্তানে এ বিষয়টি আলোচনার জন্য সম্মেলন বসে। ১৯৩০ সালে কমিউনিস্ট সরকারের সুবিধামত এ-সব জাতির মধ্যে পরস্পর ঐক্যসাধনের জন্য জালাল কোরকমাসভের নেতৃত্বে এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়; কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি।

১৯৩৬ সালে প্রথম তুর্কীস্তান ভাষা কংগ্রেস আহ্বান করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল তুর্কীদের জাতীয় সত্তা বিনষ্ট করে দেয়া ও আরবি, ফারসী ও তুর্কী শব্দের জায়গায় রুশ শব্দ আমদানী করা। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় তুর্কী ভাষা কংগ্রেস আহূত হয়। আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য ছিল, তুর্কী হরফ ও শব্দকে রুশ ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসা। তুর্কী ও ইরানী বিশেষজ্ঞগণ—বিশেষ

করে অধ্যাপক ম্যালভ, বোরোভকোভ ও বার্টেল্স এ সম্মেলনে যোগদান করেননি। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে বিজ্ঞান তথা ভাষাগত গবেষণা খুব বেশি ব্যাহত হয়েছে। রুশ সিরিলিক হরফ কারালপাক, উজবেক ও তাতারদের জন্য যে মোটেই উপযোগী নয়, সে সম্পর্কে অনেক বিশেষজ্ঞই সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। জোর-করে হরফ চাপিয়ে দেবার ফলে এদের সাংস্কৃতিক জীবনে এখনও স্থৈর্য আসেনি—সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা তো দূরের কথা।

ইসলামী সংস্কৃতির স্ফূরণে আযরবাইজানী তুর্কী মুসলমানগণ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তুরস্ক তথা গোটা ইসলামী জগতের সঙ্গে আযরবাইজানী মুসলমানদের রয়েছে এক দৃঢ়বন্ধনী ও আধ্যাত্মিক সংযোগ। খ্রিস্টীয় নবম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী অবধি শেরওয়ানের শাহ্‌দের আমলে ও জার-শাসনাধীনেও এঁরা শক্তিশালী ছিলেন। রুশ বিপ্লবের পর মুসলমানদের স্বাধীনতার বাণী এঁরাই প্রচার করেন। এ আন্দোলনকে "প্যান-ইসলামী" বলে আখ্যায়িত করে কমিউনিস্টরা এর বিরুদ্ধে হামলা আরম্ভ করে—ছয় শত বছরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, চারুকলা ও স্থাপত্যের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়ে যায়। তাঁদের কিস্‌সা-কাহিনী, ইতিহাস, শিল্পকলা, সামাজিক কাঠামো, আচার-ব্যবহার বিনষ্ট করে দেবার প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

কাজেই দেখা গেল, রাশিয়ার অধীন সব মুসলিম জাতিই রাশিয়ানদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কমিউনিস্টরা একথা খুব স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে যে, রাশিয়ার সংস্কৃতি হবে বাহ্যতঃ রুশভাবাপন্ন ও মৌলিক দিক থেকে কমিউনিস্টপন্থী। কাযাকিস্তানের তিন ভাগের দু'ভাগ ছাত্র-ছাত্রী রাশিয়ান ভাষায় শিক্ষালাভ করে। কাযাক জাতীয় সংস্কৃতির অবলুপ্তির বিরুদ্ধে "কাযাক লেখক ইউনিয়ন" তাঁদের "Kazak Adebiety " পত্রিকায় অভিযোগ করেছেন। তাঁরা দাবী করেন ঃ

১। কাযাকিস্তানের রুশ কর্মচারীদেরকে কাযাক ভাষায় কথা বলতে হবে ;

২। কাজাক ভাষায় রুশ শব্দ ঢুকানো চলবে না ;

৩। প্রাগ্-বিপ্লব যুগের কাযাক লেখক ও কবিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা চলবে না।

স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট বৈদেশিক নীতিতে মধ্য-এশিয়ার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন। বিশ বছর ধরে মীর জাফর বাগিরভ

আযরবাইজানের প্রধান শাসক ছিলেন । তাঁকে হত্যা করার পর সাধারণ লোকদের মধ্যে অসন্তোষ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য ১৯৫৬ সালে আযরবাইজানী তুর্কী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করা হয় (২৪ আগস্ট)। সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতিতে উজবেকিস্তানের গুরুত্ব সমধিক; কারণ, শ্লাভদেরকে বাদ দিলে উজবেকরাই সোভিয়েট রাশিয়ায় বৃহত্তম সংখ্যালঘু জাতি। বিদেশীরা যখন মধ্য এশিয়া সফরে আসেন, তখন উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসকেন্ত শহরে একবার আসা চাই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উজবেকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি সেক্রেটারী আকমাল ইস্করামভকে হত্যা করা হয়। উজবেকিস্তান পার্টি সেক্রেটারী মুখীদিনভ একথা স্বীকার করেছেন যে, অনেক অসৎ ও অসাধু লোকের আধিপত্যের ফলে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিদারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।[৪২]

স্তালিনের আমলে যে-সব লেখকের উপর অবিচার করা হয়েছে, তাঁদের প্রতি এখন কিছুটা নরমপন্থী নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত "বুদ্ধিজীবী কংগ্রেসে" এ নীতি ঘোষণা করা হয়।[৪৩] উজবেকিস্তানের রাশিয়ান স্কুলেও এখন ভাষা শেখানো হচ্ছে।

নিছক কূটনীতির উপর ভিত্তি করেই এ আপাতনীতি ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির ওপর হামলা মোটেই বন্ধ হয়নি। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও নাস্তিক্য সমিতির মারফত আজও এ-প্রচার খুব জোরেসোরেই পরিচালিত হয়। দামাস্কাসের "সাওত-উল্-আরব" পত্রিকায় শেখ বাহ্জাত বিতার লিখেছেন ঃ

"ইসলামী সংস্কৃতি এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছে যে, তাসকেন্ত শহর দেখলেই একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। একথা আজ আর বুঝবার জো নেই যে, এককালে এ শহর মুসলিম সংস্কৃতি কেন্দ্র ছিল।

42. Pravda Vostoka, October 13, 1965.
43. Pravda Vostoka, December 28, 1957

!! সাত !!

চালান-নীতির কবলে

> ১৯৪৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাকু অঞ্চলের চেকেন-ইংগুশ নামক "স্বায়ত্তশাসিত" অঞ্চলের ছয়লক্ষ মুসলমান নরনারী শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তিকে তাদের মাতৃভূমি থেকে জোর করে সরিয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো, কে জানে। হয়তো সাইবেরিয়ার তুহিন প্রান্তরে তারা ধুকে ধুকে মরছে। রাশিয়ার মানচিত্র ও ভূগোল থেকে চেকেন, ইংগুশ, বলকার ও কারাচাইদের অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছে।
>
> বিশ্বমুসলিমের ঘরে ঘরে এ নিপীড়নের কাহিনী পৌঁছে দিতে হবে। সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার মুসলিমের সংগ্রামে শক্তি যোগাতে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

কমিউনিস্ট শাসনে মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বাইরের মুসলমানদের ধারণা আজ পর্যন্ত নিতান্ত অস্পষ্টই রয়ে গেছে। পূর্ব-তুর্কীস্তান, ইদিল-ইউরাল, ট্রান্স-ককেশিয়া, আযরবাইজান ও ক্রিমিয়া নিয়ে বিরাট ভূখণ্ডে সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমানের বাস।

সাইবেরিয়ার মুসলমানদের হিসেব ধরলে, চীন ও রাশিয়ার মুসলমানদের সংখ্যা ছ'কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে রুশ আক্রমণ ও পূর্বপ্রান্ত থেকে চীনা অভিযান এ-সব মুসলমানকে সম্পূর্ণ হতচকিত ও বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। নির্বিবাদে কমিউনিস্টগণ মুসলিমনিধন-পর্ব চালিয়ে যাচ্ছে ও বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীকে শতধাবিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করবার নীতি গ্রহণ করেছে। এ সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। বাইরের দেশ থেকে এসব অঞ্চলে যারা সফর করেন, তাঁরা সরকারের অতিথি হিসেবেই অবস্থান করে থাকেন। সাধারণ লোকের সাথে নিবিড়ভাবে মিশবার সুযোগ তাঁরা কখনই পান না। তাই আসল পরিস্থিতি অনুধাবন করা তাঁদের পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কথা বাদ দিলে, চীন দেশের মুসলমানগণ বিভিন্ন জায়গায়, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় তাঁরা অনেকখানি সুসংবদ্ধ অবস্থায় বসবাস করেন। ফলে, রাশিয়াতেই "চালান-দেয়া নীতি" জোরেসোরে পরিচালিত হয়েছে।

এই চালান-নীতির পেছনে দুটো বিশেষ কারণ দেখতে পাওয়া যায়; একটি হলো মুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে সমূলে ধ্বংস করা, আর অপরটি হলো মুসলমানদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের মুসলিমকে পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এ নীতিকে সফলকাম করার জন্য সমস্ত সংবাদপত্র ও বেতার মারফত জোর-প্রচার চালানো হয় ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য কূটনীতি ও চালবাজীর আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

"Marxism and the Question of Nationalities" শীর্ষক বইতে বলা হলো ঃ

"শ্রমিকদের পার্টি ক্ষুদ্র জাতীয় সংস্কৃতি ও স্বায়ত্তশাসন অস্বীকার করে। কারণ স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কার্যধারা থেকে বাদ পড়ে যায়।"[৪৪]

মুসলমানদের জন্য যে রাশিয়ার কোনও দরদ বা সহানুভূতি নেই, একথা ফিলিস্তিন বিভাগের সময়েই প্রমাণিত হলো। এখন একথা আর কারু অজানা নেই যে, ফিলিস্তিনের সাধারণ মুসলমানদের দাবী উপেক্ষা করেই তথাকথিত "গণদরদী" রাশিয়া ফিলিস্তিন বিভাগ সমর্থন করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে রাশিয়া পাঁচটি ক্ষুদ্র "গণতন্ত্রের" অবলুপ্তির কথা ঘোষণা করে। এর মধ্যে তিনটি হলো মুসলমান "গণতন্ত্র" একটি বৌদ্ধ ও অপরটি খ্রিস্টান। তিন কোটি লোককে সাইবেরিয়া অঞ্চলে চালান দিয়ে জোর জবরদস্তি করে শ্রমিক ক্যাম্পে (Concentration Camp) ভর্তি করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ-সব রাষ্ট্রের নাম সোভিয়েট ইতিহাস ও ভূগোল থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হলো।

করাচীর ইংরেজি দৈনিক "The Civil and Military Gazette"-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জানা যায় যে, সোভিয়েট শাসনে বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর

---

44. Marx-Engels Lenin-Stalin, Series No. 14, Peoples Publishing House, Bombay, P. 69.

মধ্যে দারুণ অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে।[৪৫] মধ্য-এশিয়া থেকে পূর্ব-সাইবেরিয়ায় যাদের নির্বাসিত করা হয়েছিল, তাদের মধ্যেই এই অসন্তোষ সবচাইতে বেশি ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। "নাৎসীদের সাহায্য করেছে"—অযথা এই দোষারোপ করে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ এই "চালান-দেয়া" নীতি সমর্থন করে এসেছে। ক্রিমিয়ায় সাত লক্ষ তাতার মুসলমানের বাসস্থান। ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের পর এই মুসলমানগণ ক্রিমিয়া গণতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। লেনিন-প্রদত্ত সংখ্যালঘু ওয়াদার কথা চিন্তা করে তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তখন কোনও মুসলমান স্বেচ্ছায় কমিউনিজম গ্রহণ করেননি, কিন্তু তলে তলে কমিউনিস্টরা মার্কসবাদ প্রচার করে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকে। এতেও কোন ফল হলো না, তাই তারা খোলাখুলিভাবে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। ১৯১৮ সালের ১৩ জানুয়ারি রুশ ফৌজ ক্রিমিয়া অবরোধ করে এবং ভীতি ও রক্তপাতের মাধ্যমে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। ক্রিমীয় গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে নির্মমভাবে গুলী করে হত্যা করা হয়। শস্যক্ষেত্র পরিণত হয় মরুভূমিতে। তিন মাস ধরে অবিরামভাবে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। অতঃপর নাতিজিউ ও কোচের নেতৃত্বে ইউক্রানীয় ও জার্মান সৈন্যরা ক্রিমিয়া অধিকার করে নেয়। এর অল্পদিন পরেই ক্রিমিয়া একদিকে লালফৌজ ও অন্যদিকে ডেনিকিন ও জেনারেল রাঙ্গেলের সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। চারদিকে ধ্বংসের তাণ্ডব চলতে থাকে।

১৯২০ সালে কমিউনিস্টরা আবার হামলা শুরু করে ও ক্রিমিয়া অবরোধ করে নেয়। কুখ্যাত হাঙ্গেরীয় ইহুদী বেলাকুন এ অবরোধের নেতা হয়ে আসে ও নির্বিবাদে সত্তর হাজার মুসলমানদের হত্যা করে। কৃষিকার্যের অবনতির ফলে নিদারুণ দুর্ভিক্ষের করাল অভিশাপ নেমে আসে। ফলে ক্রিমিয়ার চার ভাগের এক ভাগ লোক নিঃশেষ হয়ে যায়। মুসলমানদের হত্যা করে ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ও বিদেশ থেকে এক লক্ষ ইহুদীকে এনে বসানো হয়, আর হাজার হাজার মুসলমানকে এখান থেকে পূর্বাঞ্চলে চালান দেয়া হয়। পথে চার ভাগের তিন ভাগ লোকই মারা যায়।

আযরবাইজান ১৯১৮ সালের ২৮ মে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রাশিয়া ও তুরস্কের সাথে সম্পাদিত এক বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে আযরবাইজানের স্বাধীনতা

---

45. The Civil and Military Gazette, Karachi, 3rd May, 1949.

সংরক্ষণের ওয়াদা দেয়া হয়। এ অঞ্চলের ৩০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২৮ লক্ষই মুসলমান। এদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে এদেরকে রুশ আধিপত্যে আনবার জন্য লেনিন শাউমিয়ান নামক এক তুর্কী বিদ্বেষী আর্মেনীয়কে পাঠিয়ে দেন । বাকু ও ককেশাসের মুসলমানদের দমন করে, কমিউনিস্ট ও দাশ্‌নাকেন বা জাতীয় আরমেনীয়দের নিয়ে এক "বৃহৎ আর্মেনীয় রাষ্ট্র" গঠন করাই ছিলো এ মিশনের উদ্দেশ্য। কিন্তু শাউমিয়ানের ষড়যন্ত্র ও প্রচারে বিশেষ কোন সুফল ফলেনি। কারণ, সাধারণ নির্বাচনে তাঁর অনুসারীরা রসুলজাদা মুহম্মদ আমীন, তোপচীবাশী আলী মারদান, ফতেহ্ আলী খান, হাসান বে ও ইউসুফবেলী নাসীব বে—এইসব জাতীয়তাবাদী নেতার কাছে হেরে যায়। অতঃপর লেনিন আবার সৈন্য প্রেরণ করেন। বাকু ও আযরবাইজানের বড় বড় শহরগুলোতে যুবক, মহিলা ও শিশুদের নিয়ে পনর হাজার লোক মারা যায়। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানাদি, দালান ও তুর্কী ছাপাখানা পুড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু চার মাসের মধ্যে আযরবাইজান ও তুর্কী সেনার সম্মিলিত ফৌজ বাকু অধিকার করে নেয় ও কমিউনিস্ট যুলুমের অবসান ঘোষণা করে। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো মাত্র ১০ হাজার। ১৯২০ সালের ২৭ এপ্রিল লালফৌজ আবার আযরবাইজানে প্রবেশ করে প্রতিটি পল্লীতে খানাতল্লাশী চালায় ও প্রত্যেকটি মুসলিম নেতাকে হত্যা করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা চালান-নীতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করেছি। এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

১৯৪৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাকু অঞ্চলের চেকেন-ইংগুশ নামক "স্বায়ত্তশাসিত" ছয়লক্ষ মুসলমান নরনারী, শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তিকে তাদের মাতৃভূমি থেকে জোর করে সরিয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো—কে জানে? হয়তো সাইবেরিয়ার তুহিন প্রান্তরে তারা ধুকে ধুকে মরছে। রাশিয়ার মানচিত্র ও ভূগোল থেকে চেকেন, ইংগুশ, বলকার ও কারাচাইদের অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছে।

১৯৫২ সালে সিরিয়ার "আল্-আস্‌র-আল্-জাদীদ্ " পত্রিকায় প্রকাশিত এক মুসলিম মুহাজিরের বর্ণনা থেকে চুয়াল্লিশ সালের চালান-নীতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারা যায়। ফৌজ-বিভাগের যে সব রুশ কর্মচারী স্বাধীন দুনিয়ায় হিজরত করে এসেছেন, তাঁরাও এ অমানুষিক কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। অগণিত মানুষ নিজের জিনিস কিছু কিছু সঙ্গে নেবার জন্য সকরুণ আবেদন জানায় ; কেউ কেউ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, আবার কেউ-বা সোভিয়েট

গুপ্ত পুলিশের সাথে লড়াই করে। এতটা আকস্মিকভাবে এদেরকে চালান দেয়া হয় যে, সবাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। পুলিশ ট্রাকে করে তাদের পার্বত্য শহর গ্রোযনীতে নিয়ে যাও হয়। পরে গরুর গাড়িতে অজানিতের দীর্ঘপথে তাদের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রুশ-সরকার ঘোষণা করে যে, এসব লোককে আবার তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হবে। কিন্তু এর আগেই তো অনেক নরনারী, বৃদ্ধ ও শিশুর মৃত্যু ঘটেছে, এদেরকে তো আর বাঁচানো গেল না! যাই হোক, সাতান্ন সালের সোভিয়েট-নীতি সপ্রমাণ করেছে যে, মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলন মোটেই স্তিমিত ও প্রশমিত হয়নি। ১৯৫৮ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে প্রেরিত "জমিয়তুল ইসলামের" এক আবেদনপত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে।[৪৬] এতে অস্ট্রিয়ার মুসলিম মুহাজিরদের এক লোমহর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৪৫ — ৪৬ সালে হাজার হাজার কাজাক, কিরঘিজ, উজবেক, ককেশীয়, তাতার, আলবেনীয়, রুমানীয়, বুলগেরীয়, পোমাকেন ও আযরবাইজানী মুসলমান অস্ট্রিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। নিঃস্ব বিত্তহীন অবস্থায় তাঁরা অস্ট্রিয়ার মুহাজির ক্যাম্পে অবস্থান করছেন।

কমিউনিস্ট হত্যা, লুটতরাজ, চালান-নীতি ও নিষ্পেষণের ফলে মুসলিম অঞ্চলগুলোর জনসংখ্যা খুব বেশি কমে গিয়েছে। ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালেও ভীষণ দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা যায়। উনিশ সালের অক্টোবর মাসে জর্জ সাবারভকে তথ্যসংগ্রহ কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসেবে পাঠানো হয়। তিনি তাঁর রিপোর্টে একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, কর আদায় ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে মুসলমানরা ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। টি. রিস্‌কুলভ ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কিরঘিজিয়ার সভাপতি ছিলেন। তিনি উনিশ শ উনচল্লিশ সালে লেখেন ঃ কিরঘিজিয়ায় তিনভাগের একভাগ লোক মারা গেছে।[৪৭] সোভিয়েট গণনায় দেখা যায় যে, ১৯২৬ সালে কাজাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিলো উনচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার, ১৯৩৯ সালে সেস্থানে জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার ; আর রুশীয়দের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে শতকরা পঁয়ত্রিশজন থেকে উনপঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে। অনেক জায়গায় সংখ্যাগুরু মুসলমান আজ সংখ্যালঘুতে

---

46. An Appeal by the 'Jamiatul Islam', Austria, (Vienna) পরিশিষ্ট দেখুন।
47. The Civil and Military Gazette, Karachi, April 30, 1949.

পরিণত হয়েছে। উজবেকিস্তানের কবি গফুর গোলাম সত্যই লিখেছেন ঃ

অপরাজেয় লালফৌজ এগিয়ে চলে

আর সড়কে সড়কে মৃত মানুষের হাড্ডি

ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে...

বিশ্বমুসলিমের ঘরে ঘরে এ নিপীড়নের কাহিনী পৌঁছে দিতে হবে। সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার মুসলিমের সংগ্রামে শক্তি যোগাতে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। অর্থ, উৎসাহ ও আশাভরসা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে আমাদেরকে আজই এগিয়ে আসতে হবে।

!! আট !!

আযাদী আন্দোলন

রুশবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই ইদিল-ইউরাল ও ক্রিমিয়ার অধিবাসীগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯১৮ সালের মে মাসে পশ্চিম তুর্কীস্তানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ককেশিয়া ও আযরবাইজানও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রুশ-সরকার আপাতত এ-স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু শেষটায় এ ওয়াদা রক্ষিত হয়নি।

মুসলমানরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ হলেন সর্বশক্তিমান ও সর্বময় বিচারক। ফলে তাঁদের জীবনে এমন এক মর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম হয় যা দুনিয়ার বিপদ-আপদ, ঘৃণা-বিতৃষ্ণা কিছুতেই বিনষ্ট করতে পারে না। এ আত্মবিশ্বাসই তাঁদেরকে নাস্তিক্যবাদী সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের বাহক রাশিয়া ও চীন মুসলিম সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

কিন্তু সোভিয়েট-সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাসে আবদ্ধ মুসলমানরাও মুখ বন্ধ করে, হাত গুটিয়ে বসে নেই। তাঁরা যথাসম্ভব প্রতিরোধ-আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য যে কেবল অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা ও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা, তাই নয়, নিজস্ব সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে শান্তি-সমৃদ্ধিময় নতুন সমাজ গঠনের জন্যেও তাঁরা বজ্রকঠোর শপথ নিয়েছেন। তাঁদের এই আযাদী আন্দোলন "মুজাহিদ আন্দোলন" নামে পরিচিত।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের সময় রাশিয়ায় মুসলমানের সংখ্যা ছিল আট কোটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আলবানিয়ার আট লক্ষ, যুগোশ্লাভিয়ার সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার, বুলগেরিয়ার সাত লক্ষ আশি হাজার ও চীনের নানা জায়গায় অবস্থিত

(বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম দিকে) আট কোটি মুসলমান সাম্রাজ্যবাদী কমিউনিস্ট ড্রাগনের মুখে গিয়ে পড়েছেন।

সতেরো সালের বিপ্লবের পর গণভোট অনুষ্ঠান ও জনমত গ্রহণ না করেই লালফৌজ ও সোভিয়েট-সাম্রাজ্যবাদিগণ তাসকেন্তে প্রবেশ করে তথাকথিত স্বাধীন তুর্কীস্তান সরকার গঠন করে। "Dawn over Samarkand"-এর কমিউনিস্ট লেখক Joshua Kunitz পর্যন্ত একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, মধ্য-এশিয়ায় অবস্থিত কতিপয় রেলশ্রমিক ও বলশেভিক তুর্কীস্তানের সোভিয়েট নেতা কোলেসভের নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার গঠন করে।[৪৮] তাসকেন্ত ছাড়া কোগান, চারদজুই কোকন্দ ও আরও অনেক জায়গাতেই রুশ-নেতৃবৃন্দ, রুশ-শ্রমিক ও কৃষকগণ অবস্থান করছিলো। জারের আমলেও এরা অস্ত্রশস্ত্র ও সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে জার-সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরূপে মুসলমানদের উপর আধিপত্য করতো। রুশ-বিপ্লবের পর এরাই আবার কমিউনিস্টদের সাথে এক-জোটে মুসলিম নির্যাতন শুরু করে। মধ্য-এশিয়ার সাধারণ মুসলমানরা এ ব্যাপারে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মোটেই সহযোগিতা করেননি। তাই বিপ্লবের পর মুসলমানরা একই প্রভুর আওতায় রয়ে গেলেন; কিন্তু তা ঘটলো নতুন মার্কসীয় দর্শন ও শ্রেণীসংঘর্ষের নামে।

অন্যান্য মুসলিম গোষ্ঠী থেকে তুর্কীস্তানকে বিচ্ছিন্ন করবার প্রচেষ্টা জোরে-সোরে চালিয়ে যাওয়া হলো। বলশেভিক সৈন্যগণ তুর্কীস্তান আক্রমণ করে ঘর-বাড়ি, জমি ও শস্যক্ষেত্র পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। ভীতির রাজত্বে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অরাজকতার সর্বব্যাপী হাহাকার উঠলো, তাতে আট হাজার মুসলমানের প্রাণহানি হয়। মস্কোর দশম সোভিয়েট কংগ্রেসে প্রদত্ত এক কমিটির রিপোর্টে একথা স্বীকার করা হয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর বিরোধের সৃষ্টি করে কমিউনিস্টগণ মুসলিম-স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে দেবার অপচেষ্টা চালিয়েছে। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের নামে তারা মুসলমানদেরকে উজবেক, তাজিক, তার্কোমান, কাজাক ও কিরঘিজ—এই সব দলে বিভক্ত করে দেয়। পশ্চিম তুর্কীস্তানকে উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরঘিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও কারাকালপাকে (স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ); ইদিল-ইউরালকে তাতার, বাশকারদ মুরদার (স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ) ও আরও দুটি প্রদেশে বিভক্ত করে। এমনি করে আযরবাইজানকে

---

48. Joshua Kunitz : Dawn over Samarkand, P. 79.

আযরবাইজান রাষ্ট্র, নাক্‌চিভান, আবখায্‌ইয়া ও দক্ষিণ-ওসেটিন— এই চারটি অংশে ও ট্রান্স-ককেশিয়াকে দাঘিস্তান, চিকেন, ইংগুশ, ওসেটিয়া, কাবারতে বলকার, কারাচে, চেরকেম এজ, কালমুক ও গ্রোয্‌নী (স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ) মায়কেব ও কারাদেনিয—এই দশভাগে ভাগ করা হয়। এই সব উপরাষ্ট্র বা অঞ্চলগুলো রাশিয়ার চর ও আমলাতন্ত্রের অধীনে পরিচালিত হয় ও শতকরা বাহাত্তরজন থেকে আশিজন সরকারি চাকুরিয়াকে খোদ রাশিয়া থেকে এনে বসানো হয়।

তুর্কীস্তান জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা চোকাইয়েভ বলেন ঃ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রদান করা কমিউনিস্টদের আসল উদ্দেশ্য নয়—তারা চায় তুর্কীস্তানের জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করে দিতে। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম অঞ্চলগুলোকে সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল করে তোলার জন্য কমিউনিস্টরা ঠিক করে যে, মধ্য-এশিয়ায় তুলা ছাড়া আর কোন ফসল উৎপন্ন করতে দেয়া হবে না। অন্যান্য শস্য ও খাদ্যদ্রব্য (আলু ও কপি) এ এলাকায় রাশিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে আনা হবে। বলশেভিক মতবাদ প্রচারে তুলা উৎপাদনের চাবিকাঠি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তৃতীয়তঃ, ১৯২৮ সালে আরবি হরফের জায়গায় জোর করে রোমান ও পরে সিরিলিক (রুশ) হরফ প্রবর্তন করে কমিউনিস্টরা মুসলমানকে গোটা ইসলামী দুনিয়া থেকে এবং ইসলামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। ১৯৩৮ সালে রাশিয়ার সর্বত্র রুশভাষা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়।

গোড়া থেকেই এর বিরুদ্ধে তুর্কীস্তানের বাসমাকী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বাসমাকী সৈন্যরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান; শহরে শহরে পল্লীতে পল্লীতে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

তুর্কীস্তানের মত বাশকিরিয়াতে একই নীতি অনুসৃত হয়েছিলো। ১৯১৮ সালে স্বাতন্ত্র্যের ওপর ভিত্তি করে এখানকার অধিবাসীরা নিজস্ব সরকার গঠন করে। ১৯১৯ সালের শেষদিকে কমিউনিস্টগণ বাশকিরীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। তবু এঁরা নিজস্ব জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান। ১৯২১ সালে দু'দুবার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এতে অগণিত বাশকির শহীদ হন। ১৮৯৭ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, বাশকিরীয়দের মোট সংখ্যা ছিল তেত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার তিনশ তেষট্টি। ১৯২৬ সালে সে সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ছ'লক্ষে। বাশকির ও তাতার জাতিকে বিচ্ছিন্ন করা হয় ও এগুলোকে "জাতীয় জিলা" ও "জাতীয় অঞ্চল" বলে নামকরণ করার পর এগুলোকে সম্পূর্ণ করা হয়।

দাগিস্তানীরাও ১৯২০ সাল থেকে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছেন। বিচ্ছিন্ন নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা বার বার বিরোধিতা করেছেন। ১৯২০ সালে যখন রাশিয়া দাগিস্তান অধিকার করে, তখন স্তালিন দাগিস্তানের অধিবাসীকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, শরীয়ত আইন রক্ষা করা হবে।[৪৯] কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দাগিস্তানের সীমানা ক্রমশঃসংকীর্ণ করে আনা হয়। তেরেক নদীর উত্তর দিকটা গ্রোয্‌নী এলাকার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। আর ১৯৫০ সালে শরীয়ত আইন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়।[৫০]

রুশবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই ইদিল-ইউরাল ও ক্রিমিয়ার অধিবাসীগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯১৮ সালের মে মাসে পশ্চিম তুর্কীস্তানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ককেশিয়া ও আযরবাইজানও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রাশিয়া আপাতত এ স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু শেষটায় এ ওয়াদা রক্ষিত হয়নি। শীঘ্রই মুসলমানরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। বাইরের দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনতে বাধা দেবার জন্যই এ নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। জারের সাম্রাজ্যবাদের জায়গায় নতুন বলশেভিক সাম্রাজ্যবাদের পত্তন হলো। অতঃপর দু'বছর ধরে মুসলমানরা সংগ্রাম চালিয়ে যান। যাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল ছিলো, তাঁরা ১৯২৫ সাল অবধি জেহাদ চালিয়ে যান। মুসলমানদের তরফ থেকে গুপ্ত রাজনৈতিক কমিটি অনেকদিন ধরে প্রতিরোধ-আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে কমিউনিস্টরা ভীতি ও ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণ করতে থাকে। মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন জাদীদ বা আধুনিকদল। ১৯০৫ সালে (রুশ-জাপান যুদ্ধ) ভল্‌গা, ক্রিমিয়া ও ককেশাসে জাদীদ দল সংগঠিত হয় ও মধ্য-এশিয়ার তুর্কীস্তান ও বোখরার বুদ্ধিজীবীদেরকেও আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। সমগ্র মুসলিম এলাকায় এই গুপ্ত-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ও ১৯০৮ সালের তুর্কী ও ইরাকী বিপ্লব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। অক্টোবর-বিপ্লবের (১৯১৭)

---

49. "The Soviet Government considers the Shariat the same kind of customary law as those of the other peoples inhabiting Russia. If the Daghestani people desire to preserve is own laws and customs, they shall be preserved."

50. "Stalin precepts when carried out, quickly led to the elimination of the old fashioned beliefs in the usefulness of the Shariat; the Shariat eliminated itself and was quickly liquidated." Soviet State and Law. 1950.

পাঁচ সপ্তাহ পর জাতীয়তাবাদী 'জাদীদ' মুসলিমদের নেতৃত্বে কোকন্দে চতুর্থ নিখিল তুর্কীস্তান মুসলিম কংগ্রেস তুর্কীস্তান গণতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুস্তাফা চোকাই এ আন্দোল পরিচালনা করেন। শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীগণ একযোগে ইসলামী সমাজ গঠনের কাজে লেগে যান। তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক ও শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অনেক দূরদর্শী ধর্মীয় নেতাও এ আন্দোলনে শরীক হন । আশ্‌কাবাদের রুশ-সৈন্য ও কমিউনিস্ট তাঁবেদার শ্রমিকগণ যখন 'তুর্কমেনীয়' সোভিয়েট-সরকার গঠন করে, তখন তুর্কমেনিস্তানের প্রতিটি মানুষ এই বেআইনী সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে রুশ ক্রীড়ানক এই সরকার বিলুপ্ত হয় ও স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। ১৫ জুলাই ন'জন সোভিয়েট নেতা এঁদের হাতে প্রাণ হারায়। তুর্কীস্তান গণ-আন্দোলনের গুপ্ত কমিটি সমগ্র মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছিলো, কিন্তু বোখারার আমীর সাইদ-আলম খানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কমিউনিস্ট সৈন্যগণ জাদীদদের উৎখাত করে দেয়। তিরিশজন জাদীদকে জেলে পুরে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয়। ১৫০ ঘা বেত মারার ফলে মির্জা নাসরুল্লাহ্ মৃত্যুবরণ করেন। জাদীদনেতা ফয়জুল্লাহ্‌র "স্মৃতিকথায়" এ নিষ্পেষণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

বোখারার অধিবাসীগণ ৩৫ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে দেশ ও ধর্ম রক্ষার্থে এগিয়ে আসেন। কোলেসভের নেতৃত্বে পরিচালিত রুশ সৈন্যকে তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে আক্রমণ করেন। প্রথম আক্রমণের পর ১৯২০ সালের ৩১ আগস্ট রুশ সৈন্য আবার বোখারা আক্রমণ করে; ঘরে ঘরে, রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলে। মুসলিম নরনারী ও শিশুদের রক্তে বোখারা রঞ্জিত হলো। অতঃপর কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের বিজয়কেতন উড়তে থাকে। মুসলিম শ্রমিক ও কৃষকগণ এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ও পূর্বকথিত বাসমাকী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ফারগানা কেন্দ্রে গেরিলা বাহিনী গঠন করে এঁরা কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যান। আমীন বেগ অক্টোবর মাসে ফারগানার স্বাধীন মুসলিম সরকার গঠন করেন। এ আন্দোলনের পেছনে মুহম্মদ খোদযাইয়েভ, উসমান খোদযাইয়েভ আরেযভ প্রমুখ নেতা ছিলেন। উসমান প্রথমে কমিউনিস্ট ছিলেন, কিন্তু পরে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে আনোয়ার পাশার দলে যোগদান করেন। ১৪ হাজার লোক আনোয়ারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তুর্কীস্তানের ফয়জুল্লাহ্ খাজা, আকমল ইকরাম, দৌলত মনবী, সুলতান ইনসান, আবদুল্লাহ্ জব্বার খাসানভ (প্রাক্তন কমিউনিস্ট), কারী আবদুল্লাহ (প্রাক্তন কমিউনিস্ট), নুর কাল বাতীর, দানিয়েল বেগ

ওল্পিকবাশী ও ইব্রাহীম বেগ ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আন্দোলনের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রেখেছিলেন।

আযরবাইজানেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। স্বাধীন আযরবাইজান রাষ্ট্র ঘোষণার পর রুশ-সাম্রাজ্যবাদিগণ তুর্কী-বিরোধী আর্মেনীয় শাউমিয়ানকে মার্কসবাদ প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দেয়। আগেই বলা হয়েছে যে, রসুলজাদা মুহম্মদ আমীন, তোপচিবাশী আলী মারদান, ফতেহ আলী খান, হাসান বে, ইউসুফবেলী নাসিব বে, বাগিরভ—এই সব নেতার সঙ্গে শাউমিয়ান এঁটে উঠতে পারেনি। ফলে আর্মেনীয় সৈন্যরা মুসলিম নিধন শুরু করে। বাকু অঞ্চলে ৫০ হাজার মুসলিম নরনারী ও শিশু মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু চার মাসের মধ্যে ১০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে মুসলমানরা আবার আক্রমণ করে। ঘন ঘন কৃষক-বিদ্রোহ ও বাকুর তৈল খনিতে শ্রমিক বিদ্রোহ ফেটে পড়ে। কিন্তু ক্রিমিয়া ইদিল-ইউরাল ও মধ্য-এশিয়ার মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে ১৯২০ সালের ২৭ এপ্রিল রুশ সৈন্য বাকু দখল করে নেয়। ১৯৩৮ সাল অবধি এ গুপ্ত আন্দোলনের খবর পাওয়া গেছে।[৫১]

১৯৪৭ সালে কানসু-শানসী এলাকায় চীনের মুসলমানরা সাফল্যজনকভাবে কমিউনিস্ট ফৌজকে হটিয়ে দেয় ও কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করে। ১৯৫০ সালে নানা ফন্দি-ফিকির করে কমিউনিস্টরা মুসলমানদের বশে আনে। এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২২ হাজার চীনা তুর্কীকে মেরে ফেলা হয়েছে। তুর্কীস্তানে ২০ লক্ষ চীনাকে (পরে আরও দশ লক্ষ) এনে বসানো হয়েছে। ১৯৫৩ সালে "জেন মিন জি পাও" পত্রিকা (১০ অক্টোবর) স্বীকার করেছে যে, মুসলমানরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে আসছেন। ধর্মের প্রতি অসম্মান ও শূকরের গোশ্ত খেতে বাধ্য করার ফলে ১৯৫০—৫২ সালে এ বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। ভূমি-সংস্কারের সময় হোনান প্রদেশের মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে ও নিকৃষ্ট জমি তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। মুসলিম আচার-ব্যবহার নস্যাৎ করার ফলে সিয়াং চিউ, লোইয়াং ও চেং চাউ জিলায় অসন্তোষ ফেটে পড়েছে। উত্তর-পশ্চিম চীনে ভূমি-সংস্কারের সময়ে বিরাট সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয় (জিং লিয়াগোর বিদ্রোহ ও কাজাক বিদ্রোহ)। কানসু প্রদেশে ইয়াং চিথুন ও মা কুও ইউয়ান ও সিনকিয়াং প্রদেশে ওসিংমান, চিয়া নিমুহান, যুতানি এরহানহাচি, সু এংতা হাপামি ও ডাঃ ইয়াওলোর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। ১৯৫০ সালে তাঁরা আইউ শহর

---

51. The Hindusthan Times, August, 25, 1938.

ঘিরে ফেলেন ও চীনা কমিউনিস্টদের আক্রমণ করেন। উরুমচি দু-দুবার মুসলিম গেরিলাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। পূর্ব-তুর্কীস্তানের যুবকগণ আজও এ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

গোষ্ঠীগত কোন্দল খিভার মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। উজবেকেরা তাজিকদের বিরুদ্ধে ও তুর্কমেনীয়গণ উজবেক ও তাজিকদের সঙ্গে বিরোধিতা করতে থাকেন। সুবিধাবাদী জুনায়েদ খান তুর্কমান যাযাবরদের নিয়ে খান ইসফানদিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। ফলে উজবেক ও বিশেষ করে কাজাকরা ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯২০ সালে জুনায়েদের অনুসারীরা তাঁর দল পরিত্যাগ করে ও জাতীয়তাবাদী জাদীদ দলে প্রবেশ করে। লেনিনের ওয়াদার ওপর ভরসা করে তারা কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এ সুযোগে রুশ সৈন্য জুনায়েদ খানকে অপসৃত করে ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন না করে বরং খিভা শহরকে রুশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। মুসলিম সংগ্রামের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো—তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা ছিলো নিতান্ত সামান্য। তাছাড়া বাইরের দুনিয়া থেকেও তাঁরা কোনও সাহায্য পাননি। তাঁদের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনাও ছিল না। অহেতুক গোঁড়ামি ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা তাঁদের নিঃশেষ করে দেয়। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অরাজকতার মাঝে সুচতুর কমিউনিস্ট প্রচার খুব বেশি কার্যকরী হয়।

সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ শত চেষ্টা করেও কিন্তু মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করতে পারেনি। মুসলমানরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ হলেন সর্বশক্তিমান ও সর্বময় বিচারক। ফলে তাঁদের জীবনে এমন এক মর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম হয়, যা দুনিয়ার বিপদ-আপদ, ঘৃণা-বিতৃষ্ণা কিছুতেই বিনষ্ট করতে পারে না। এ আত্মবিশ্বাসই তাঁদেরকে নাস্তিক্যবাদী সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁদের সংস্কৃতি যে আজও বেঁচে আছে, এ থেকে এ-কথারই প্রমাণ মেলে। শত শত বীর এজন্য জীবিকা, বাড়ি-ঘর-দুয়ার, পরিবার-পরিজন ও এমনকি, নিজের শেষ রক্তবিন্দু দান করে দেন। কিন্তু সবকিছুর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলিম জন-সাধারণের আপোসহীন সংগ্রাম। আজকের দিনে পারস্পরিক ঐক্য ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপরই নির্ভর করবে এ সংগ্রামের সাফল্য।

॥ নয় ॥

আযাদী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট দমননীতি

গত ৪০ বছর ধরে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদিগণ উজবেক, তাতার, আযরবাইজানী, তুর্কমেন, ক্রিমীয় ও ককেশাসের চেকেন, কাবারদীয়, বলকার ও ইংগুশদের পারস্পরিক সংহতির বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আযাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে রাশিয়া "সংস্কার" বা purging নীতি গ্রহণ করেছে। ককেশাসের "গণতন্ত্রগুলোর" মধ্যে বাকু অঞ্চলের অধিবাসীরা তথা আযরবাইজানীরা সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের কবলে খুব বেশি নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়েছে। কমিউনিস্টরা বিভিন্ন মুসলিম জাতির পারস্পরিক সম্পর্কই যে শুধু ধ্বংস করতে চেয়েছে তাই নয়, বাইরের মুসলমানদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবার নীতিও চালিয়ে যাচ্ছে।

তবুও এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম সংহতি বিলুপ্তি হবার নয়।

কমিউনিস্ট দমননীতি সম্পর্কে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। এবারে বিশদভাবে সে সম্বন্ধে আলোকপাত করা যাক।

সোভিয়েট প্রচার দফতর থেকে একথা বার বার প্রচার করা হয় যে, মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসন ও অধিকার নাকি রুশ-সরকার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করে। বিভিন্ন মুসলিম জাতির সাম্য ও স্বায়ত্তশাসিত "গণতন্ত্রে"র কথাও খুব ফলাও করে জাহির করা হচ্ছে। ইরানী কবি ফেরদৌসীর "শাহ্‌নামা" রুশভাষায় তরজমা করা হয়েছে ও ফেরদৌসী সম্বন্ধে অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে। যে-সব মুসলমান হজ্জ করতে গেছেন, তাঁদের নাম প্রচার করে রাশিয়া বোঝাতে চেয়েছে যে, সোভিয়েট শাসনে মুসলমানরা খুব বেশি স্বাধীনভাবে

জীবনযাপন করেন। আরবি ভাষায় যে খোৎবা পড়া হয়, একথাও প্রচারিত হয়েছে বারে বারে।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে উল্টো। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট সরকার জোর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। ধর্মীয় নেতাদের কোনও স্বাধীনতা নেই—বাধ্য হয়ে বড় মুশকিলে পড়েই তাঁরা কমিউনিজমের "গুণগান" করেন। প্রত্যেক ওয়াজ-নসিহতের গোড়াতেই তাঁদেরকে বলতে হয়—"আমাদের কমরেড— (স্তালিন বা) ক্রুশ্চেভের সমস্ত গৌরব—সোভিয়েট শক্তি আল্লাহ্‌র মহান অবদান।" গত ৪০ বছর ধরে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদিগণ উজবেক, তাতার, আযরবাইজানী, তুর্কমেন, ক্রিমীয় ও ককেশাসের চেকেন, কাবারদীয় ও ইংগুশদের পারস্পরিক সংহতির বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উত্তর-ককেশাস, আযরবাইজান ও তাতার বাশকিরদের মধ্যে ১৯১৭ সালের শেষের দিকে স্বাধীন সরকার সংগঠিত হয়। কিন্তু সোভিয়েট সরকার জোর করে এসব রাষ্ট্র ধ্বংস করে ফেলে। স্বাধীন তুর্কীস্তান গণতন্ত্র লালফৌজের অধিনায়ক ফ্রুনযের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ১৯১৯ সালে তাসকেন্তে কমিউনিস্ট পার্টির বৈঠক বসে। এ অঞ্চলের মুসলমানগণ এই পার্টির কাছে ইসলামী আইনের ওপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক সংস্থা গঠন করবার জন্য দাবী পেশ করেন। জবাবে বলা হয় যে, রাশিয়ায় কেবলমাত্র সোভিয়েট আইন ছাড়া আর কোন আইনের অস্তিত্ব থাকবে না।

যখনই কোন মুসলমান গোষ্ঠী বহির্বিশ্বের অন্যান্য মুসলমানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা জোর করে তুলে ধরেছেন, তখনই তাঁদেরকে অযথা নাস্তনাবুদ করা হয়েছে। গোটা ইসলামী ঐতিহ্য ও আরবি-ফারসী সাহিত্যের সাথে আযরবাইজানী তাতারদের বিরাট সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রয়েছে। এজন্য সমগ্র মুসলিম-জগতের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এ-সব বিষয় চাপা দিয়ে, ইরানী আযরবাইজানকে সোভিয়েট-কবলিত করে স্বাধীন করবার "নীতি" অনুসৃত হয়েছে। আর এ-হেন "স্বাধীনতার" বাণী প্রচার করার ব্যাপারে মুসলমানদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে।

আযাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে রুশ-সরকার "সংস্কার" বা Purging নীতি গ্রহণ করেছে। ককেশাসের "গণতন্ত্র"গুলোর মধ্যে বাকু অঞ্চলের অধিবাসীরা তথা আযরবাইজানীরা সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের কবলে খুব বেশি নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়েছে। তাজিকদের সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতিক দিক

থেকে ইরান ও আফগানিস্তানের অধিবাসীদের অনেক সাদৃশ্য আছে। এই ঐক্যবোধকে বানচাল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়েছে। ১৯১৮ সালের ২২ এপ্রিল জর্জিয়া, আযরবাইজান ও আর্মেনিয়া নিয়ে সমগ্র ট্রান্স-ককেশিয়া আযাদী ঘোষণা করে।[৫২] ১৯২২ সালের ১২ মার্চ তিফলিস শহরকে রাজধানী করে ট্রান্স-ককেশীয় ইউনিয়নের স্বীকৃতি দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সালে জোর করে এ ইউনিয়ন নস্যাৎ করে দেয়া হলো ও এ-সব অঞ্চলকে সোভিয়েট আওতাভুক্ত করে নেয়া হয়। ২ কোটি ২ লাখ তুর্কী সোভিয়েট রাশিয়ার বাসিন্দা। এদের মধ্যে তুরস্কের ২ কোটি ও পূর্ব-ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের ৩ কোটি তুর্কীর সঙ্গে একটা বিরাট ঐক্যবন্ধনী রয়েছে। চেকেন-ইংগুশ, কারাচাই-বলকর, দাগিস্তানী, ওসেটিয়ান ও আদিগিজদের মধ্যে ইসলামভিত্তিক এক বিরাট ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল। ঐতিহ্য, জীবনদৃষ্টি ও দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত ঐক্য ধ্বংস করার জন্য এদেরকে যে কেবল বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে, তাই নয়, এদের নেতাদেরকেও মেরে ফেলা হয়েছে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ও অনেককে আবার সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে; এদের আইনব্যবস্থা ও স্বাধীনতা বিনষ্ট করা হয়েছে, মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এমনকি বিদেশে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করাও ছিল ঘোর অপরাধ। রুশ-সরকার ককেশীয়দের বল-বীর্য সম্পর্কে অবহিত ছিল—তাঁরা এসেছেন, সে কথাও তাদের খুব ভালভাবেই জানা ছিল। তাই তাঁদেরকে জোর করে অন্যত্র চালান দেয়া হয়েছিল। গ্রোযনীতে চালান দেবার যে সদর দফতর ছিল, তার প্রধান ছিলেন কর্নেল জেনারেল সেরভ। এ নীতির বিরুদ্ধে ৫০০ চেকেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ সম্পর্কে সপ্তম অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ধ্বংস-নীতি, চালান-নীতি ও নাস্তিক্যবাদ প্রচারের কথা বাদ দিলেও ভৌগোলিক নিঃশেষীকরণ নীতি, সাংস্কৃতিক নিষ্পেষণ নীতি, বিভেদনীতির কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই সব নীতির বিরুদ্ধে বাসমাকী আন্দোলন উজবেক স্বদেশ-প্রেমিকদের মনে স্বাধীনতার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল। এটা লক্ষ্য করে কমিউনিস্ট সরকার উজবেকিস্তানের আয়তন কমিয়ে দিয়ে একে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত করে।[৫৩]

---

52. ১৯১৭ সালের ১৫ নভেম্বর ট্রান্স-ককেশীয় কমিটি গঠিত হয়।
53. উজবেকিস্তানের আয়তন ছিল ৯০০ × ২০০ মাইল- $\frac{}{৫}$ অংশ আরল হ্রদের তীরে কারাকালপাকিয়া স্বায়ত্তশাসিত গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কাগান শেরওয়ানী, নিযামী গজনভী, ফতেহ্ আলী আখান্দভ (১৮১২—৭৮) এই সব আযরবাইজানী কবিদের মাধ্যমে সোভিয়েট সরকারের মাহাত্ম্যের কথা প্রচার করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইরানী কবি নিযামীকে (১১৪১—১২০৩) সোভিয়েট আযরবাইজানী বলে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু মেখতী নামক জনৈক আযরবাইজানী সাহিত্যিক যখন প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন যে, আখান্দভ, আখবারভ (১৮৭০—১৯৩৩) ও মামেদ তুলি-যেদ (১৮৬৯—১৯৩২) সোভিয়েট কবি বলে পরিচিত হতে পারেন না, তখন তাঁকে প্রতিবিপ্লবী ও মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ষষ্ঠ ও দশম অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক নিষ্পেষণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অক্টোবর-বিপ্লবের পর বাকু অঞ্চলে "স্বাধীনতা" কথাটি লেখা ছিল বিরাট অপরাধের কাজ। গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার করেই ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে (৩০ ও ৩১ মার্চ) ১৪ হাজার আযরবাইজানীকে হত্যা করা হয়। বাকুর তৈলখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল তুর্কী। "মুসাওয়াত গণপার্টি" আযরবাইজান তুর্কীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে কাজ করছিল। বাকুর শ্রমিক কাউন্সিলে এ দলই শতকরা ৭০টি আসন লাভ করে। কিন্তু সোভিয়েট কমিসার স্টিফেন শাউমিয়ান গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত কাউন্সিল বানচাল করে দেন ও বাড়িতে বাড়িতে তুর্কী নর-নারীদেরকে হত্যা করা হয়; মসজিদ, স্কুল, ছাপাখানা, পাঠাগার, নাট্যশালা ও ব্যবসায়কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ সংঘর্ষে অনেক আযরবাইজান সমাজবাদীও মারা যান। এর মধ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষের বিন্দুমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি। এই জন্য "হিম্মত" নামক আযরবাইজানী কমিউনিস্ট দল শাউমিয়ানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে বিভেদ নীতিও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাকু তৈলখনিতে দক্ষিণাঞ্চল থেকে ও ইদিল-ইউরাল ও দাগিস্তান থেকে যে-সব শ্রমিক আসতো, তাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ধর্মীয়, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বন্ধন গড়ে উঠেছিলো। ১৯২০ সালে এদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৯৫ জনের মত। পনর বছর পরে এদের জনসংখ্যা শতকরা ৬০ জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ও রাশিয়ানদের সংখ্যা ২ থেকে ১২-তে গিয়ে ঠেকেছে। চেক ও হাবিত— এই সব ছোট ছোট সংখ্যালঘুদের জন্য বেশি সুযোগ-সুবিধা দান করে তাদেরকে আযরবাইজানী তুর্কীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে। এসব সংখ্যালঘুর জন্য লেনকোরান,

তালিতা, কারাবাখ, কুরত্, বাকু, শেমাখা, কুবা, তাত, শেকি, উদিন, কোনাককেন ও হিল্ল জিলায় স্কুল খোলা হয়েছে। ১৯২০ সাল থেকেই দক্ষিণাঞ্চলে আযরবাইজানী শ্রমিকদের আগমন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় ও তার পরিবর্তে ৫ লক্ষ রাশিয়ানকে এনে বাকুর তৈলখনিতে কাজে লাগানো হয়। ১৯৩৮ সালে ১ লক্ষ আযরবাইজানীকে দেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় ও তাদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং জোর করে এদেরকে ইরানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ককেশাসের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এ চালান-নীতিকে "দুঃখময় কাফেলা" বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৫৪]

কমিউনিস্টরা যে কেবল বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে তাই নয়, বাইরের মুসলমানদের সঙ্গে সত্যিকার স্বাধীন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবার নীতিও চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম আযাদী আন্দোলন ধ্বংস করবার জন্য এরা সাম্রাজ্যবাদী দমননীতি অনুসরণ করেছে। "প্যান-ইসলামবাদ" নামে আখ্যাত করে মুসলমানদের সংহতি ধ্বংস করবার ঘোর ষড়যন্ত্র চলেছে। বেতার ও প্রচারদফতর মারফত কমিউনিজম ও নাস্তিক্যবাদ প্রচার করা হচ্ছে। ইসলামী জাতীয়তাবাদ স্বীকার করলে অন্যান্য জাতীয়তাবাদ সহজেই স্বীকার করে নিতে হবে—এই ভয়ে সোভিয়েট রাশিয়া ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধকে টুটি চেপে মারতে চেয়েছে। মীর সৈয়দ সুলতান গালিয়েভের বিরুদ্ধে তাতারিয়া, বাশকিরিয়া, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিয়া ও তাজিকিস্তান নিয়ে এক নিখিল তুরান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করার অপরাধের অভিযোগ আনা হয়। এই ভাবে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট করবার জন্য সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদী স্টীমরোলার চালিত হচ্ছে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম "ইখওয়াত" ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। কারণ ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম সংহতি বিলুপ্ত হবার নয়।

54. Kurtulus,March,1938.

॥ দশ ॥

বিকৃত ইতিহাস রচনার অপপ্রয়াস

রাশিয়ার মুসলমানদের ইতিহাস বিকৃত করে ও তার অপব্যাখ্যা দিয়ে কমিউনিস্ট সরকার বছরের পর বছর নতুন কাল্পনিক ইতিহাস রচনা করবার জন্য দেদার টাকা খরচ করছে।

মধ্য-এশিয়ার মুসলমানদের ওপর এতটা চাপ দেয়ার ফলে বিরোধিতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। রুশীকরণের বিরুদ্ধেই এ সংগ্রাম সব চাইতে বেশি জোরদার হচ্ছে।

ককেশাসের মুসলমানদের সত্যিকার ইতিহাস লেখার কাজে মুসলামানদেরই হাত দেয়া উচিত। অচিরে মুসলিম দেশগুলোতে—বিশেষ করে করাচী, কায়রো ও মক্কা শহরে এ বিষয়ে গবেষণা কেন্দ্র খোলা দরকার। এতে করে দুনিয়ার মুসলিম মধ্য-এশিয়ার সত্যিকার ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হতে পারবেন। মুসলিম জ্ঞানীগুণী ও উলামাদেরকে একাজে এগিয়ে আসতে হবে।

কোনও জাতির গোটা ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধ্বংস করে দিতে পারলে সে জাতির ঐক্যসাধন ও পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা নিতান্ত স্তিমিত হয়ে আসে। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকাল এ নীতিই অনুসরণ করে এসেছে। কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। সোভিয়েট-কবলিত মুসলিমদের ইতিহাস বিকৃত করে ও তার অপব্যাখ্যা দিয়ে কমিউনিস্ট সরকার বছরের পর বছর নতুন কাল্পনিক ইতিহাস রচনা করবার জন্য দেদার টাকা খরচ করছে। আযরবাইজান, তুর্কীস্তান ও উজবেকিস্তানের মুসলমানদের নিজস্ব ক্লাসিকাল জাতীয় কাব্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে "আতা কোরকুত", "আলপামিশ" ও "মানাস"—এসব কাব্যসম্পদের নাম করা যেতে পারে। বিপ্লবের পর থেকে ১৯৫৭ সাল অবধি ঐশ্বর্যশালী ও মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ পাঠ করা ছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ বছরেই সোভিয়েট

সরকারের "সম্পাদনায়" এসব বইয়ের মাত্র কয়েক কপি প্রকাশ করতে অনুমোদন করা হয়। তাতার ও বাশকিরদের জাতীয় ক্লাসিক কাব্যগ্রন্থ "এদিগই" এখনও প্রকাশ করবার অনুমতি দেয়া হয়নি। কেবল যে রাশিয়ান ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই নয়, নিজস্ব ইতিহাস পাঠ করবার অনুমতিও দেয়া হয়নি।

১৯৫০ সাল থেকে বিভিন্ন জাতির কাল্পনিক ইতিহাস রচনা করবার চেষ্টা চলতে থাকে ও "বলশেভিক" পত্রিকায় জার-সরকার কর্তৃক ককেশাস অঞ্চল অধিকার করাকে ইতিবাচক ও প্রগতিবাদী কৃতিকর্ম হিসেবে সুচিত্রিত করা হয়। কিন্তু পূর্বে জার-শাসন ছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতীক। বুদ্ধিজীবী মহল ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ওপর নতুন করে হামলা শুরু করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাকু অঞ্চল তথা আযরবাইজানের অধিবাসীরা সবচাইতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতি সুশৃঙ্খলভাবে এসব জাতির ইতিহাস ভ্রান্তরূপে চিত্রিত করা হচ্ছে। কাজাক, উজবেক ও ককেশিয়ার আযাদী সংগ্রামকে গুটিকয়েক বে ও মোল্লার অভ্যুত্থানরূপে দেখানো হচ্ছে। এসব জাতির নাকি কোনও পৃথক সত্তা ছিল না—এরা কেবল তুর্কী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতিয়াররূপেই কাজ করে এসেছে। ককেশাসের অগণিত বীর-শহীদদের কথা, তাঁদের মহান ঐতিহ্যের ইতিহাস এখানকার মুসলমানরা ভুলতে পারেনি। এই কারণেই তথাকথিত নতুন ইতিহাস লেখার হিড়িক পড়ে গেছে। এ ব্যাপারে রাশিয়াকে ভারী মুশকিল পোহাতে হচ্ছে। নিরক্ষরতা দূর করে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার করতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার শিক্ষার আলো লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারাও পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াবার ভরসা খুঁজে পেতে চায়। তুর্কমেন জাতির স্বাধীনতার ইতিহাস ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তুর্কমেনরা নেতার অহেতুক প্রতিপত্তি স্বীকার করেন না। তাই তাঁরা বলেন, "বিজ্ বিবাশ খাল্‌ক বোলামিষ্" আমাদের কোনও নেতা নেই। এঁদের জাতীয় কবির নাম মাখদুম কুলী। মাখদুম কুলীর কবিতা পাঠ করার ব্যাপারে সোভিয়েট সরকার বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। তাজিকগণ জাতিতে ইরানী ও এঁদের ভাষা "জাগতাই" ইরানী ও তুর্কী ভাষার সমন্বয়। ইরান তথা সমগ্র মুসলিম জগতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে বানচাল করে দেবার জন্যও সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়েছে। কাজাকরাও গত পঁচিশ বছর ধরে কমিউনিস্ট সাংস্কৃতিক জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে। আলতাই ও তিয়েনশানের কাজাকদের এ সংগ্রাম পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। চেংগিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্গের বংশধরদের প্রতি রাশিয়া প্রথমদিকে নরমপন্থী নীতি অনুসরণ করতে থাকে; কিন্তু ১৯৪৬ সালে এ নীতি পাল্টে যায়। এ-বছরে আলতাই পর্বতে

কমিউনিস্ট হামলা ও অভিযান শুরু হয়ে যায়। হাজার হাজার নরনারী ও শিশু এ হামলা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে। ১৯৪৯ সালের শরৎকালে এরা তিয়েনশানের দক্ষিণাঞ্চলে হিজরত করতে বাধ্য হয়। ৫০ হাজার কাজাক অমানুষিক দুঃখ সহ্য করে "ক্ষুধার্ত পর্বত" পার হয়ে তিব্বত সীমান্তের ৬০০ মাইল দূরে গেযকুলে উপনীত হয়। তিব্বতীদের কাছ থেকেও এরা সুব্যবহার লাভ করেনি। অতঃপর এরা ভারত-তিব্বত সীমান্তে রুডেকে এসে পৌঁছায় ও ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরে বসবাস করবার অনুমতি ভিক্ষা করে। সে আবেদন যখন অগ্রাহ্য করা হলো, তখন জাতিসংঘের (UNO) মধ্যস্থতায় এদেরকে তুরস্কে পাঠিয়ে দেয়া হয়। Good frev Lias এসব কাজাক মুহাজিরদের মুখের বর্ণনা থেকে একখানি মূল্যবান বই লিখেছেন। বইখানির নাম Kazak Exodus,'[৫৫] সোভিয়েট ইতিহাস থেকে এসব বিষয় একেবারে বাদ পড়ে গেছে।

অক্টোবর-বিপ্লবের ফলে শুধু যে রুশপ্রভাব খুব বেশি জোরদার হয়েছে, তাই নয়, রুশ-কবলিত অঞ্চলগুলোর কৃষক-সমাজের ওপর রুশ শ্রমিকদের আধিপত্য অনেকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে আরমেনিয়ার "দার্শনাক", আযরবাইজানের "মুসাওয়াত", কাজাকিস্তানের "আলাশ ওরদা" ও তুর্কীস্তানের "শুরা ইসলামিয়া" আন্দোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে। গোড়ার দিকে বাশকিরগণ জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন ও ১৯১৯ সালে আক-ভ্যালিদভের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলনও "উস্‌য়্যু" ও "জিভেগেন" (১৯৩০) এই দুই প্রতিষ্ঠানের মারফত কাজ চালিয়ে যেত। ১৯৩৭ সালে বাশকির নেতা উযীরে আলা বুলাশেভ ও প্রেসিডেন্ট তাগিবভকে অপসৃত করা হয়। পূর্বের মত এসব আন্দোলনের ইতিহাসকেও বিকৃত করা হয়েছে।

১৯৪৪ সালে স্তালিন "ইদুফে" ও "মুরাদিম" এ দুখানি নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু এক বছর পরেই এগুলোকে "প্রতিবিপ্লবী"রূপে চিত্রিত করা হয়। "কাখিম তুরিয়া" নামক কাব্যনাটিকে রাশিয়া ও বাশকির সৈনিকদের পার্থক্য তুলে ধরা হয়। এই কারণে এ নাটকটিকে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হয়। আল্লাহ্‌র নাম করে শুরু করা হয় বলে কিরঘিজ কবিদের প্যান ইসলামবাদীরূপে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁদের ক্লাসিক সাহিত্য "মানাসে"র বিরুদ্ধেও ঘোর ষড়যন্ত্র চালানো

---

৫৫. Godfrey Lias : The Kazak Exodus, Evans Bros. London, 1956.

হয়েছে। এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এঁরা সংগ্রাম করে আসছেন। স্তালিন তাঁর মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে কিরঘিজ পুরাণ "মানাস" ও মোঙ্গল পুরাণ "গেসের" রক্ষণাবেক্ষণ করার নীতি ঘোষণা করেন।

রাশিয়ার মুসলমানরা যে জার-শাসনকে খুব সুনজরে দেখতেন না, রুশ উযীর সভার বিভাগীয় প্রতিনিধি পেট্রোফস্কির বর্ণনা থেকেই সে বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে।[৫৬] সরকার পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। প্রতিনিধি সভা ("আক্ সাকাল") ছিল বটে, কিন্তু সহজেই জোর করে রাশিয়ান পুতুল (puppet) খাড়া করা মোটেই বিচিত্র ছিল না।[৫৭] জনৈক রাশিয়ান কর্মচারী তাঁর রিপোর্টে বলেন ঃ "নৈতিক দিক থেকে আমরা দেশের সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস জাগাতে পারিনি। তারা মনে করে যে, আমরা জোর করে তাদের দেশ দখল করেছি।"

সোভিয়েট রাশিয়া অতীতের প্রায় সব সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে আখ্যা দিয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, নেভাই, জামী, রুমী ও ফেরদৌসীকে উজবেক ও তাজিক কবি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কাল্পনিক ইতিহাস তৈরির কাজটা খুব বেশি সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন অঞ্চলের কমিউনিস্টগণ মস্কোর ওপরওয়ালাদের মোটেই খুশী করতে পারেনি। ফলে কাজাকিস্তান ও অন্যান্য অঞ্চলের সুষ্ঠু ইতিহাস প্রণয়ন আজও সম্ভবপর হলো না। গায়ের জোরে শ্লাভ ও রাশিয়ানদের সঙ্গে এসব ঐতিহাসিক সংযোগ প্রমাণ করবার জোর প্রচেষ্টা চলেছে। রুশ জাতীয়তাবাদ প্রচার করে ককেশীয় মধ্য-এশিয়ার জাতীয়তাবাদকে বিলুপ্ত করবার চেষ্টা চলছে।

দাগিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান সামুরস্কি ধর্মবিরোধী অভিযান শুরু করেন। কিন্তু এতে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তাই ১৯৩৭ সালে তাঁকে "বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী" ও "জনগণের শত্রু" আখ্যা দিয়ে ফাঁসি দেয়া হয়। বাকু, তাসকেন্ত ও উফা—এই এলাকায় ইসলামের প্রভাব অস্বীকার করবার উপায় নেই। এর একটা বড় কারণ হলো বীর নেতা শামিল বেগের নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তা। ১৮৩৫ ও ১৮৩৯ সালে শামিল দাগিস্তান ও চেকেনিয়ার অগণিত পাহাড়ী মানুষের নেতারূপে জার-শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সোভিয়েট বই-পুস্তকে শামিলকে

---

56. European Messenger : March. 1873.
57. Eugene Schuyler : Turkistan Vol. I., London 1876. P. 237.

অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক নেতা, সুচতুর পরিচালক ও আঞ্চলিক সামন্তবাদের বিরোধীরূপে চিত্রিত করা হয়।[৫৮] বিপ্লবের প্রথম থেকে কমিউনিস্টরা জারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরোধিতা করে এসেছে ও জোর করে অনেক দেশকে রুশ-কবলিত করার বিরুদ্ধে ঘোর নিন্দা করে এসেছে। Mrs. A. M. Pankratova ১৯৪৭ সালেও লেখেন যে, শামিল যে কেবল জারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তাই নয়, তিনি সমস্ত সামন্তবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন; কারণ, তিনি ছিলেন গণতন্ত্রকামী ও প্রগতিবাদী নেতা। Soviet Encyclopedia-র প্রথম সংস্করণে শামিলকে জাতীয় নেতা বলে স্বীকার করা হয়েছিল। কার্ল মার্কসও শামিলকে জাঁদরেল গণতন্ত্রকামী নেতা বলে অভিহিত করেন।

"Shamil was the leader of the national liberation movement of the Caucasian mountain people, which was directed against the colonial policy of Tsarist Russia. The popular revolt directed against Russia and against the local propertied classes, was basically anti-feudal,"[৫৯] কিন্তু এ আন্দোলন যে ইসলাম ভিত্তিক ছিল, তার কোনও উল্লেখ কমিউনিস্টদের লেখায় পাওয়া যায় না।

যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই রুশসভ্যতার গুণকীর্তন শুরু হয়ে গেল। ১৯৫০—৫১ সালে অগণিত ককেশীয় পাহাড়ীর সর্ববাদীসম্মত জনপ্রিয় নেতা শামিল বেগ ও তাঁর আন্দোলন "মুরীদবাদে"র বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ইতিহাস লেখার ব্যাপারে নতুন চাকা ঘুরে গেল। শামিল-সমস্যা সমাধানের জন্য "The Institute for History of the All-Union Academy of Sciences-এর এক সভা আহ্বান করা হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ রাতারাতি ইতিহাস পরিবর্তনে রাজী হলেন না। তখন বাধ্য হয়ে আযরবাইজানের বাগিরভ ও দাগিস্তানের দানিয়ালভ ঘোষণা করলেন যে, শামিলকে জাতীয় নেতা বলে স্বীকার করা যেতে পারে না; কারণ, তিনি নাকি তুর্কী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের ক্রীড়নক বা পুতুল বৈ আর কিছু ছিলেন না। এঁদের ঘোষণা যথাক্রমে " Bolshevik" (July, 1950) ও "Voprosy Istorii" পত্রিকায় প্রকাশিত

---

58. History of the USSR. Vol 2, Moscow 1944. PP. 155—158.
59. Soviet Encyclopedia. 1943, Vol 6, 804–805.

হয়। জার কর্তৃক ককেশাস অঞ্চল অধিকার করাকে আশীর্বাদস্বরূপ চিত্রিত করা হয়েছে। বাগিরভ বলেছেন শামিলের মুরীদবাদ প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাকামী হতে পারে না, কারণ, তার সঙ্গে ইসলামের সংযোগ আছে।

শামিল ও দাগিস্তানী নেতৃবৃন্দ ১৮৫৯ সালের মার্চ মাসে তুরস্কের সমর সচিবের কাছে যে চিঠি লিখেন, তা থেকেই শামিলের বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এ চিঠিতে ছিলো ঃ

"তামাম জাহান একথা জানে যে, চারকোসদের একমাত্র সাধনা হলো স্বাধীনতা লাভ করা। কারণ, স্বাধীনতা লাভে আমাদের সত্যিকার ও অবিসংবাদিত দাবী রয়েছে। ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের সম্মতি ও সহযোগিতা এবং আমাদের পূর্ণ বাসনা অনুযায়ী যতদিন আমরা এ স্বাধীনতা লাভ করতে না পারবো, ততদিন রাশিয়ার সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের আশা-ভরসা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারি না ও 'শান্তি' কথাটি আমরা উচ্চারণও করবো না।"

শামিল স্বায়ত্তশাসনের একজন বিরাট সমর্থক ছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি যথেচ্ছভাবে ইতিহাস বিকৃত করে তাঁর নামে কালিমা লেপন করেছে। জার-শাসন ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকাররূপে কমিউনিস্ট পার্টি ইসলামী আন্দোলনের আশংকায় আজ নতুন করে শামিলকে দোষারোপ করতে শুরু করেছে। কিন্তু রুশ-বিপ্লবের পর এই শামিলকেই প্রগতিবাদী বীর-সেনানীরূপে চিত্রিত করা হয়।

মনে রাখতে হবে যে, রাশিয়ার জার-সরকার আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শক্তির বিরোধিতা করতেন। Merx-Engels-Lenin Institute-এর E.Y. Bogush তাঁর "Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century" নামক পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ ইতিহাস লেখার সময় জটিল বিষয়কে জোর করে সহজ করে ফেলা অনুচিত। ভুললে চলবে না যে, মার্কস জার-শাসিত রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির ঘোর নিন্দা করেছেন।

আযরবাইজানী লেখক হায়দর হোসেনভ তাঁর মূল্যবান বই "History of Nineteenth Century Social and Philosophical Thought in Azerbijen" লেখেন। এজন্য ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে তাঁকে স্তালিন পুরস্কার দেয়া হয়। কিন্তু দু' মাস পরে Soviet Literary Gezatte-এ এর সমালোচনা করা হয়। জারের বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম আন্দোলনকে

মোবারকবাদ জানান ও শামিলের বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন—এজন্য হোসেনভ ও আযরবাইজানী বিজ্ঞান আকাদামীর সদস্যদের নাস্তনাবুদ হতে হয়।

আযরবাইজান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানেও নতুন কাল্পনিক বিকৃত ইতিহাস রচনা করা হচ্ছে। সোভিয়েট মতানুসারে, ইরানীরা নিজেদেরকে ইরানী সাহিত্যের ধারক ও বাহকরূপে মনে করতে পারবে না। কারণ, তারা প্যান-তুরানবাদের সমর্থক। বিখ্যাত ইরানী কবি নিযামীকে (১১৪১—১২০৩) সোভিয়েট কবি বলে প্রচার করা হচ্ছে। সোভিয়েট কমিউনিস্টদের আলোকে তাঁর কবিতার ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। স্তালিনের মতে, নিযামী ইরানী কবি নন, ইরানীরা কিভাবে আযরবাইজানীদের পূর্বপুরুষদের উপর জুলুম চালিয়েছে, তারই নির্বাক দর্শক মাত্র।[৬০] তুর্কীদের সঙ্গে আযরবাইজানীদের সম্পর্কের কথা বেমালুম হজম করে ফেলা হলো। পার্টি সেক্রেটারী মীর যাফর বাগিরভ বলেছেন যে, ন' শ' বছর আগে আযরবাইজানীদের পূর্বপুরুষ তুর্কী "ওগ্‌হুযগণ" ছিলো রক্তপিপাসু বিদেশী দুশমন।[৬১] তুর্কী আযরবাইজানী বীরদেরকে বাদ দিয়ে অন্যান্যদেরকে বড় করে তুলে ধরা হচ্ছে। আযরবাইজানরা যে তুর্কী ছিলো, একথাটাও একেবারে বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে কিশোর ও যুবকগণ নিজস্ব জাতীয় চেতনা ও ঐতিহ্য থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষদের স্বাধীনতার সংগ্রাম অজ্ঞানতা, অন্ধতা ও সাম্রাজ্যবাদীপ্রসূত বলে আখ্যা পেয়েছে, আর জার-শাসন ও কমিউনিস্ট শাসনকে "সভ্যতার আলোক" বলে অভিহিত করা হয়েছে। আযরবাইজানীরা রাশিয়ার ইতিহাসকেও নিজেদের ইতিহাস মনে করতে বাধ্য হচ্ছে। তুর্কী নামগুলো পরিত্যাগ করতেও বাধ্য করা হয়েছে। "Soviet Encyclopedia"-র প্রথম সংস্করণে আযরবাইজানীদেরকে তুর্কী বলে স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর যে দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে, তাতে তাঁদেরকে কেবলমাত্র একটি "সমাজবাদী জাতি" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

তাজিকিস্তানের ইতিহাস এমনভাবে লেখা হচ্ছে, যাতে করে ইরানের ওপর সোভিয়েট আধিপত্য বিস্তৃত হতে পারে। তাজিকিস্তানের প্রধান পার্টি সেক্রেটারী বোহোয্‌দান জি. গফুরভ মধ্য-এশিয়ার গোটা ইরানী ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক

---

60. "বলশেভিক", জুন ১৯৪৬, ৮৫ পৃষ্ঠা।
61. "কমিউনিস্ট", বাকু, ৬ জুন, ১৯৩৮।

তাজিক, তাজিকিস্তান ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে একেবারে মিশিয়ে দিয়েছেন। "শাহনামা"র অমর কবি ফিরদৌসীকে তাজিক সোভিয়েট কবি বলে দাবী করা হয়েছে—হাফিজ ও শেখ সাদীও বাদ পড়েননি—কারণ এঁরা ইসলাম ও প্রতিক্রিয়াশীল ইরানী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন। সোভিয়েট লেখক সমিতির সেক্রেটারী জেনারেল আলেকজান্ডার ফাদেইয়েভ এতদূর পর্যন্ত দাবী করেছেন যে, তাজিকরাই ইরানীদেরকে সত্যিকার ইরানী সংস্কৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে। তাজিকিস্তানের তথাকথিত কমিউনিস্ট জাতীয় কবি আবুল কাসিম লাখুতি একথা বার বার প্রচার করেছেন। তাজিক কবি রুডাকির কবিতারও সোভিয়েট ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে।

এই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, ১৯৪১ সালে গফুরভ যে "তাজিক জাতির ইতিহাস" লেখেন, তাতে মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলনকে (১৮৯৮—১৯১৬) স্বাধীনতাকামী বলে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৫২ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে ইনি এসব আন্দোলনকে সামন্ততন্ত্রী জাতীয়তাবাদ বলে অভিহিত করেন। ১৯৫৩ সালে "কমিউনিস্ট" পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় তাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। ফিরদৌসী (৯৩৯—১০২০) ও ইব্নে সিনাকে (৯৮০—১০৩৭) তাজিকদের পূর্বপুরুষরূপে দেখানো হয়েছে। গফুরভ বলেন ঃ

"১৯১৬ সালে আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়াশীল জাতিগুলো—মুসলিম ধর্মীয় নেতা, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ও সামন্তবাদিগণ তাজিক-উজবেক ও মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য জাতিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিল। জার-শাসন ও বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদ নিষ্ঠুর ছিলো সন্দেহ নেই, তবু রাশিয়া কর্তৃক মধ্য-এশিয়া দখল করার মধ্যে তাজিক-উজবেক ও অন্যান্য জাতির ভবিষ্যতের দিক থেকে বিরাট প্রগতিশীল তাৎপর্য লুকিয়ে ছিলো।"

কাজাকিস্তানের অধিবাসীরা কেনেসারী ও নওরোজ বে—এসব সেনানীদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের বাহক। কাজাকদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এঁদের নাম অমর হয়ে থাকবে। ১৯৪৭ সালে Mrs. A. M. Pankratova এসব কাজাক নেতাদের আন্দোলনের তারিফ করেন। কিন্তু ফাদেইয়েভ এ বছরেই সপ্রমাণ করেন যে, কাজাকিস্তানের কোন জাতীয় নেতা ছিল না। রাশিয়ার বীর ও নেতৃবৃন্দই তাঁদের বীর ও নেতা বলে গণ্য হবে। কাজাক সোভিয়েট সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় কাজাক

খানদেরকে বড় করে তুলে ধরেছিলেন। এজন্য "Soviet Writer" পত্রিকায় তাঁর সমালোচনা করা হয় ও "Bolshevik" পত্রিকায় ফাদেইয়েভ লেখেন— কাজাকদেরকে রুশ সংস্কৃতি গ্রহণ করে সে পথেই এগুতে হবে।[৬২]

তুর্কমেনদের কাব্য-সাহিত্য "কোরকুত আতা" প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া কাব্য বলে নিন্দিত হয়েছে। তুর্কীস্তানের ভাষাগুলোর মধ্যে তুর্কমান ভাষাই তুর্কীর খুব বেশি কাছাকাছি। তাই তুরস্কের সঙ্গে তুর্কমেনদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্য জোর চেষ্টা চলছে। তুর্কমেনদের আধুনিক ভাষা থেকে প্রাচীন তুর্কমেন সাহিত্যকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। "হে তুর্কমেন" কবিতা লেখার জন্য কুরবান খাতভকে সমালোচনা করা হয়েছে। কারণ, রাশিয়া কর্তৃক দখলের ফলেই তুর্কমেনীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগুতে পেরেছে (Bolshevik, Feb, 12, 1952) । জার-শাসনকে এই একই অজুহাতে প্রগতিশীল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

জুমা ইলমুরাদভ তাঁর গীতি-কবিতা "আমার তুর্কীস্তানে" তুর্কীস্তানকে পৃথিবীর স্বর্গ ও সব চাইতে ভালো দেশ বলে অভিহিত করলেন। তখন "Turkmens Kaya Iskra" নামক পত্রিকায় বলা হলো—কেবলমাত্র সোভিয়েট তুর্কমেনিস্তান সম্পর্কেই একথা বলা চলে। গোটা তুর্কমেনী ইতিহাসকে গৌরবময় বলে চিত্রিত করা নাকি "বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ" ছাড়া আর কিছুই নয়। রাশিয়ার বাদশাহ্—নৃশংস আইভান, মহান পীটার ও জেনারেল সুভরভকেও খুব বড় করে দেখানো হয়েছে।[৬৩]

আর গোটা অ-রাশিয়ান গণতন্ত্রগুলোকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী বলে অভিহিত করা হয়েছে। ১৯৫১ সালের ১৬ আগস্ট "Pravda" ও Literaturnaya Gazeta"-য় আযরবাইজান, তুর্কীস্তান, উজবেকিস্তান ও অন্যান্য জাতিকে বুর্জোয়া বলে অভিহিত করা হয়। Gazeta-য় "the Uzbek Institute of Linguistics and Literature"কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলা হলো যে, তাঁরা যেন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, প্যান-তুর্কীবাদ ও প্যান-ইসলামবাদ প্রচার না করেন।[৬৪] এ সব দেশের কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারগণ তাঁদের জাতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন, কিন্তু জোর করে রাশিয়ান সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার ফলে

---

62. "বলশেভিক", জুলাই, ১৯৪৭, ২০–৩৫ পৃষ্ঠা।
63. "তুর্কমেনস্কায়া ইস্করা", ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১।
64. Literaturnaya Gazeta, ২৮ আগস্ট, ১৯৫১।

সৃষ্টিশীলতা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। দুষ্কৃতিকারীকে বীর হিসেবে ও বীরকে দুষ্কৃতিকারী বা দুশমনরূপে চিত্রিত করা সরলমন লোকের পক্ষে সত্যিই কঠিন ব্যাপার।

মধ্য-এশিয়ার মুসলমানদের ওপর এতটা চাপ দেয়ার ফলে বিরোধিতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। রুশীকরণের বিরুদ্ধেই এ সংগ্রাম সবচাইতে বেশি জোরদার হচ্ছে।

ককেশাসের মুসলমানদের সত্যিকার ইতিহাস লেখার কাজে মুসলমানদেরই হাত দেয়া উচিত। অচিরে মুসলিম দেশগুলোতে—বিশেষ করে করাচী, কায়রো ও মক্কা শহরে এ বিষয়ে গবেষণা কেন্দ্র খেলা দরকার। এর ফলে দুনিয়ার মুসলমানরা মধ্য-এশিয়ার সত্যিকার ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হতে পারবেন। মুসলিম জ্ঞানীগুণী ও উলামাদেরকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। মুঘল সম্রাট তাঁর "আত্মস্মৃতি"তে সত্যিই বলেছেন ঃ

> সমরখন্দ দুনিয়ার সেরা জায়গা,
> বোখারা ইসলামের মজ্জা বিশেষ।
> আসমানী গম্বুজের মেশাদ যদি না থাকত—
> তবে সারা দুনিয়া হয়ে যেতো
> অজু করবার একটা ছোট্ট ডোবা বৈ আর কি![৬৫]

---

65. Memoirs of Babar.

॥ এগারো ॥

মুহাজিরদের দৃষ্টিতে রাশিয়ার মুসলমান

১৯১৮ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত অগণিত মুসলিম সোভিয়েট রাশিয়া থেকে পলায়ন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও বহু কাজাক, উজবেক, তাজিক, তুর্কমান ও অন্যান্য মুসলমান পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব, এসব মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করেন। এসব মুহাজিরদের কাছ থেকেই রাশিয়ার মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারা যায়।

চীনের মুসলিম মুহাজির ঈসা ইউসুফ আল্‌পটেকিন আবেদন জানিয়েছেন ঃ

আপনারা আমাদের আযাদী-সংগ্রামে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করুন।

কমিউনিস্ট শাসনে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক খবর পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। লৌহ-যবনিকার অন্তরালে কী ঘটছে, জানবার জো-টি নেই। রাশিয়া ও চীনের মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা কি ও কিভাবে তাঁরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে থাকেন, এ সম্পর্কে আরও সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন; কারণ, কমিউনিজম সম্পর্কে মারাত্মক অজ্ঞতা অহেতুক সম্মোহন সৃষ্টি করে কমিউনিস্ট শ্লোগানের দিকে মুসলমানকে আকৃষ্ট করে।

রুশ-বিপ্লবের পর লেনিন মুসলমানদের জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষা করবার যে প্রতিশ্রুতি দেন, তাতে প্রথমদিকে মুসলমানরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। এ ওয়াদার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৯১৭ সালের ১৫ নভেম্বর লেনিন, "রুশ বিপ্লবের ঘোষণায়" বলেন ঃ "রাশিয়ার মুসলমানগণ ভলগার, তাতার, ক্রিমিয়া, কিরঘিজ ও তুর্কীস্তানের মারত্গণ, ট্রান্সককেশিয়ার তুর্কী ও তাতারগণ এবং যাঁদের মসজিদ ও প্রার্থনাগার ধ্বংস হয়েছে, যাঁদের ধর্ম ও আচার-ব্যবহার রুশদেশীয় জার ও

অত্যাচারীদের দ্বারা পদদলিত হয়েছে—এখন থেকে আপনাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদি স্বাধীন ও সুরক্ষিত বলে ঘোষিত হল। আপনাদের জাতীয় জীবন স্বাধীনভাবে গড়ে তুলুন; এ আপনাদের অধিকার। বিপ্লবের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এ অধিকার রক্ষা করা হবে। আমরা এখন আপনাদের কাছে যা চাই, তা হলো সহযোগিতা।"

শীগগীরই এ নীতি পাল্টে গেল। গোড়ার দিকে সোভিয়েট ঐতিহাসিক পোকরভস্কী "বৃহৎ সোভিয়েট বিশ্বকোষে" জার-সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করে মধ্য-এশিয়ায় মুসলিম স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশংসা করেন। ১৯৩৭ সালের ২৭ আগস্ট পোকরভস্কীর এ মতবাদ খণ্ডন করে বলা হয় যে, সামন্ততান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জার-সাম্রাজ্যবাদের চাইতেও নিকৃষ্ট বস্তু। (দশ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়ছে)। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, "কুবলান্দ বাতির", "আল-পামিশ", "কোরকুত আতা" এ সব সাহিত্যিক সম্পদকে জাতীয়তাবাদ প্রচার করার অপরাধে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। কাজাক কমিউনিস্ট কবি জাম্বুল (১৮৪৬—১৯৪৫) এসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধ্বংস কামনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্তালিন ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেন ও পশ্চিম তুর্কীস্তানের বন্ধ-করে-দেয়া মসজিদগুলো খুলে দেয়। কিন্তু সেগুলোর উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর ফলে মসজিদ চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বোখারার ঐতিহাসিক মীর-ই-আরব মাদ্রাসা খুলে দেয়া হয়। কিন্তু ধর্মের নাম করে মাদ্রাসাটিকে কমিউনিস্ট যুবকদের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা হয়। রাশিয়া ও চীনে মুসলিম নিপীড়নের ফলে বহু মুসলমান সেখান থেকে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন।

সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের ফলে কমিউনিস্ট চীনেও প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। ১৯৫১ সালে এ বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করে। কানসু প্রদেশে পিংলিয়াং-এর বিদ্রোহ ও সিনকিয়াং-এ কাজাকদের আন্দোলন এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিচি, লিচুন পাও, যিইং ও অন্যান্য জায়গায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। লালফৌজের সাহায্যে এ বিদ্রোহ দমন করা হয়। আন্দোলনকারীরা পাহাড়ে লুকিয়ে ইয়াং চি-য়ুন ও মা কুও-ইউয়ানের নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যান। অতঃপর এসব নেতাকে ধরে এনে সাত বছরের জেল দেয়া হয়। ১৯৫৩ সালের "শান্তি নীতির" ফলে আন্দোলন অনেকটা প্রশমিত হয়ে আসে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দেখা গেল যে, ৩,৪১৯ বার প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। আলতাই পর্বত ও জালিকুন হ্রদের তীরের পাঁচ লক্ষ কাজাকের মধ্যে আন্দোলন ঘনীভূত হয়ে উঠে। ১৯৪৯ সালে বুরহান

বিশ্বাসঘাতকতা করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেয়। তখন ওসিমান, চিয়ানিমুহান, যুতালি-এর হানহাটি, সুএরতা, হাপাসা ও ডাঃ ইয়াওলি কাজাকদের আন্দোলন জোরদার করে তোলেন।

১৯১৮ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত অগণিত মুসলিম সোভিয়েট রাশিয়া থেকে পলায়ন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও বহু কাজাক, উজবেক, তাজিক, তুর্কমান ও অন্যান্য মুসলমান পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব, এসব মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করেন। এসব মুহাজিরদের কাছ থেকেই রাশিয়ার মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারা যায়। এসব খবর চাপা দেয়ার জন্যই বোধহয় ১৯৫৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি চেকেন-ইংগুশ, বলকার ও কারাচাইদেরকে সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে অব্যাহতি দিয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয়। আংকারা রেডিওতে একজন মুসলিম মুহাজির বলেন (৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২) ঃ "আমরা আমাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্য পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছি।"

জাকি ওয়ালিদি তোগান ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর বই "বুগুন্‌কু তুর্কল তুর্কিলি" ("আজকের তুর্কীস্তান") খুব নামকরা। ইনি প্রথমে কমিউনিস্ট শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কিন্তু ১৯২০ সালে তুরস্কে হিজরত করতে বাধ্য হন। ইনি আনোয়ার পাশার সঙ্গে মুসলিম গণ-আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন।

অপর আর একজন মুহাজির হলেন মুস্তাফা চোকাই। ইনি ১৯১৭—১৮ সালে উজবেকিস্তানের কোকন্দে স্বাধীন মুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠা করেন ও জার্মানীর কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। তিনি "মিল্লিজ তুর্কীস্তান বিরলিগি" ("তুর্কীস্তান আন্দোলনের ঐক্য") প্রতিষ্ঠা করে উজবেক, কাজাক, তুর্কমান, কিরঘিজ ও তাজিকদেরকে সম্মিলিত করেন। চোকাইয়ের মৃত্যুর পর কাইয়ুম খাঁ ৫০ হাজার মুসলমানকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন। এঁদের ইমামদের ড্রেমডেন ও গটিঙ্গেনে শিক্ষা দেয়া হতো।

ডাঃ আরসলান বোহদানোউইজ একজন মুসলিম মুহাজির। ইনি পোল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন, এখন ফ্রান্সে অবস্থান করছেন। "জার্নাল অব জিওপলিটিক্স" নামক এক জার্মান পত্রিকায় তিনি লিখেছেন (মে, ১৯৫৫) ঃ সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ ও ইসলামী আদর্শের মধ্যে কোনও সমঝোতা হতে পারে না।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে অনেক মুসলমান আলবেনিয়া থেকে হিজরত করে গ্রীসে আশ্রয় নিয়েছেন। এর মধ্যে ৫ জনের নাম করা যেতে পারে।

দাস-ক্যাম্পে ভর্তি করে এঁদেরকে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হত, উৎপাদন বাড়াতে না পারলে এঁদের শাস্তি ভোগ করতে হত, সময়ে সময়ে গুপ্ত-চরবৃত্তি করতে বাধ্য করা হত। রেশাদ আগাজ (জুলাই ১৪, ১৯৫০), ইসকান্দার দিউমে (ডিসেম্বর ৯, ১৯৪৯), মুহাররম মোল্লা (১৯৫২, ফেব্রুয়ারি), যিল সিলেজমান (মে, ১৯৫১) ও সালাহউদ্দীন হাকসিমের (১৯৫২) নাম এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৬৬]

চীন থেকে মুহম্মদ আমীন বোগরা হিজরত করে পাকিস্তানে এসেছেন। তিনি পূর্ব-তুর্কীস্তানের প্রাক্তন গর্ভনর জেনারেল। ১৯৫৮ সালে করাচী থেকে তিনি "Muslims Under Russian and Chinese Domination" নামক পুস্তক প্রকাশ করেছেন। ঈসা ইউসুফ আলপটাকিন লাহোর অবস্থান করছেন। ইনিও পূর্ব-তুর্কীস্তানের অধিবাসী। ইনি ১৯৫১ সালে ১২ নং পার্ক লেন, লাহোর থেকে " Iron Curtain Over Eastern Turkistan" নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। করাচীর মাসিক "Voice of Islam"-এ ইনি ১৯৫৫ সালের মে সংখ্যায় "Communist Decimation Policy" নামে এক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এসব বই ও প্রবন্ধ থেকে চীনে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারা যায়। তুর্কী গণ-আন্দোলনের নেতা ডাঃ মাসুদ সাবরীসহ অগণিত মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে হংকং থেকে প্রকাশিত ইয়াং ইরফানের লেখা "Islam in China" একটি মূল্যবান বই। এ-থেকে জানা যায় যে, চীনে কাজাক আন্দোলনের নেতা ডাঃ ইয়াও লাও কমিউনিস্ট কবল থেকে রেহাই পেয়ে বর্তমানে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করছেন। মুসলমানদের এ প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে একথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মার্কসবাদের শত প্রচার সত্ত্বেও অগণিত মুসলমান নরনারীর হৃদয় থেকে ইসলামের শাশ্বত বাণী মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।[৬৭]

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কৃষক অভ্যুত্থান, তৈলখনিতে শ্রমিক বিদ্রোহ, জাতীয়তাবাদের প্রসার এবং পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তানে বহু

---

66. Roger N. Baldwin : A New Slavery : Forced Labour, the Communist Betroyal of Human Rights, Oceana, 1953, P. 102.
67. Gurian : Soviet Imperialism : its Origin and tactics, Notre Dam 1953, PP. 75—89.

মুসলমানের হিজরত মুসলিম জনগণের অদম্য উৎসাহ ও স্বাধীনতার জন্য তাঁদের বিরাট আত্মত্যাগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নিজস্ব ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতা নিয়ে জীবনধারণ করাই তাঁদের পক্ষে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই বিশ্বমুসলিমের গতিশীল বিবর্তনে শরীক হবার মত শক্তি বা সামর্থ্য তাঁদের আজ আর নেই। চীনের মুসলিম মুহাজির ঈসা ইউসুফ আলপটাকিন আবেদন জানিয়েছেন ঃ

"আমি সব বন্ধু-প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে, আমার ধর্মীয় ভাইদের কাছে ও দুনিয়ার সব স্বাধীনতা-প্রেমিক জাতির কাছে আবেদন জানাই — আপনারা আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করুন।"[৬৮]

68. Communist Decimation Policy by Isa Yusuf Alptakin, The Voice of Islam, May, 1950, P. 282 (Yusuf Alptakin-এর-Iron Curtain Over Eastern Turkistan পুস্তিকাও দ্রষ্টব্য)

!! বারো !!

শেষ কথা

> বিপ্লবের প্রথমদিকে ধর্মবিরোধী আন্দোলন পরিচালনার ফলে মুসলিম দেশগুলোতে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। তাই লেনিন ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে ট্রান্স-ককেশিয়ার বলশেভিকদের কাছে টেলিগ্রাম করে জানান যে, মুসলমানদের সম্পর্কে খুব সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে।
>
> ধর্মবিরোধী ও রুশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে ককেশাসের মুসলমানরা যে কেবল ১৯২০ সালেই আযাদী-আন্দোলন পরিচালিত করেন, তাই নয়, ১৯৪১ সালে এঁরা কমিউনিস্ট ফৌজ ও গুপ্তপুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের পর মুসলমানদেরকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার জন্য লেনিন এক ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সরলমনা মুসলিম জনসাধারণ আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, এত ঘটা করে যখন ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তখন তা সত্যিই আন্তরিক। উত্তর-ককেশাসের ৭০-জন শেখ ও ধর্মীয় নেতা ১৯২৩ সালে এক সম্মেলনে মিলিত হন ও লেনিনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে আরবি ভাষায় লিখিত এক বার্তা প্রেরণ করেন। এতে তাঁরা বলেন ঃ

"আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনাদের সাহায্যে ইসলামের হীন অবস্থা ঘুচে যাবে। তাই আমরা আপনাদের ফৌজকে সর্বোতভাবে সাহায্য করবো।" সামুরস্কির লেখা "দাগিস্তান" নামক বইতে এ লেখাটি পাওয়া যায়।[৬৯] স্তালিন দাগিস্তানীদেরকে শরিয়ত আইন রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু Soviet Political Dictionary, Soviet Encyclopedia ও ১৯৫০ সালের

69. Samursky : Dagestan, Moscow, 1925, P. 36.

ঘোষণায় শরিয়ত আইন নস্যাৎ করে দিবার নীতি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়।[৭০] কাজের অধিকার ও অন্যান্য অধিকারের কথা প্রচার করা হয় বটে, কিন্তু রাশিয়ায় সরকারি নীতির বিরুদ্ধে মতবাদ পোষণ করা যে মোটেই নিরাপদ নয়, তা স্বাধীন দুনিয়ার নাগরিকগণ সহজে বুঝতে না পারলেও সোভিয়েট-কবলিত জনগণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন।

মুসলিম এলাকাগুলো থেকে কেন্দ্রীয় রুশ-সরকার প্রতিবছর ৮ কোটি টন পেট্রোল, ২৯০ কোটি পাউন্ড খাদ্যশস্য ও ৫ কোটি টন গম লাভ করে থাকে। তা ছাড়া হাজার হাজার টন সোনা, রুপা, তামা, সীসা ও ইউরেনিয়াম সবটুকু এখান থেকেই পাওয়া যায়। হাজার হাজার টন শাক-সব্জি, ফল-মুল, রেশম ও গোটা তূল। (বছরে ৫ কোটি টন) এখান থেকেই পাওয়া যায়।

কিন্তু মুসলমানরা ভাল করে একখানা কাপড় পরতে পারেন না, এসব অঞ্চলে মৃত্যুর হারও খুব বেশি। ১৯৫৮ সালের সোভিয়েট বাজেটে দেখা যায় যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো শতকরা মাত্র ৭ ভাগ লাভ করেছে। সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের কবলে মুসলমানদের এই অবস্থা। "অনাবাদী জমি' পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজেদের দেশ কাজাকিস্তান, তাতারিয়া ও বাশকিরিয়াতে মুসলমানেরা আজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও এ ভীতি খুবই প্রকট হয়ে উঠেছে। বাইরের লোকদের দেখাবার জন্যেই "সরকার", উযীরসভা", "আইনসভা" রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কাজাকিস্তান সরকারের প্রধান হলেন একজন রাশিয়ান কমিউনিস্ট। ইনি মুসলমান নন। তাঁর সহকারী যুরিনও রাশিয়ান। করিম যানভ নামেমাত্র একজন কাজাক সেক্রেটারী আছেন। অন্যান্য সরকারি বিভাগেও এই একই অবস্থা। উজবেকিস্তানের "উযীরে আলা" মির্যা আহমেদভ রুশ কমিউনিস্ট বোব্‌কোভ ও রুডিনের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। কিরঘিজিয়ায় মুয়ের কুলাভের ওপর রাশিয়ান গ্রেক কোভ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাজিকিস্তানে সব ক্ষমতা আসলে আলেকজান্ডার মাথাইযেভের হাতে। যে সব মুসলিম নেতাকে মেরে ফেলা হয়েছে, তাঁদের কয়েকজনের নাম দেয়া হলো। এঁদেরকে কাজে লাগিয়ে পরিশেষে গুলী করে হত্যা করা হয়ঃ

ক্রিমিয়ার— তারখান ওয়ালী ব্র্যাগল্‌মভ

আযরবাইজানের— বাগিরভ

---

70. Soviet State and Law, 1950.

উজবেকিস্তানের— আকমাল ইকরামভ ও ফয়জুল্লাহ্ খোজাইয়েভ

তাতারিয়াতে— কিয়াম আব্রামভ ও মুখতারভ

বিপ্লবের প্রথমদিকে ধর্মবিরোধী আন্দোলন পরিচালনার ফলে মুসলিম দেশগুলোতে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। তাই লেনিন ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে ট্রান্স-ককেশিয়ার.বলশেভিকদের কাছে টেলিগ্রাম করে জানান যে, মুসলমানদের সম্বন্ধে খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। তাই ধর্মবিরোধী আন্দোলন শিথিল করে শরিয়ত আদালত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ১৯২৯ সালে বাধ্যতামূলক যৌথ-খামার প্রবর্তন করা হলে এমেলিন ইয়ারোস্লেভস্কী "সংগ্রামী নাস্তিক সমিতি"র কার্যভার নেন ও স্কুলে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ হয়। মস্কো জামে মসজিদের ইমাম আহমদিয়ান মুস্তাকিন একথা প্রচার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, কোরানের নীতি অনুসারে নাকি রমযান মাসে রোযা রাখা মুসলমানদের জন্য অবশ্যকর্তব্য নয়। ঈদের জামাতে খোতবায় একথা প্রচার করা হয়।[৭১] ধর্মবিরোধী শিল্পমেলা ও মিউজিয়াম খোলা হয়েছে। বিভিন্ন দলিল ও ছবির মাধ্যমে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে যে, ধর্ম প্রতিক্রিয়াশীলতারই নামান্তর। ১৯৫৫ সালের পয়লা অক্টোবরে বাকুতে অনুষ্ঠিত শিল্পমেলা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিকে সোভিয়েট গণতন্ত্র ধর্মপ্রচার বেআইনী ছিল না। ১৯১৮ সালের গঠনতন্ত্রে (জুলাই ১০, ১৩ ধারা) ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল; কিন্তু ১৯২৯ সালের এক ঘোষণায় (১৪ এপ্রিল) এ অধিকার কেড়ে নেয়া হলো। ১৯৩৬ সালের গঠনতন্ত্রে ধর্মপ্রচার নিষিদ্ধ হলো। গঠনতন্ত্রের ১২৪ ধারায় আছে ঃ

"ধর্মীয় উপাসনার স্বাধীনতা ও ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করবার স্বাধীনতা সব নাগরিকের আছে"— অর্থাৎ ধর্মপ্রচার করবার অধিকার নাগরিকদের নেই। কারণ, মার্কসবাদের মতে সমগ্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত প্রাচীন ধর্মগুলো বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক শোষণের যন্ত্র বৈ আর কিছু নয়।[৭২]

১৯৩৬ সালের অনেক পূর্বে, এমনকি ১৯২৯ সালের পূর্বেই সোভিয়েট নীতির আসল চেহারা ধরতে পারা মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিলো না। প্রথম দিকে হযরত উসমানের একখানি কোরান, মুসলমানদের ঐতিহাসিক মিনার, বাশকিরিয়ার ওরেনবার্গের মবাই মসজিদ ও কায়ানের সুমবেকী মসজিদ মুসলমানদেরকে

---

71. Moscow Radio, Tass, May 12, 1956.
72. Lenin-Works, Moscow, 1947, PP. 372—373.

ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাকু সম্মেলনে যিন-ভিয়েভ ইসলাম ও তুরস্কের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শুরু করেন। বাকু ম্যানিফেস্টোতে দুনিয়ার সব মুসলিমকে রসূলে আকরামের (স.) হেলালী সবুজ নিশান ছেড়ে কমিউনিজমের লাল পতাকাতলে সমবেত হতে আহ্বান জানানো হয়। মস্কো ও লেনিনগ্রাদকে নতুন মক্কা-মদীনা বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু রাশিয়ার মুসলমানগণ ও বহির্বিশ্বের মুসলমান এতে কিছুতেই রাজী হতে পারেননি। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধের সময় ধর্মবিরোধী আন্দোলন শিথিল করা হয়েছিল।

রাশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, রুশ লেখকগণ রাশিয়ার মুসলমানদের কথা বড় একটা তোলেন না। রাশিয়ার ষাট হাজার মসজিদের মধ্যে মাত্র ৫০০টি বিদেশীদের দেখাবার জন্য রেখে দেয়া হয়েছে। তাসকেন্ত, উফা; বাকু ও বুইনাকস্কে যে চারটি মুসলিম ধর্মীয় বোর্ড আছে, তাদের স্বাধীনতা নিতান্তই সীমায়িত। বাসমাকী আন্দোলন ধর্মান্ধ লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, একথা প্রচার করে রাশিয়া আসল কথাটি চাপা দিতে চেয়েছে—তা হলো সমগ্র মুসলিম জনসাধারণ স্বদেশ-প্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই এ আন্দোলন পরিচালিত করেন ও ইসলামী ঐতিহ্য তাঁদের মধ্যে খুব সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলো। ধর্মীয় নেতারাও অবশ্য এ আন্দোলনে যোগদান করেন, কিন্তু কেবল তাঁরাই এ আন্দোলনে শরীক হননি। তাছাড়া ১৫/১৬ বছর এ আন্দোলন চালাবার পর মুসলমানরা নিজেরা এগুলো ভেঙে দেননি। সোভিয়েট ফৌজ মারফত জোর-জবরদস্তী করেই এ আন্দোলন পিষে মেরেছিলো।

স্বাধীনতা সম্পর্কে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছিলো, তা যে মোটেই রক্ষিত হয়নি, ১৯২৪ সালে কারাচাই-বলকার ও চেকেন-ইংগুশদের স্বাধীনতা হরণ করে সাইবেরিয়ায় 'চালান দেয়া নীতি' থেকেই এটা বোঝা যায়। অগণিত শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধকে কি করে বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যা দেয়া যায়, তা আমাদের কল্পনাতীত! লুসিয়ান টেয়ার "সাংহাই কাহিনী"তে (Shanghai Episode by Lucian Taire, Rainbow Press, Hongkong) বলেছেন যে, কোন মানুষকে হত্যা করা হলে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বুলেটের দাম আদায় না হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।[৭৩] নতুন বিচারব্যবস্থায় নিজেকে রক্ষা করবার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত নেই। জোর করে বা প্রলোভন দেখিয়ে ক্ষমতা হস্তগত

---

73. Lucian Taire : Shanghai Episode, Rainbow Press, Hongkong.

করবার পর সাধারণ নাগরিকদের মানবিক সত্তা কমিউনিস্টগণ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দেয়। (পৃষ্ঠা ৫৪, ১১১)

চীনে মুসলমানদের অবস্থা মোটেই লোভনীয় নয়। তুর্কীস্তানের গণ-আন্দোলনের নেতা ডাঃ মামুদ সাব্‌রীকে (১৯৫২ সালের মার্চ মাসে) গ্রেফতার করে পরে (৫ এপ্রিল, ১৯৫২) হত্যা করা হয়। ইনি পূর্ব-তুর্কীস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। কমিউনিস্ট গুণ্ডাগণ বিখ্যাত জাতীয় কবি ও লেখক আহমদ থিয়াইকে সদর রাস্তায় নির্মমভাবে হত্যা করে। অথচ এ গুণ্ডাদেরকেই বীর নামে আখ্যায়িত করা হয়। ১০ হাজার লোকের সামনে ইয়ারখন্দের গভর্নর তুরাব বেগ, সিনকিয়াং সরকারের পরামর্শদাতা আমীর হাসান ও পুলিশ সুপার সৈয়দ উল্লাহকে হত্যা করা হয়। তুরাব বেগের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, তিনি ঈসা ইউসুফ ও মুহম্মদ আমীন বেগকে পলায়ন করতে সাহায্য করেছেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদেরকে ভূমি, খনি ও খালখননে জোর করে কাজ করানো হয়। রাস্তা ও সরকারি পায়খানা পরিষ্কার করতেও হয়েছে। হালিম বেগ ও হাবীবুল্লাহ্ এফেন্দীকে দিয়ে জোর করে গাড়োয়ান ও বাবুর্চির কাজ করানো হয়েছে। সোভিয়েট প্রচারে আশ্বস্ত হয়ে অনেক তুর্কীস্তানী আবার তুর্কীস্তানে ফিরে যেতে মনস্থ করেন। ইশাহীদুল্লাহ্ সীমান্তে পৌঁছামাত্র তাঁদেরকে খোটান জিলার রুশ সামরিক শহর গুমাতে স্থানান্তরিত করা হয় (মে ১৯৫০-জুলাই ১৯৫১)। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কমপক্ষে ১৫ হাজার তুর্কীকে বন্দী করা হয়েছে ও ৫ হাজার লোককে অমানুষিকভাবে হত্যা করা হয়েছে। অনেক মুসলিম হিজরত করে পাকিস্তানে ও অন্যান্য মুসলিম দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ তাদের কাছ থেকে জোর করে শুল্ক আদায় করা হতো ও তাঁদের নিজস্ব সম্পদ বিক্রয় করতে বাধ্য করা হতো। অপমান ও নিপীড়নের মাধ্যমে তথাকথিত "অপরাধী'দের "স্বীকারোক্তি" (Confession) গ্রহণ করা হয়। স্বীকার করতে না চাইলে মাদুরে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ধর্মীয় নেতা ও মহিলাদেরকেও রেহাই দেয়া হয়নি। প্রতি দশজন মুসলিমের ওপর দৃষ্টি রাখবার জন্য একজন করে গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়েছে। বেচাকেনা, মেহমানদারী, সাধারণ কার্যকলাপ, সবকিছুর ওপরই ঝুলছে কমিউনিস্টদের সন্দেহ দৃষ্টি। এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে হলে, আগে পুলিশের অনুমতি নিতে হয়। কখন কার সঙ্গে দেখা হবে, কোথায় কখন পৌঁছানো হবে—তাও জানিয়ে দিতে হয়। অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসা তুলে দেয়া হয়েছে। নামায পড়া ও ধর্মীয়

শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে সাধারণ মানুষকে বিরত রাখার জন্য প্রত্যক্ষভাবে নানারকম ফন্দিফিকির বার করা হচ্ছে।[৭৪]

অধ্যাপক গ্যাগারিন ১৯৫৪ সালের আগস্ট মাসে মস্কোতে প্রদত্ত এক বক্তৃতাকালে অভিযোগ করেন যে, আল্লাই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন, এ-বিশ্বাস মুসলমানরা পোষণ করেন। সত্যিকারভাবে ইসলামী জীবনদর্শন অনুসরণ করলে মুসলমানদের অদৃষ্টবাদী হবার কোনও আশংকা নেই। কারণ, তাঁরা আল্লাহর চূড়ান্ত ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু সেই কারণে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ইসলামী আদর্শের ঘোর পরিপন্থী। জীবনকে সুন্দর ও মহীয়ান করা ইসলামের কার্যধারার মধ্যেই পড়ে।[৭৫]

"প্রাভদা" পত্রিকায় একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, ধর্মবিরোধী আন্দোলন খুব সফলতা লাভ করতে পারেনি।[৭৬] ধর্মবিরোধী আন্দোলন ও রুশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে ককেশাসের মুসলমানরা যে কেবল ১৯২০ সালেই আযাদী-আন্দোলন পরিচালিত করেছিলেন তাই নয়, ১৯৪১ সালেও এঁরা কমিউনিস্ট ফৌজ ও গুপ্ত পুলিশের (NKVD) বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ১৯৩৭ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, বয়স্কদের তিনভাগের একভাগ লোক ধর্মবিশ্বাসী ও পল্লী-অঞ্চলের তিনভাগের দু'ভাগ লোক ধর্মবিশ্বাসী। আজ পর্যন্ত শত চেষ্টা সত্ত্বেও ধর্মীয় আবেদন মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি—বরং অনেক ক্ষেত্রে তা বেড়েই চলেছে।

পরিশেষে, পূর্ব-তুর্কীস্তানের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর জেনারেল ও "জাতীয় আযাদ পার্টির" নেতা মুহম্মদ আমীন বোগ্‌রা গত বছর মার্চ মাসে (৩০ মার্চ, ১৯৫৮) করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি সমিতির আয়োজিত এক সভায় প্রদত্ত ভাষণে যে আবেদন জানান, তা জানিয়ে দিয়েই আমাদের বক্তব্য শেষ করি ঃ

"আমরা একান্তভাবে কামনা করি যে, স্বাধীন মুসলমান, বিশেষ করে পাকিস্তানী মুসলমান ও ধর্ম, সংস্কৃতি ও রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ মহান প্রতিবেশী ভাইগণ আমাদেরকে সহানুভূতি ও সাহায্য দেবেন এবং অপরিসীম উৎসাহ প্রদান করবেন, যাতে করে আমরা অসীম শক্তি লাভ করে দৃঢ়পদক্ষেপে আযাদীর সংগ্রামে এগিয়ে যেতে পারি।"

---

74. The Voice of Islam, 1955, Karachi, PP. 280—282.
75. ইসলাম ও অদৃষ্টবাদ ঃ পরিশিষ্ট দেখুন।
76. "প্রাভদা", ২৪ জুলাই, ১৯৫৪।

পরিশিষ্ট

সোভিয়েট শাসনতন্ত্র ও ধর্ম

নাগরিকদেরকে বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে চার্চকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়েছে এবং স্কুলও চার্চ থেকে পৃথক হয়েছে। ধর্মীয় উপাসনার স্বাধীনতা ও ধর্ম-বিরোধী প্রচারের স্বাধীনতা সব নাগরিকের জন্যই স্বীকৃত।

Article 124—Constitution of the USSR. Moscow, 1947. P. 95, বাংলা তরজমা।

সোভিয়েট ফৌজদারী আইন ও ধর্ম

৫৮ ধারা ঃ যারা ধর্মীয় প্রার্থনায় যোগদান করে, তারা প্রতিবিপ্লবী বলে গণ্য হবে।

১২২ ধারা ঃ সরকারি বা বেসরকারি স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু বা নাবালকদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিলে অথবা সে সম্পর্কিত নির্দেশ অমান্য করলে একবছরের জন্য বাধ্যতামূলক সংশোধনীয় কাজে (Corrective forced labour) নিযুক্ত করে শাস্তি দেয়া হবে।

—(The Soviet Criminal code বাংলা তরজমা)

স্কুলে নাবালক বা অল্পবয়সীদের কোনপ্রকার ধর্মীয় শিক্ষা দান করা সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত বিবেকের স্বাধীনতার বরখেলাপ বলে গণ্য হবে।

—Trainin. Menshagin and Vyshinsky : Commentaries on the Criminal Code of the RSFSR, Moscow, 1946, PP. 167—168 বাংলা তরজমা

ধর্ম সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্টদের ঘোষণা

যাঁরা ধর্মে বা ভাববাদে বিশ্বাস করেন, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁদের সাথে আমরা কমিউনিস্টরা সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে কাজ করতে পারি। কিন্তু দার্শনিক ভাববাদ বা ধর্মের সাথে আমাদের কোন কারবার থাকতে পারে না।

—মাও সে তুঙ ঃ নতুন গণতন্ত্র—অনুবাদ, সরোজকুমার দত্ত, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, ৫১ পৃষ্ঠা।

আমরা কমিউনিস্টরা জড়বাদী। তাই আমরা কোনও ধর্ম অনুসরণ করি না।

—লি উই হান—চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সংযুক্ত ফ্রন্ট বিভাগের প্রধান পরিচালক,—অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে বক্তৃতা, ১৯৫৬।

যখন আমরা স্কুলে বিজ্ঞান ও সাধারণজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে থাকি, তখন ধর্মকে আমরা কুসংস্কার হিসেবে চিত্রিত করবার সুযোগ ছাড়ি না।

—ধর্মসংক্রান্ত ব্যুরো-প্রধান হো চেন জিয়াং-এর ঘোষণা।

আপনারা সেই মুহাম্মদকে জানেন, যিনি একহাতে তলোয়ার ও অপর হাতে ধর্মীয় কেতাব রাখতেন। কিন্তু আপনারা সেই মুহম্মদকে চেনেন না, যিনি এক হাতে বন্দুক রেখে, অন্য হাত দিয়ে অর্থ গ্রহণ করতেন। হ্যাঁ, তাঁর আরও একটি হাত ছিল, যে হাতে তিনি নীতিবাক্য ধরে রাখতেন। অর্থাৎ তাঁর ছিল তিনটা হাত (চোরের তিনটি হাত থাকে)।

লু হং চি—কোয়াং মিং জি পাও—১০ জানুয়ারি, ১৯৫১ (পিকিং)

কমিউনিস্ট চীনে ধর্ম ও মানব অধিকার—বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নেই

৮৮ ধারা ঃ গণচীনের নাগরিকগণ ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করে।

৩১ ধারা ঃ জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি (Standing Committee), রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল, সর্বোচ্চ গণআদালত ও সর্বোচ্চ গণ-নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থার (Procuratorate) কার্যাবলী তদারক করে।

৮০ ধারা ঃ সর্বোচ্চ গণআদালত জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রতি দায়িত্বশীল থাকে ও এ কংগ্রেসের নিকট রিপোর্ট প্রদান করে। আর যখন জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন বসে না, তখন স্থায়ী কমিটির কাছে দায়িত্বশীল থাকে ও এর নিকট রিপোর্ট প্রদান করে। আঞ্চলিক গণআদালত আঞ্চলিক গণকংগ্রেসের কাছে দায়ী থাকে ও রিপোর্ট প্রদান করে।

৮১ ধারা ঃ গণচীনের সর্বোচ্চ গণনিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা (Procuratorate) রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের সমস্ত বিভাগকেই নিয়ন্ত্রিত করে।

—গণচীনের শাসনতন্ত্র, পিকিং, ১৯৫৪

শ্রমিক ক্যাম্পে জোর করে কাজ করানো হয়

প্রতিবিপ্লবীদেরকে বাধ্যতামূলক কাজে (Froced labour) নিযুক্ত করা প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া অপরাধীদেরকে সম্পূর্ণ সংশোধিত করে নতুন মানুষে পরিণত করবার জন্যও এ এক মৌলিক নীতি। এ ধরনের সংশোধননীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক সংশোধন ও শ্রমিক সংস্কার এবং শান্তি ও শিক্ষাব্যবস্থার মিলন সাধিত হয়।

—লো জুই চিং ঃ প্রতিবিপ্লবীদেরকে দমন করবার মহান আন্দোলন—"জেন মিন্ জি পাও।"

যাদের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত কিন্তু যাদের কোন "রক্ত-ঋণ" নেই অথবা যারা জাতীয় স্বার্থহানির ব্যাপারে খুব বেশি অন্যায় করেনি, তাদেরকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তবে দু'বছরের জন্য এদের মৃত্যুদণ্ড পিছিয়ে দেয়া হবে। এ দু'বছর তাদেরকে শিক্ষানবীশ হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমক্যাম্পে কাজ করতে হবে।

—জাতীয় রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে চু-এন-লাই-এর বক্তৃতা।

পূর্ব-তুর্কীস্তানের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর-জেনারেল ও জাতীয় আযাদ পার্টির নেতা মুহম্মদ আমীন বোগরার আবেদন

স্বাধীন দুনিয়ার মুসলমানগণ ও অন্যান্য স্বাধীন জাতি একথা খুব অল্পই জানেন যে, কিভাবে বিরাটসংখ্যক তুর্কী মুসলমান রাশিয়া ও চীনের কবলে গিয়ে পড়েছেন। দাসত্বের কঠোর শৃংখলে তাঁরা যেভাবে আবদ্ধ হয়েছেন, তার নজীর মানবজাতির ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পূর্ব-তুর্কীস্তান, পশ্চিম-তুর্কীস্তান, ইদিল-ইউরাল, ট্রান্স-ককেশিয়া, আযরবাইজান ও ক্রিমিয়াতে এই তুর্কীদের বাসস্থান। এসব দেশ পরস্পর প্রতিবেশী রাষ্ট্র। এর আয়তন ৭০,৫৮,৮৪০ বর্গ কিলোমিটার ও মোট লোকসংখ্যা ৫,৪৮, ১৫,০০০। তাছাড়া পাঁচ লক্ষ তুর্কী রয়েছেন সাইবেরিয়ায়। ১৫৮০ সালে সাইবেরিয়া রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ রাশিয়া ও চীনের অধীনে যে সব মুসলমান রয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা ছয় কোটির চাইতেও বেশি। নিম্নলিখিত কারণে এই সব বিস্মৃত জাতিদের সম্পর্কে বহির্বিশ্বের লোকেরা খুব বেশি খবর রাখেন না ঃ

(ক) গত কয়েক শতাব্দী ধরে প্রাচ্যদেশীয় জাতিগুলোর মতই অবনতি ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ এদেরকে জর্জরিত করেছে। ফলে বহির্বিশ্বের সাথে এদের ঐতিহাসিক যোগসূত্র নিতান্ত শিথিল হয়ে গেছে।

(খ) ক্রমাবনতি ও আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ফলে এদের পতন ঘনিয়ে এসেছে। তুর্কীস্তানে আর সামানীয়, গজনভী, কারাখানী, সালজুক, খাওরাজমী, আলতিন উরদু, তৈমুরী ও বাবরের মত কোন রাষ্ট্রনেতার আবির্ভাব হয়নি। বুখারী, তিরমিযী, সমরকন্দী, ফারাবী, ইবনে সিনা, আবু মা'শার, জিমাখশারী, বেরুনী সেক্কাকীর মত পৃথিবী-খ্যাত জ্ঞানীগুণীদেরও আর জন্ম হয়নি।

(গ) উত্তর ও পশ্চিম প্রান্ত হতে রুশ আক্রমণ ও পূর্বপ্রান্ত থেকে চীনা আক্রমণ তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে স্তম্ভিত ও হতচকিত করে দিয়েছে।

(ঘ) কমিউনিস্ট হত্যাযজ্ঞ ও বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা।

(ঙ) প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বহির্বিশ্বকে অবহিত করার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীরা (আর বর্তমানে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদীরা) বাধা দিয়ে এসেছে।

(চ) বিদেশী পর্যটকেরা যখন সরকারিভাবে এসব দেশ সফর করেন, তখন তাঁরা কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখবার সুযোগ পান। ফলে তাঁরা এসব দেশের চেহারা দেখবার সুযোগ পান না ও ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ফিরে যান। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পর্যটকরা সাধারণ লোকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ও অবাধ মেলামেশার সুযোগ পান না।

(ছ) রাশিয়া ও চীন থেকে যে-সব প্রতিনিধি মুসলিম দেশগুলোতে সফর করেন, তাঁরা হয় কমিউনিস্ট গুপ্তচর অথবা কমিউনিস্ট গুপ্তচরদের কড়া-পাহারায় কার্যরত নিরীহ মানুষ বৈ আর কিছু নন।

দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ এসব মুসলমান জাতি তাঁদের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন। মুহাজির ভাইদের কর্তব্য হলো তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে পৃথিবীর লোককে অবহিত করা।

রাশিয়া ও চীনের অধীনস্থ তুর্কী মুসলমানগণ স্বল্প সামর্থ্য নিয়ে সম্পূর্ণ উৎখাত ও নিঃশেষিত অবস্থা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে তাঁরা কোনও জাতি বা সরকারের সমর্থন লাভ করতে পারেননি। তাই আজ তাঁরা স্বাধীন মুসলিম ভাইদের নিকট আবেদন করছেন ঃ

(ক) স্বাধীন মুসলমানরা যেন নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করেন ঃ

(১) দাসত্বের কবলে নিপতিত ভাইদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন।

(২) প্রচার ও অন্যান্য উপায়ে দাসত্ব-শৃংখলিত মুসলমানদের ন্যায্য দাবীর প্রতি সমর্থন জানান।

(খ) জাতিসংঘ (UNO) সংবাদপত্র, কূটনৈতিক সম্পর্ক, জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদি ও বিভিন্ন সাধারণ প্রচার দফতর মারফত এসব দাসত্ব-শৃংখলিত মুসলমানদের নিম্নলিখিত দাবী-দাওয়া পরিপূরণের জন্য তাঁদের নিজ নিজ সরকারের সমর্থন লাভ করা ঃ

(১) তুর্কী মুসলিমকে তাদের নিজস্ব আবাসভূমি থেকে চালান দেবার নীতি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

(২) যাদেরকে চালান দেয়া হয়েছে, তাদেরকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনতে হবে।

(৩) তুর্কীস্তানে রুশ ও চীনা উপনিবেশ স্থাপনকারীদের আগমন বন্ধ করতে হবে।

(৪) রাশিয়া ও চীনে জাতীয় সম্পদ অপসারণ বন্ধ করতে হবে।

(৫) দাসত্বে আবদ্ধ মুসলিমদের দেশ থেকে ফৌজ অপসারিত করতে হবে।

(৬) রাশিয়া ও চীনকে এসব নিপীড়িত মুসলিমদের জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করতে বাধ্য করতে হবে।

—Muslims under Russian and Chinese Domination by Muhammad Emin Bugra, Karachi, April 4, 1958, Introduction and Part IV. Appeal to Free Muslims, PP 31. 32.

বিশ্ব-মুসলিমের প্রতি অস্ট্রিয়ার রুশ মুহাজিরদের আবেদন

ভিয়েনার "জমিয়ত আল্ ইসলামের" একটি আবেদনপত্র সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হয়েছে। আবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রতি বছর কমিউনিস্ট দেশগুলো হতে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে অস্ট্রিয়ায় আগমন করে। এই বাস্তুহারা মুহাজিরদের মধ্যে রয়েছে বহু মুসলমান নর-নারী-শিশু। ইহুদী ও খ্রিস্টান মুহাজিরদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে রয়েছে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু নিরাশ্রয় ও সহায়সম্বলহীন মুসলমান মুহাজিরদের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান কিংবা শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য কোন মুসলিম প্রতিষ্ঠান নেই। এই জন্য অস্ট্রিয়ার

মুসলমানরা গড়ে তুলেছেন "জমিয়ত আল্ ইসলাম"। কিন্তু প্রয়োজনের মোকাবিলায় তাঁদের অর্থকরী সামর্থ্য খুবই অপ্রচুর। তাই তাঁরা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সাহায্য ও সহানুভূতির প্রত্যাশায় এক আবেদন জানিয়েছেন। আবেদনের তরজমা নীচে দেয়া হলো ঃ

প্রিয় ভাই মুসলমান,

অষ্ট্রিয়া হতে লিখিত এই পত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা। আমরা এক গুরুতর সমস্যার মোকাবিলা করছি। ইয়োরোপে বহুসংখ্যক মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে অন্যান্য ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হতেই খ্রিস্টান ও ইহুদীরা সীমান্তে তাদের প্রতিনিধিদের মোতায়েন রেখেছেন। সীমান্তের ওপার থেকে আগত স্ব স্ব ধর্মাবলম্বীদের এরা অভ্যর্থনা করে থাকে। কাপড়-চোপড়, ঔষধপত্র এবং ধর্মীয় আইনগত বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে এরা মুহাজিরদের সাহায্য করে, খ্রিস্টান ও ইহুদী সংস্থাগুলো মুহাজিরদের চাকরী যুগিয়ে দেয় এবং বাস্তুহারাদের প্রাপ্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার মুহাজির শিবিরে আজ ১২ বছর পর্যন্তও বহু মুসলিম পরিবার পড়ে রয়েছে।

"জমিয়ত আল্ ইসলাম" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মুসলিম মুহাজিররা যা-কিছু সাহায্য পেত, তা খ্রিস্টান কিংবা ইহুদী সংস্থাসমূহের মাধ্যমেই, এই অবস্থা ব্যাখ্যাতীত। এর জন্য খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বীরা নয়, মুসলমানদেরই লজ্জিত ও অপরাধী হওয়া উচিত।

ফলে অষ্ট্রিয়ার মুসলমানরা সাতজন বয়স্ক মুসলমান এবং ৫৫ জন মুসলিম ছেলেমেয়েকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হতে দেখেছে। ৪৫ জন মুসলিম ছেলেমেয়ে ক্যাথলিক হয়েছে, দশজন হয়েছে প্রোটেস্ট্যান্ট।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই অস্টিয়া বাস্তুহারাদের আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহ হতে ১৯৪৫—৪৬ সালে হাজার হাজার মুহাজির এখানে পালিয়ে আসে। মুহাজিরদের মধ্যে আছে কাজাক, কিরঘিজ, উজবেক, ককেশীয় তাতার, আলবেনীয়, রুমানীয়, সিতাক, বুলগেরীয়, পোমাকেন, আযরবাইজানী, উত্তর-আফ্রিকাবাসী বা আরও শত শত মুসলিম নর-নারী, শিশু, বিপর্যস্ত পরিবার আর এতীম। আজ মহাযুদ্ধের ১৩ বছর পরও মুহাজিরদের আগমন অব্যাহত রয়েছে।

অমুসলমানদের বিশ্বব্যাপী সাহায্য-সংস্থা রয়েছে। এই সংস্থাগুলো তাদের ধর্মাবলম্বী অসহায় ও এতীমদের সাহায্যের নিমিত্ত অস্ট্রিয়া এবং অন্যান্য সীমান্ত দেশে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। সমস্যার মোকাবিলায় জমিয়ত আল্ ইসলামের সামর্থ্য অত্যন্ত অপ্রচুর; তাই আজ তারা মুসলিম দুনিয়ার প্রতি তাকিয়ে রয়েছে।

জমিয়ত আল্ ইসলাম কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে খুবই বিলম্বে। বহু পূর্বে মুসলিম মুহাজিরদের দায়িত্বভার মুসলিম প্রতিনিধিদের গ্রহণ করা উচিত ছিল; কিন্তু আমাদের যেমন মানুষ ছিল না, তেমনি ঐক্য বা উপায়ও ছিল না। আজ আমাদের সামনে ভয়ানক সমস্যা। অস্ট্রিয়াস্থ মুলিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি আশুমনোযোগ দিতে হবে। সংগঠিত মুসলমানরাই মাত্র এই দায়িত্বভার নিতে পারে।

অস্ট্রীয় সরকারের মনোভাব হচ্ছে— ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যয় সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহকেই বহন করতে হবে, অন্য ধর্মমতের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরস্থ মুসলিম ছেলেমেয়েদের প্রায়ই অনুরোধ করা হয়। ফলে ধর্মান্তর অব্যাহত গতিতে চলেছে।

জমিয়ত আল্ ইসলামের হস্তক্ষেপ এবং মুহাজির শিবিরসমূহে জমিয়ত সদস্যদের আবির্ভাবের ফলে বর্তমানে এর গতিরোধ হয়েছে। কিন্তু মুসলিম মুহাজিরদের নিয়মিতভাবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করতে হবে এবং নামাযের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের অবহিত করতে হবে যে, মুসলিম দুনিয়া তাদের ভুলেনি।

ধর্মত্যাগ বন্ধ করতে আমাদের সাহায্য করুন। নৈতিকতা পুনরুদ্ধারে আমাদের সাহায্য করুন। সন্দিগ্ধমনা মুসলিম ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য করুন।

আমরা ভিয়েনায় একটি মুসলিম স্কুল স্থাপনের জন্যে পরিকল্পনা করছি। এ ধরনের স্কুল ইয়োরোপে আর নেই। স্কুলটি হবে আবাসিক। অবশ্য বাইরের ছাত্রদেরও এখানে ভর্তি করা হবে। মিশনারী স্কুলের হাত থেকে মুসলিম এতীমদের রক্ষা করতে হবে। স্কুলটিকে অবশ্যই উচ্চমানের হতে হবে। দুনিয়ার সকল অংশ থেকে শিক্ষকমণ্ডলী সংগৃহীত হবেন। উপযুক্ত ইমামের তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হবে। জার্মানী, ইংরেজি ও আরবি হবে প্রয়োজনীয় ভাষা। পরিকল্পনা মোতাবেক স্কুলটিতে শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হবে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে খোদা চাহে তো এর শিক্ষার মান বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত উন্নীত করা হবে।

কিন্তু এখুনি আমাদের শুরু করতে হবে, দেরী করলে চলবে না। জমিয়ত আল্ ইসলাম অস্ট্রীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। আমাদের প্রতি অস্ট্রীয় সরকারের সহযোগিতা এবং শুভেচ্ছা রয়েছে। এখন সারা দুনিয়ার মুসলিম ভাইদের

সমর্থন আমাদের পেতে হবে। আমাদের আশু প্রয়োজন হচ্ছে ৪৩,৪৬২ মার্কিন ডলার। আমাদের সাহায্য করুন।

কমিউনিস্ট কবলে মুসলমান

দেশ	আয়তন বর্গমাইল	মোট জনসংখ্যা	মুসলিম	শতকরা হিসাব	রাজনৈতিক মর্যাদা
আলবানিয়া	১০,৬২৯	১,২১০,০০০	৮৩২,০০০	৬৯%	রুশ তাঁবেদার কমিউনিস্ট রাষ্ট্র
আযরবাইজান (সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র)	৩৩,১৯৬	৪২,৮৩,০০০	৩৩,৪৫,০০০	৭৮%	সোভিয়েট রাশিয়ার গণতন্ত্র
কাজাকিস্তান (সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র)	১,০৫৯,৩৭৭	৬,৪৫৮,০০০	৪৩৫,০০০	৬৮%	সোভিয়েট রাশিয়ার গণতন্ত্র
কিরঘিজিয়া (সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র)	৭৫,৯৪২	১,৮০৫,০০০	১,৬১৩,০০০	৯২%	"
তাজিকিস্তান	৫৫,৫৪৫	২,২৫০,০০০	২,২০৫,০০০	৯৮%	"
তুর্কমেনিস্তান	১,৭১,২৪৯	১৩,১৮,০০০	১১,৯০,০০০	৯০%	(সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র)
উজবেকিস্তান	১৪৬,০২৪	৩,৬৩৩,১০০	৩৩,৮০,০০০	৮৮%	"
আর্মেনিয়া	১১,৯০০	১৩,৪৭,০০০	১,৬৪,০০০	১২%	"
ইউক্রেন	২,১৫,৪৭৩	৪২,২৭৩,৯০০	৫,০৭৫,০০০	১২%	"
সিনকিয়াং	৭,০৫,৯৫২	৫,৫৩৬,০০০	৪,৫৩,৯০০	৮২%	গণচীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল
চীন (সিনকিয়াং বাদ দিয়ে)	৪,১০৫,২০২	৫৫,৪০,০০,০০০	৬,০১,১০,০০০	১১%	কমিউনিস্ট রুশতাঁবেদার
বুলগেরিয়া	৪২,৭৯৬	৭,০২২,২০৬	৭,০২,২০০	১০%	রুশ তাঁবেদার কমিউনিস্ট রাষ্ট্র
বাইলেরুশিয়া সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র	৮১,০৯০	৫,২৬,৪৫,৪৭৯	৬,৩৮,০০০	৬%	সোভিয়েট রাশিয়ার গণতন্ত্র
মোলডেভিয়া (সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র)	১৩,২০০	২৪,০০,০০০	৭৫,০০০	৩%	সোভিয়েট রাশিয়ার গণতন্ত্র
হাঙ্গেরী	৩৫,৯০২	৯২,০১,১৮৫	৬০,০০০		সোভিয়েট তাঁবেদার রাষ্ট্র
পোল্যান্ড	১,২১,১৩১	২৪,৯৭,৬৯২	৮০০,০০০		

শ্রমিকের স্বৈরাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যথেচ্ছ ব্যবহার করা যেতে পারে, আর তাই হবে নৈতিক। আমাদের মতে নীতিবোধ শ্রেণীসংঘর্ষের অধীন।... মানুষের মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়া হবে...। —Lenin, On Religion. Bombay, 1944.

দ্রুতগতিতে জনৈক সৈনিক জার দ্বিতীয় নিকোলাসের বক্ষ ভেদ করে গুলী ছুঁড়লো। তিনি মাটিতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকগণ মহিলাদের উপর গুলী মারতে লাগলো। সৈনিকেরা এত অধিক উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, তাদের গুলী এদিক-ওদিক গিয়ে লাগতে থাকে। ফলে তারা বার বার গুলী ছুঁড়তে থাকে। আসহায় মহিলাগণ কেউ সামনে, কেউ-বা পেছনে ছুটাছুটি করতে থাকে ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে একে-অপরকে আড়াল করে লুকাবার চেষ্টা করতে থাকে।

প্রহরিগণ মহিলাদেরকে গুলী করেই ক্ষান্ত হয়নি— বেয়নেট-বিদ্ধ করেও তাদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করে। কয়েক মিনিট পর এ বিভীষিকাময় প্রকোষ্ঠে শুধু একটি ছোট কুকুরের করুণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। তার কর্ত্রীকে খুঁজে পাবার জন্যে কুকুরটি মৃতদেহের চারপাশে ঘুরছিলো। জনৈক সৈনিক মৃত রাজরানীদের দেহ কেটে কয়েক টুকরো করে গ্যাসোলিনে ভিজিয়ে পোড়াতে দেয় ও পরে ভাজা টুকরাগুলো পুরানো লৌহখনির মধ্যে নিক্ষেপ করে।

—Dale Carnegie : Little known facts about well known people,
Popular Library, New York, 1956. P. 60.

কোকন্দ (মধ্য-এশিয়ার স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের রাজধানী) শহর অধিকার করে, শহরটি এত নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করা হয় যে, তা মধ্যযুগীয় মোঙ্গল বিজয়ীদেরকেও তাজ্জব করে দিত। চৌদ্দ হাজারের অধিক লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মসজিদ ও প্রার্থনাগারের পবিত্রতা বিনষ্ট করে সেগুলোকে ধ্বংস করা হয়। মুসলিম সাহিত্যের চমকপ্রদ গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করা হয়। শহরের অন্য অধিবাসীরা যাতে করে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ থেকে কোনও খাদ্যশস্য পেতে না পারে, সেজন্য কঠোর অবরোধের ব্যবস্থা করা হয়। আর তাদের নিজেদের শস্যসামগ্রী পূর্বেই বাজেয়াফত করা হয়েছিলো। এ দুর্ভিক্ষে ৯০ লক্ষেরও অধিক লোক মারা যায়।

— Lt. Col, P. T. Ellerton : In the Heart of Asia. New York, 1926. P. 153.

আল্লাহ্র পথে জেহাদ কর ঃ অর্থাৎ যারা তোমাদেরকে আক্রমণ করে, তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রথমে তাদেরকে আক্রমণ করো না। কারণ আল্লাহ্ আক্রমণকারীদের ভালবাসেন না। — আল কোরান ২ ঃ ১৮৬

যদি তোমরা অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে অন্যায়ের মাত্রা অবধি প্রতিশোধ নাও। কিন্তু যদি সবর করতে পার, তবে তাই সবচাইতে ভাল।

— আল্-কোরান ১৬ ঃ ১২৬

হাদিস ঃ কথায়, কাজে ও চিন্তায় যে ব্যক্তি ভাল, সেই সব চাইতে উত্তম বলে গণ্য হবে।

সমগ্র সৃষ্ট জগৎ আল্লাহর পরিবারের মত। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে আল্লাহর বান্দাদের মঙ্গলসাধনের জন্য সর্বস্ব পণ করেন।

সেই ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান, যার জিহ্বা ও হস্ত থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে। নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাই সত্যিকার মুজাহিদের কাজ।

যে ব্যক্তি জুলুম করার জন্য অন্য লোককে আহ্বান করে ও অন্যায়ভাবে নিজের গোষ্ঠীর স্বার্থে সংগ্রাম করে ও জুলুম করতে তার গোষ্ঠীর লোকদের সাহায্য করে, তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই (অর্থাৎ সে মুসলমান নয়)।

সদ্ব্যবহার, আলাপ আলোচনা করে কাজ করা ও প্রতিটি ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুয়তের ২৪ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ এসব গুণ সব নবীর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা গেছে। বুদ্ধিমত্তার চাইতে সুন্দর ও পরিপূর্ণ অন্যকিছু আল্লাহ্ তৈরি করেননি।

নিশ্চয়ই কোনও ব্যক্তির নামায, রোযা, সাদ্কা, হজ ও অন্যান্য ভাল কাজে কোন ফল হবে না, যে পর্যন্ত সে এসব জিনিসের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে।

আল্লাহ্র কাছে তার মর্যাদা খুব উঁচু, যে অন্যায়কারীর উপর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে।

নবী করিমকে (স.) বলা হয়—হে রসুল, আপনি কাফেরদের অভিশাপ দিন। নবী মুহাম্মদ (স.) জবাব দেন—আমি এজন্য প্রেরিত হইনি, নিখিল বিশ্বের রহমতরূপেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঃ মুহাম্মদ (স.) কতবার যে ক্ষমা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, তার সবগুলো স্মরণ করা খুব কঠিন ব্যাপার। সরল-স্বাচ্ছন্দ্যে কোরেশদেরকে ক্ষমা করার বিষয়টি সত্যিই দুনিয়ার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। যখন আমরা দেখতে পাই যে, ক্ষমার তালিকার মধ্যে রয়েছে আবু সুফিয়ানের পরিবারের উগ্র মহিলাটি, যে হামজার যকৃৎ চিবিয়ে খেয়েছিলো; ওয়াহ্‌শি নামক জনৈক নিগ্রো, যে পেছন দিক থেকে আঘাত করে হামজাকে হত্যা করে; আবু সুফিয়ান, যে ইসলামের বিরুদ্ধে সেনাদেরকে উত্তেজিত ও পরিচালিত করে; ইকরামা বিন আবু জাহ্‌ল, যে সকালে মক্কায় প্রবেশ করতে খালিদকে বাধা দেয়; হযরতের নকলনবিশ আবদুল্লাহ, যে আল-কোরানের পবিত্র পৃষ্ঠা নষ্ট করে ফেলে; নটী কারিবা, যে তার সমস্ত কলা-কৌশল ও বাচনভঙ্গী প্রয়োগ করে রসূলকে ঠাট্টা করে বেড়াত, তখন হযরত মুহাম্মদের (স.) মহানুভবতা সত্যিই আশ্চর্যজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

— K. L. Gauba : The Prophet of The Desert, Lahore, 1949, P 212.

রসূলে আকরাম (স.) ও জেহাদ ঃ শারাহ্‌বিল নামে এক খ্রীস্টান রাজা রসূলুল্লাহ-প্রেরিত দূতকে হত্যা করে, তখন সিরিয়ার মুত্তায় ফৌজ পাঠানো হয়। সৈন্য পাঠাবার সময় রসূলুল্লাহ (স.) সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

বিশ্বাসঘাতকতা করো না। শিশু, মহিলা, বয়স্ক লোক ও নিরিবিলি লোকদের হত্যা করো না। কোনও বৃক্ষ বা দালান ধ্বংস করো না।

খোলাফায়ে রাশেদা ও জেহাদ ঃ সিরিয়ার প্রথম অভিযানের সময় খলীফা হযরত আবুবকর (রা.) সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে চলবে। বিশ্বাসঘাতকতা করো না। শিশু, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদেরকে হত্যা করো না। খেজুর গাছের কোনও ক্ষতিসাধন করো না বা পুড়িয়ে দিও না। কোনও ফলের গাছ কেটে ফেলো না। খাদ্যের জন্য ছাড়া গৃহপালিত পশু বা উট হত্যা করো না। এমন লোককে দেখতে পার, যারা ধর্মস্থানে নির্জন জীবনযাপন করে, তাদেরকে শান্তিতে বসবাস করতে দেবে।

ইসলামী জীবনদর্শন

ইসলাম ধর্মের সংজ্ঞা ঃ যারা ক্ষমতা হাতে পেলে নামায কায়েম করবে, মানবিকভাব দেখাবে, যাকাত (বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা) কায়েম করবে, সৎকাজ করবে ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকবে। — আল কোরান ২২ ঃ ৪১

ইহকাল ও পরকাল সমানভাবে স্বীকৃত। —(৩১ : ২০, ৭ : ৯৬)

"আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর সামাজিক জীবন গঠিত।"

— ইবনে খালদুন : "মুকাদ্দিমা"

নবীদের কাজই হলো ধর্মীয় নীতিকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

—শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (হুজ্জাতুল্লাহিলবালিগা)

ইসলামে মোল্লাতন্ত্র নেই : তাঁর (আল্লাহ্‌র) অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে না। —আল-কোরান (১০ : ৪)

ইসলামে অদৃষ্টবাদ নেই : আল্লাহ্ কোন জাতির পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করবার চেষ্টা না করে।

—আল-কোরান (১৩ : ১১)

ঘৃণ্য ভীতি ও অলস নৈরাশ্য থেকে পাওয়া নিছক দুর্বল ও হতাশাব্যঞ্জক কর্মবিমুখতাই যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সুবিচারের ওপর মুসলমানদের আত্মসমর্পণের একমাত্র মাপকাঠি হয় ও ধর্মীয় নীতির অনুগ্রহণের মধ্যে নিষ্প্রাণ আচার ছাড়া আর কিছু না থাকে ও ধর্মীয় অনুশাসন ও কর্তব্যাদি পালনের একঘেয়েমি ও মৃত যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়, তবে সে খুব নীচু-দরের মুসলিম ও ইসলাম অনুসারী বলে গণ্য হবে। এই ধরনের মুসলমানই সব সময়ে কিস্‌মতের দোহাই দেয় ও 'ইনশা-আল্লাহ' তার মুখে সর্বদা লেগেই থাকে। এইসব ধরনের মুসলিমের মানসিকতা ও জীবনযাত্রা-প্রণালী থেকেই খ্রিস্টীয় সমালোচকগণ ইসলামকে অদৃষ্টবাদের প্রধান উদগাতা বলে সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু মুহাম্মদের জীবনের ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে আমরা কি দেখতে পাই?

কর্মচঞ্চল শৈশব, কর্মময় বাল্য, কর্মবহুল যৌবন। যৌবনে তিনি দু-দুবার বাণিজ্যিক সফরে শরীক হন। বহুদিন ধরে তাঁকে বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে রৌদ্রতপ্ত ঊষর-মরুতে মাসের পর মাস পরিভ্রমণ করতে হয়। জীবনের পরিপূর্ণ অবস্থায় তাঁকে জীবনসমস্যা ও নিয়তি সম্বন্ধে অবিরামভাবে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতে হয়েছে, আর মধ্যবয়সের গোড়ার দিকে তাঁর জীবন অনেকটা শান্ত-সমাহিত ছিল। কিন্তু পরিশেষে তাঁকে জীবনের সবচাইতে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে—যুদ্ধ, অবরোধ, আক্রমণ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। দীর্ঘ বলবীর্যময় জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও নিয়তির খেলায় তাঁকে আন্দোলিত হতে হয়েছে। এ ধরনের জীবনকে কি অদৃষ্টবাদী বলে অভিহিত করা চলে? কারণ অদৃষ্টবাদের মাঝে রয়েছে

কর্মহীন জীবন ও যা কিছু ঘটে, তাকেই নিশ্চিন্তে মেনে নেবার প্রবৃত্তি। সত্যি কথা বলতে কি, হযরত মুহাম্মদের (স.) মধ্যে এমন এক সংগ্রামময় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে বাধার জগদ্দল লঙ্ঘন করে, আল্লাহ্‌তাআলার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাঁর সর্বোচ্চ ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বিরাট সাহসিকতা ও নির্ভীকতার সাথে নিজের জীবনকে সুসংগঠিত করবার সুবিপুল প্রত্যয় ফুটে উঠেছে। — অধ্যাপক ওয়াদিয়া ঃ দি মেসেজ অব মুহম্মদ, লন্ডন, ১৯২৩, ৫০—৫১ পৃষ্ঠা।

ইনসাফ, উদারতা ও ইসলাম ঃ হে মুমিনেরা, ইনসাফ কায়েম কর, ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দাও, যদিও সেই কাজ তোমার স্বার্থের পক্ষে বা তোমার মাতাপিতার বা আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থের বিরোধিতা হয়। এ বিষয়ে ধনী বা গরীবদের মধ্যে কোন বাছ-বিচার করবে না। কারণ সবার চাইতে আল্লাহ্‌ই তোমার আপন।

— আল্-কোরান ৪ ঃ ১৩৫

হে মুমিনেরা, ন্যায়বিচারের সঙ্গে চল। আর কোনও একটি গোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারের পথ থেকে সরিয়ে না ফেলে। ইনসাফ কায়েম কর; আর সেটা আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের কর্তব্য। মনে রেখো, তোমরা যা করছ, আল্লাহ্ সবই জানেন। —আল্ -কোরান ৪ ঃ ১৩৫

যারা দুনিয়ায় অন্যায় ও অবিচার করে ও গোলমাল-ফ্যাসাদ এবং অনর্থক অরাজকতার সৃষ্টি করে ও সমাজ খারাপ হয়ে গেলে তার সংশোধন ও সংস্কারের চেষ্টা করে না, তাদেরকে অনুসরণ করো না। — আল্-কোরান ২৬ ঃ ১৫১—৫২

হযরত ঈসার (আ.) বাণীর মতই আল্-কোরান গরীবের বন্ধু, ক্ষমতাবান ও ধনীদের অবিচারের বিরুদ্ধে এর বজ্রকঠিন ফরিয়াদ। এতে এমন একটি কথাও নেই, যা রাজনৈতিক অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কোনও সাহসী মুসলিমের মুখে প্রতিবাদস্বরূপ আকস্মিকভাবে আল্-কোরানের বাণী উচ্চারিত হলে তা প্রাচ্যদেশীয় যে-কোনও অত্যাচারী শাসককে দমিত করবার জন্য যথেষ্ট।

—হিগিন্‌স ঃ অ্যান অ্যাপলজি ফর দি লাইফ অব মুহম্মদ

ইসলামে সংখ্যালঘুর অধিকার ঃ ইসলামী সমাজ ইসলামের সার্বজনীন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে সংখ্যালঘুদের ধর্ম ও নিজস্ব সত্তা স্বীকৃত হয়। ধর্ম, দর্শন ও মতবাদের ফলেই সংখ্যালঘুর জন্ম হয়। তাই ইসলাম সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি করেনি। মুসলিম, অমুসলিম সবাই সমান অধিকার ভোগ ও কর্তব্যাদি পালন করবে। কিন্তু সবাইকে ইসলামের সার্বজনীন নীতিকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে মেনে নিতে হবে ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হতে হবে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তারও সুযোগ-

সুবিধা সংখ্যালঘু সমানভাবেই ভোগ করবে। কিন্তু যেহেতু যাকাত তাদের ওপর প্রয়োগ করা কঠিন হতে পারে, তাই তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা শূল্ক (Social Insuranee Tax) দিতে হবে। অমুসলিমকে যুদ্ধে যোগদান করা থেকে রেহাই দেবার জন্যেই জিজিয়া বসান হতো। এ ভিন্ন এ শুল্ক বসানো চলবে না। মনে রাখতে হবে যে, এ শুল্ক কেবল সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ওপর বসানো হতো।

অমুসলিম জাতিগুলোর মর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবেই 'মিল্লাত' পদ্ধতির উদ্ভব হয় তুরস্কে। জাতিসংঘে (UN) এ নীতির কার্যকারিতা স্বীকৃত হয়েছে " Genocide Convention"-এর মারফত। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা জাতীয় সংখ্যালঘুকে সমূলে ধ্বংস করবার অপরাধের নাম Genocide.

সংখ্যালঘুর পবিত্র অধিকার রক্ষা করা সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য। তাই নিজের ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালন করলে অনায়াসে সর্বজাতির তথা সমগ্র মানবসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। আইনের দৃষ্টিতে এসব অধিকার ইসলাম ফরাসী বিপ্লবের হাজার বছর পূর্বেই নির্ধারিত করেছিলো। আর প্রথম মহাযুদ্ধের পর কেবল সংখ্যালঘুর অধিকারের কথা ওঠে। তবে "জিম্মা" কথাটি পছন্দসই না হলে "সংখ্যালঘু' ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইহুদীদের প্রতি প্রদত্ত সনদে রসূলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেন ঃ

"নিশ্চয়ই তারা (মুসলিম ও ইহুদী) অন্যান্য জাতির সঙ্গে তুলনায় একই (রাজনৈতিক) জাতি হিসেবে গণ্য হবে।"

খ্রিস্টানদের প্রতি প্রদত্ত সনদে তিনি বলেন ঃ মুসলমানেরা খ্রিস্টানদের সঙ্গে সব ব্যাপারে মিলিত জীবনযাপন করবে;

মুসলমান কখনও কোনও খ্রিস্টানকে প্রতারিত বা ঘৃণা করবে না; তাঁরা যেখানেই থাকুন, মুসলমানদের মতই আমি তাঁদেরকে রক্ষা করবো, ইনসাফের সঙ্গে আমি সকলকে শান্তিতে রাখব ও সাহায্য করবো। ... তাঁদের ওপর জোর করে শুল্ক চাপানো যাবে না;

তাঁরা থাকবেন সম্পূর্ণ নিরাপত্তায়। তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পত্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হবে;

খ্রিস্টানদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করা হবে না বা তাঁদের ওপর জোর করে ইসলাম ধর্ম চাপিয়ে দেয়া হবে না বা বলপ্রয়োগ করে তাঁদের বুঝাবার চেষ্টা করা হবে না।

ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবার সময় খুব সাবধানতা ও মিষ্ট ব্যবহারের সাথে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হবে। তাঁদের মনে কষ্ট লাগতে পারে, এমন সব বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে;

খ্রিস্টান পাদ্রী বা সাধুব্যক্তিদেরকে কেউ অপমানিত করবে না বা কষ্ট দেবে না। তাঁদের চার্চ বা উপাসনাগার থেকে পাথর নিয়ে কেউ যেন মসজিদ বা বাড়িঘর তৈরি না করে। কোন মুসলমান যদি অমুসলমানকে হত্যা করতো, তবে সে 'মুসলমান' এই অজুহাতে তার কোনও রেহাই ছিল না, মৃত্যুদণ্ডই ছিল তার জন্য বিধান।

— বুখারী ৮৭ ঃ ২৯

কোন অমুসলমানের মৃতদেহ যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন উঠে দাঁড়াবে।

—হাদিস

বিনা অপরাধে যে ব্যক্তি একটি লোক খুন করলো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করলো। —আল্-কোরান ৫ ঃ ৩২

ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। —আল্-কোরান ২ ঃ ২৫৬

বল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের ও সত্যের তাগিদে আল্-কোরান নাজেল করেছেন। যে এর থেকে হেদায়েত পাবে, তাতে তারই সুবিধা, আর যে ভুল পথে যাবে, তাতে তারই ক্ষতি হবে। —আল্-কোরান ৩৯ ঃ ৪১

মূর্তিপূজকদের মূর্তিকে গালিগালাজ করো না। —আল্-কোরান ৬ ঃ১০৯

যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে না বা ধর্মের জন্যে তোমাদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয় না, সে-সব অমুসলমানদের প্রতি ভাল ব্যবহার কর ও সুবিচার কর। জেনে রেখো, আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরই ভালবাসেন।

—আল্-কোরান ৬০ ঃ ৮

আল্-কোরান জোর-জবরদস্তি করে কোথাও চাপানো হয়নি, শান্তিপূর্ণ নীতি ও বোঝাপড়ার মারফতই এর নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

Gustave Le Bon : Civilization des Arabes

ইসলামে নারীর অধিকার ঃ ইসলামে মানবিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে নরনারীকে সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মানের ভিত্তিতে নরনারীর সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়েছে। আল্-কোরান ও হাদিসে নারীদের সমানভাবে মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে পুরুষের সাথে সাথে। নরনারীদের সমমর্যাদা ও সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু উভয়ের কার্যের ধারা কিছুটা ভিন্ন হতে

বাধ্য। এ কারণেই এই বিভিন্নতার আলোকে নরনারীর অধিকারের ব্যবস্থা ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। ধন-সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তিতে নারী পুরুষের অর্ধেক পাবে। কারণ পিতা ও স্বামী এ দুই দিক থেকেই নারীগণ সম্পত্তি ভোগ করে থাকেন। (৪ ঃ ১১) সাধারণ নিয়মে দৈহিক সামর্থ্যের ইংগিতে ও মাতৃত্বের বিভিন্ন কর্তব্যের কথা চিন্তা করে স্বাভাবিকভাবে পুরুষকে নারীর অভিভাবক ও পারিবারিক রক্ষক হিসেবে মনে করা হয়েছে। নারীরা চরম শারীরিক অক্ষমতা বা এতীমদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একাধিক বিবাহ অনুমোদিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু সদ্ব্যবহার না করতে পারলে তাও হয়েছে নিষিদ্ধ। (৪ ঃ ৩) নারীর পক্ষে বহুবিবাহ একেবারেই অনুমোদন করা হয়নি ; কারণ পৈতৃক উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ও পিতা নির্ধারণে যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হয়, পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ভেঙে যায় ও সমাজ-জীবনে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ইংলন্ডে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্বীকৃত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে (১৮৭৫) অবরোধ হিসেবে পর্দাপ্রথা পরবর্তীযুগে পারসিক সভ্যতা থেকে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু শালীনতা ও নৈতিকতার দিক থেকে পর্দা ইসলামী সমাজের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। মনে রাখতে হবে, বর্তমান সমাজে ইসলামে নারীর অধিকার সবদিক এখনও রূপায়িত হয়নি।

আল-কোরান ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদনশীল পুরুষ ও নিবেদনশীল নারী, বিশ্বাসী নরনারী... তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে মহাপুরস্কার রয়েছে।

—৩৩ ঃ ৩৫

পুরুষ যা অর্জন করবে, তা তার, আর নারী যা অর্জন করবে তা তার প্রাপ্য।

—৪ঃ ১১

কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকার দরুন ও অর্থনৈতিক রক্ষক হিসেবে পুরুষ নারীর অভিভাবক হিসেবে গণ্য হবে। —৪ ঃ ৩৪ (২ ঃ ২২৮)

আল্লাহ্‌র চিহ্নগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, তোমাদের জন্য তোমাদের (মানবজাতি) থেকেই নারী জাতির পয়দা করেছেন, যাতে করে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পার ও তোমাদের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতি দিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য অনেক চিহ্ন রয়েছে।। —৩০ ঃ ২১

বিশ্বাসী মহিলাদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও শালীনতা রক্ষা করে ও বহিরঙ্গ ছাড়া তাদের অলংকারাদি প্রদর্শন না করে ও তাদের গায়ের ওপর দিয়ে তারা একটা কাপড় পরিধান করে। — ২৪ ঃ ৩১ (৩৩ ঃ ৫৯)

বিশ্বাসীদেরকে বল যে, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও শালীনতা রক্ষা করে। এতেই তারা পবিত্র জীবনযাপন করতে পারবে। তারা যা করে, আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। —২৪ ঃ ৩০

হে বিশ্বাসিগণ! অন্যলোকের বাড়িতে বিনা অনুমতিতে ও সালাম না করে প্রবেশ করো না, এটাই তোমার পক্ষে সবচাইতে ভালো। একথা যেন মনে থাকে।

—২৪ ঃ ২৭

তোমার স্ত্রীগণ তোমার পক্ষে পোশাকের মত এবং তুমি তোমার স্ত্রীগণের পোশাকস্বরূপ। —২ঃ ১৮

বিশ্বাসী নরনারী (স্বামী-স্ত্রী) একে অপরের বন্ধু। যা ন্যায়সঙ্গত, তাই তারা সুপ্রতিষ্ঠিত করে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা করে। —৯ ঃ ৭২

হাদিস ঃ নারীর অধিকার অতি পবিত্র বস্তু। দেখো, সেগুলো যেন সঠিকভাবে কার্যকরী হয়।

মায়ের পায়ের নিচে হলো বেহেশ্‌ত ।

নরনারী উভয়ের জন্য শিক্ষা অবশ্যকর্তব্য।

সম্মতি ব্যতিরেকে কোন মেয়েকে বিবাহ দেয়া চলবে না।

যদি নাবালিকা অবস্থায় কোন মেয়ের বিবাহ হয়, তবে সে বিবাহ ভেঙে দেবার ক্ষমতা তার থাকবে।

তোমরা যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চাও, তবে তাকে আগে দেখে নাও।

অক্ষমতা ও অসদ্ব্যবহারের অজুহাতে কোন মহিলা স্বামীকে তালাক দিতে পারে।

উমায়মা রসূলের (স.) কাছ থেকে তালাক নিয়েছিলেন। — বুখারী ৬৮ ঃ ৩

সাবিত বিন্ কায়েসের স্ত্রী তাঁকে তালাক দিয়েছেন। —বুখারী ৬৮ ঃ ১১

প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক তার মুখ ও হাত ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ আবৃত রাখবে।

— আবু দাউদ ঃ হযরত আয়শা থেকে

স্ত্রীর ওপর তোমার যেমন অধিকার আছে, তোমার ওপরও তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে।

সদাচারিণী মহিলা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ।

যে জিনিসটি আইনানুমোদিত, কিন্তু আল্লাহ্ সব চাইতে বেশি অপছন্দ করেন, তা হলো তালাক।

স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে যে ব্যক্তি উত্তম, সে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

মুসলমান তার স্ত্রীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করবে না। যদি তার কোন ব্যবহার ভাল না লাগে, তবে অন্য গুণের কথা চিন্তা করে সে খুশী হোক।

যে-সব নারী অল্পে সন্তুষ্ট, তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

দার্শনিকদের অভিমত ঃ ডক্টর লীট্নার ঃ ইসলাম নারীকে তুচ্ছ সম্পদ থেকে সম্পদের মালিকে পরিণত করেছে।

ডেমম্বাইনিজ্ ঃ কোরানের আইন নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে, তা অনেক দিক দিয়ে আধুনিক ইয়োরোপীয় আইনের চাইতেও সুবিধাজনক।

— মুসলিম ইন্সটিটিউশান্স, লন্ডন, ১৯৫, ১৩২ পৃষ্ঠা

মুসলিম্ নারীর বর্তমান অবস্থার জন্য হযরত মুহাম্মদকে (স.) দোষ দেয়া গর্হিত কাজ। তাদের দুর্গতির জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার অভাবই একান্তভাবে দায়ী। ইসলামী আইনে এমন কোনও মহাভ্রান্তি নেই, যার জন্য তাদের এ অবস্থা হয়েছে।

— ওয়াদিয়া ঃ দি মেসেজ অব মুহম্মদ, লন্ডন, ১১২ পৃষ্ঠা

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে। শাসক থেকে শুরু করে নিম্নতম নাগরিক পর্যন্ত একই আইনের অধীন। ধনী-দরিদ্র, শ্রমিক-মালিক, মুসলিম-অমুসলিম সবাই একই পর্যায়ে পড়ে; জাতিগত বিভেদ থাকলেও আইনব্যবস্থা সবার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। রসূলে আকরাম (স.) পর্যন্ত এই আইনের অধীনে ছিলেন। ইসলামী আইনের মৌলিক ভিত্তি ইসলামী জীবনদর্শনের ওপর নির্ভরশীল; কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়ে এর রূপ ও রূপায়ণের পন্থা যুগে যুগে ও দেশে দেশে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

আইনের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ইসলামী রাষ্ট্রে অন্যতম মৌলিক কার্যধারার মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছিল গোড়া থেকেই। মুসলিম শাসকেরা কোনদিন আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না। কাজীর স্বাধীনতা সব সময়েই রক্ষিত হয়েছে। এরই নাম হয়েছে "কাজীর বিচার"।

আমি (সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন) বাদশা নই। — রসূলে করীম (স.)

যখন আমি আইনের বিরোধিতা করব, তখন আপনারা আমাকে সংশোধন করবেন।

— হযরত আবু বকর (রা.)

সালমান নামে জনৈক সাহাবীকে হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি খলীফা, না বাদশা। সালমান জবাব দেন ঃ যদি খেয়ালখুশিমত আপনি জনগণের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করেন, তবে আপনি বাদশা, নতুবা খলীফা।

আপনার আত্মীয় হোক-না-হোক, সবার প্রতি সমান সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করুন। যদি আপনার কোন আত্মীয় আইন অমান্য করে, তবে তা যত দুঃখজনক হোক-না-কেন, আপনাকে সমুচিত শাস্তিবিধান করতেই হবে। কারণ, তা রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক।

— হযরত আলী (রাঃ) সুষ্ঠু ধর্মীয় রাষ্ট্র সম্পর্কীয় সনদ

ঐতিহাসিকদের অভিমত ঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে যে বিচারব্যবস্থা নাগরিকদের ওপর কার্যকরী করা হয়, তা সর্বাবস্থায় যে আইনের চোখে সার্বজনীন সাম্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে, এ কথা জোর করে বলা যায় না। অর্থাৎ সব রাষ্ট্রেই যে ছোটবড় সবার ওপর আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, একথা বলা যায় না।

আইনের রূপায়ণ করেই রাষ্ট্রীয় সুবিচারের কাজ শেষ হয়—মৌলিক বিচারে সে আইন ন্যায়নীতি-অনুগ কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর।

কিন্তু মৌলিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, যে আইন-ব্যবস্থা আইনের সাম্য অস্বীকার করে, তা আদতেই অবিচারমূলক। মৌলিক নৈতিক বিচারে যদি আইন ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে তা জাতিধর্ম ও অবস্থা নির্বিশেষে সবার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। মুসলিম আইনব্যবস্থা এই মৌলিক নৈতিক আইনের ওপর গড়ে উঠেছে।

— ডক্টর পি, শরণঃ দি প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মুগলস্, এলাহাবাদ, ১৯৪১, ৩৬৬ পৃষ্ঠা

সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিচারকগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। এমন কি, সে যুগেও ধনী, দরিদ্র-শ্রমিক ও শাসকের জন্য ছিল একই আইন।... ইসলাম এমন এক শাসনব্যবস্থার পত্তন করে, যার মধ্যে মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের সুস্পষ্ট ইশারা দিয়ে এক নমনীয় গঠনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনের দৃষ্টিতে মানুষকে যে শুধু সমান মনে করা হতো, তাই নয়, আইনের মূল উৎস ও শুল্কের মাত্রা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশ করে দিয়ে গৌণভাবে শায়ত্তশাসনের মূলভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

— দি মেসেজ অব মুহম্মদ ঃ আরদাসীর সোহরাবজী এন্ ওয়াদিয়া, লন্ডন, ১৯২৩, ১০৪ পৃষ্ঠা

ইসলামী অর্থনীতি ঃ অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকের সম্পত্তিতে অভাবী বা বঞ্চিতদের হক্ রয়েছে। — আল-কোরান ৫১ ঃ ১৯

যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে পারিশ্রমিক পায়, তার পারিশ্রমিক ধন্য। —৩ ঃ ১৩৫

ধনসম্পদ বৃথা ভোগ করো না বা কাউকে দিও না, যে এর কিছু অন্যায়ভাবে গ্রাস করে। —২ ঃ ১৮৮

সালাতের সঙ্গে সঙ্গে বার বার যাকাত বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নীতির ওপর দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রূপায়িত করতে না পারলে খাঁটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যাকাত কোনও নির্দিষ্ট হারের সাথে চিরদিনের জন্য বাঁধাও নেই। তাই উন্নত ও অনুন্নত সব সমাজেই জাকাত-নীতির মৌলিক রূপায়ণ সম্ভব।

হাদিস ঃ অপরের অর্থ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা তার রক্তের মতই হারাম। নিজে চাষ কর অথবা অপরকে চাষ করতে দাও। যেটুকু নিজে চাষ করতে পার, তার বেশি জমি রাখার অধিকার তোমার নেই। — বুখারী

গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাবার পূর্বেই মজুরী প্রদান কর। একচেটিয়া ব্যবসায়কারী ও মানুষ-হত্যাকারী একই পর্যায়ের। — রাজী ঃ আবু হোরায়রাহ্ থেকে

যে ব্যক্তি জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়, সে সুদখোরের শামিল, অসৎ অন্যায়কারী ও প্রবঞ্চক। — ইবনে আবি আউফা থেকে

আল্লাহ্ তার প্রতি খুশী, যে নিজের পরিশ্রমে জীবিকার্জন করে। — আবু দাউদ

যে অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, সে আমার কাছে আসুক, আমি তার অভাব মিটিয়ে দেব।

তোমরা যা খাও, যা পরিধান কর, তোমাদের অধীন লোকদেরও তাই খেতে ও পরতে দেবে।

দার্শনিকদের বিচারে ঃ সব জমির মালিকানা আল্লাহ্র। যে ব্যক্তি পূর্বে চাষ ও দখল করেছে, তারই ভোগের অধিকার।

— শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ ঃ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"

মুসলিম বিজয়ের ফলে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তিমূল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

— গীজোঁ ঃ সভ্যতার ইতিহাস, প্রথম পুস্তক

রসূল (স.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত জমিকে জীবন্ত করে তোলে, তাতে শরিকানা ও ভোগের অধিকারও তারই। আর অনাবাদী জমি সামাজিক সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। ... এ নীতির প্রয়োগের ফলেই জাভা ও আলজিরিয়ায় সামাজিক সম্পদ আজও বেশ উল্লেখজনক স্থান দখল করে রয়েছে।

— চার্লস জাদী ঃ প্রিন্সিপলস অব পোলিটিক্যাল ইকনমি, লন্ডন, ১৯১১, ৫৯৯ পৃষ্ঠা

এই চীনসাগর থেকে আতলান্তিক অবধি কয় বছরে এই যে মানবিক ঝড় বয়ে গেল, তার কার্যকারণ কি?

ইসলামী অভিযানের ফলে সৃষ্টি হল এমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, যাতে সামন্তযুগের বিশৃংখলা এবং তার পরগাছা সমাজবিন্যাস ভেঙে গেল।

আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন ঃ ফ্রান্সে আরব-সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত না হওয়ায় ফ্রান্সেরই লোকসান হয়েছিল। কথাটা সত্য, কারণ ৭৩২ সালে শার্লেমার্তেলের সেই আরব বিতাড়নের ফল এই হল যে, আসন্ন আরব সভ্যতার সুফল ফ্রান্স পেল না। অর্থাৎ ফিউডাল অনাচারের যুগ শেষ করবার ঐতিহাসিক সুযোগ ও জাতীয় ঐক্য গঠনের উপায় পেল না। কয়েক শো বছর পিছিয়ে রইল ফ্রান্স, মানব-সভ্যতার লোকসান হল একটা যুগ।

— রোজের গারোদি, "ইসলামিক সভ্যতা" ফরাসী কমিউনিস্ট পত্রিকা—কাই-এর দ্য কমিউনিজম,' অনুবাদ-সৈনিক, ঢাকা, ১ জুলাই, ১৯৫১

উত্তর থেকে বর্বরদের দ্বারা স্পেনে কখনো নব-জীবনের সূচনা হয়নি, হয়েছে দক্ষিণদিক থেকে আগত আরব বিজেতাদের মধ্যস্থতায়। যোদ্ধার অভিযান না বলে বরং একে সভ্যতার প্রসার বলা যায়। এই সভ্যতায় ইসলামের আবেগে মিশ্রিত হয়েছে ইহুদী ধর্মের শ্রেষ্ঠনীতি ও বাইজান্টীয় বিজ্ঞান। স্পেনের প্রান্ত দিয়ে যখন প্রবেশ করলো আগন্তুকরা—বহু রাজা, বহু ধর্মতাত্ত্বিক এবং দাঙ্গাবাজ বিশপদের শোষিত দাসানুদাস হয়ে পড়েছিল স্পেনের যে জনসাধারণ, তারা মুক্তহস্তে স্বাগত জানিয়েছিল আগন্তুকদের। ... সামরিক শক্তির বলে এই অভিযান চলেনি। এমন একটা নতুন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি হল, প্রতিটি ক্ষেত্রে যার প্রভাব পৌঁছল। বিবেক মুক্তির যে নীতি গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন জাতির নতুন মর্যাদাবোধের সূচনা হয়, সে নীতি অত্যন্ত প্রিয় ছিল এঁদের কাছে।

— ক্যাথিড্রালের ছায়ায়, ব্লাস্‌কো ইবানেথের সাক্ষ্য, ২০১—২০৪ পৃষ্ঠা

স্পেনের পক্ষে আরব অভিযান হল মঙ্গলময়। এর ফলে এল এক সামাজিক বিপ্লব; দীর্ঘকাল ধরে দেশের বুকে চেপে যে-সব অত্যাচারের ভূত বসেছিল, তা সব দূর হয়ে গেল।

আরবদের শাসনতন্ত্র ছিল এইরূপ ঃ পূর্ববর্তী সব সরকারের তুলনায় খাজনার হার কমানো হল। শিভালরীর যুগে যে মাটি বিরাট বিরাট জমিদারীতে বিভক্ত ছিল এবং যার চাষ হত কৃষিমজুর বা অসন্তুষ্ট দাস দ্বারা, সেই মাটি আরব আমলে হয়ে ওঠল ঐশ্বর্যবান এবং নতুনভাগে সমান হিসেবে জমির মালিক হল জমি চাষ করত যারা, তারা। এই নতুন মালিকরা কাজে লাগলো পূর্ণ উদ্যমে এবং ফসল হতে লাগল বেশী। ব্যবসা-বাণিজ্য নানা বাধা ও রাজস্বের চাপ মুক্ত হয়ে বিশেষভাবে বিস্তৃত ও উন্নত হল। কোরানের নির্দেশে দাসরা ন্যায্য ক্ষতিপূরণে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করে নতুন কর্মশক্তি পেল। এইসব মিলে যে একটানা সচ্ছল সুস্থভাব এল, তারই জন্য আরব-শাসন প্রারম্ভে পেয়েছিল জনসাধারণের সমর্থন। .. সর্বোপরি লিখিত আইন ও নির্দিষ্ট বিচারব্যবস্থা ও অবিভাজ্য শাসনতন্ত্র গঠনের দ্বারা আরব বিজেতারা এমন একটা প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করল, যা মানব-সভ্যতার সৃষ্টিময় যুগে অপরিহার্য।— দোজী ঃ স্পেনে মুসলিম ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা

ইসলাম ও দাসপ্রথা ঃ ইসলামের আবির্ভাবের সময় দাসপ্রথার ছিল বহুল প্রচলন। বস্তুতঃ গোটা সমাজব্যবস্থাই ছিল দাসদের ওপর নির্ভরশীল। রসূল আকরাম (স.) তাই আকস্মিকভাবে দাসপ্রথার উচ্ছেদ করতে চাননি। দাসের প্রতি মানবিক ও উদার ব্যবহারের বিধান দিয়ে, তিনি ক্রমে ক্রমে দাস প্রথার বিলোপসাধনের চেষ্টা করেন। মুসলমান হিসেবে দাস-প্রভুতে কোনই পার্থক্য ছিল না। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হলেন একজন হাবশী ক্রীতদাস— হযরত বেলাল। সততা, সাধুতা ও কার্যক্ষমতাই উন্নতির মাপকাঠি ছিল ও এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই নিম্নতম ক্রীতদাস সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবার সুযোগ পেতেন। ক্রীতদাসকে মুক্ত করা সবচাইতে সওয়াবের কাজ বলে গণ্য করা হতো। ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করতেও উৎসাহ দেয়া হতো। কিন্তু বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না করে যৌন সম্পর্ক স্থাপন নাজায়েয বা হারাম ছিল। আজকের দিনে মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন রাষ্ট্রে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে যে দাসপ্রথা রয়েছে, তা ইসলামী আদর্শের ঘোর বিরোধী।

মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ দাসপ্রথার কোন স্বীকৃতিই ইসলামের নেই— এমনকি, দাস কথাটি পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। যুদ্ধ-বন্দীদের উদ্দেশ্য করে বলা

হয়েছে ঃ যা তোমাদের দক্ষিণহস্তে থাকে, আর দাসগণ যাতে করে সমাজে বোঝাস্বরূপ না হয়, সেজন্য পরিশ্রমের বিনিময়ে মুক্তিলাভ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। অবশ্য বিশেষ অবস্থায়, বায়তুল-মালের অর্থে তাদেরকে মুক্ত করা যেতে পারে।

আল্‌-কোরান ঃ আর জানো কি, সে কঠিন পথটা কি? তা হলো যুদ্ধ-দাস বন্দীদের (অর্থের বিনিময়ে) মুক্ত করা, দুর্ভিক্ষের দিনে আত্মীয় এতীমদের ও ধূলিলুণ্ঠিত গরীবদের খাওয়ানো। —৯০ঃ১২ —১৫

যুদ্ধের অবসানে বন্দীদের হয় মুক্ত করো, নয় টাকার বিনিময়ে মুক্তি দান কর।

—৪৭ঃ৪

যে-সব দাসী তোমাদের অধীনে আছে, তাদেরকে বিবাহ করতে পার।

—৪ঃ৩

যে-সব দাস মুক্ত হতে চায়, তাদেরকে মুক্ত করে দাও। যদি তারা কোন কাজে আসে (কাজে নিযুক্ত করা যায়), তবে তোমাকে আল্লাহ্ যে সম্পদ দিয়েছেন, তার অংশ তাদেরকে দাও। পৃথিবীর ক্ষণিকের সুবিধার জন্য তাদেরকে পাপকার্যে আহ্বান করো না। —২৪ঃ৩৩

যাকাত দিতে হবে শুধু গরীব ও অভাবগ্রস্তদের, যারা যাকাত সংগ্রহ করে, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, দাসমুক্ত করা, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য, আল্লাহর পথে ও পরিব্রাজকদের জন্যে। —৯ঃ৬০

হাদিস ঃ যে ব্যক্তি বিক্রয় করে বা দান করে শিশুকে তার মার থেকে বিচ্ছিন্ন করে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাকে বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন।

দাসদের কাছ থেকে এমন কাজ করিয়ে নিও না, যা করা তাদের পক্ষে খুব কঠিন। যদি বেশি কাজ দিতেই হয়, তবে তাদের সঙ্গে নিজেও কাজে যোগদান কর।

কোন দাসকে দাস বা দাসী বলে ডেকো না, তাদেরকে ছেলে বা মেয়ে বলে ডেকো।

তোমরা দাসদেরকে দিনের মধ্যে সত্তর বার ক্ষমা কর।

তোমরা নিজেরা যে খাদ্য খাও ও পোশাক পরিধান কর, তাই তাদেরকে খেতে ও পরতে দাও।

দাসদেরকে শিক্ষিত করে তোলো, তাদের সঙ্গে ভাই-এর মত ব্যবহার কর। যে দাসের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

দাসকে মৃত্যু, শাস্তি ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবার জন্য কোন ব্যক্তির কাছে রহমত ভিক্ষা করা হলো সব চাইতে বড় দান।

আমার বন্ধু জিবরাঈল এত বার বার করে দাসদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নসিহত করতে লাগলেন যে, আমার দৃঢ়প্রত্যয় হলো যে, মানুষকে দাসত্বে পরিণত করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

দার্শনিকদের দৃষ্টিতে ঃ হযরত মূসা (আ.) আদেশ করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি মানুষকে চুরি করে নিয়ে যায় ও বিক্রয় করে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। একটি সুন্না অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছিলেন ঃ যে মানুষ বিক্রয় করে, সে নিকৃষ্টতম প্রাণী। অত্যন্ত অনুন্নত মুসলমানদের মধ্যেও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বিরাজমান। ফলে তারা দাসপ্রথা মেনে নিতে পারেন না।

হযরত মুহাম্মদ আকস্মিকভাবে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে দেননি। কারণ, সে সমাজে এ-প্রথার বিলুপ্তি ছিল সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ও অনুচিত। কিন্তু তিনি দাসদের মুক্ত করে দেবার জন্যে উৎসাহ প্রদান করেন। বন্দী ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত বলে গণ্য হত। পরিশ্রমকে খুব সম্মানীর ব্যাপার বলে মনে করা হত। এইভাবে মেহনতী মুক্ত দাসদেরকে যাতে ঘৃণা করা না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়। আর যারা দাস রয়ে গেল, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। মীনা নামক স্থানে শেষ-হজের নসিহতে তিনি বলে গেলেন ঃ তোমরা যা খাও, তাদেরকে তাই খেতে দেবে; যা পরিধান কর, তাই পরতে দেবে। কারণ তারা আল্লাহ্র বান্দা। তাদের প্রতি জুলুম করো না।

এ দাস আইনও ধর্মের বাঁধনে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, যাকে আধুনিক দাসপ্রথার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, 'দাস' কথাটি কোরানে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। "যারা তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধীনে রয়েছে", অর্থাৎ যাদেরকে আইনসঙ্গত যুদ্ধে বন্দী করা হয়েছে ও ফলে সে তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে, যদি তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো, তবে আপনা আপনিই মুক্তি পেত; আর যদি স্বধর্মে থেকে যেত, তবু তারা মুসলমানদের ভাই বলে সাব্যস্ত হত। যে মালিক দাসের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে, তার কাজ আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হবে, আর যে খারাপ ব্যবহার করবে, সে বেহেশত থেকে বঞ্চিত

হবে। যদি কোন ব্যক্তির দাসী-স্ত্রীর সন্তান জন্মলাভ করে, তবে সে শিশুকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না বা দাসীকে বিক্রয় করা চলবে না।

এসব মানবিক নীতি ইয়োরোপ বা আমেরিকার দাস-ব্যবসায়ী জাতিগুলো কোনদিনও তাদের আইনব্যবস্থায় গ্রহণ করেনি।

মনে রাখা উচিত যে, মুসলিম দেশগুলো, মুসলমানেরা (অধঃপতিত বা প্রগতিশীল যাই-হোক-না-কেন) আর ইসলাম এক জিনিস নয়। .... সর্বোত্তম মুসলমানের চাইতেও ইসলামী আদর্শ অনেক মহান বস্তু। নতুবা জীবন্ত আদর্শ হিসেবে তা টিকে থাকতে পারতো না।

—আর, ধসওয়ার্থ স্মিথ ঃ মুহম্মদ ও মোহামেডানিজম, লন্ডন, ১৮৭৬. পৃঃ-৩৩০, ২৪৩—২৪৪, ২৪৮, ৩০৬

হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্‌র নামে বার বার অনুরোধ জানিয়েছেন দাসদের মুক্ত করে দিতে, যে দাস মুক্ত করে দেবে, আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য সর্বোচ্চ সম্মান। দাসমুক্তির জন্য তিনি কয়েকটি মানবিকতাপূর্ণ আইন রূপায়িত করেন। দাসগণ পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে মুক্তিলাভ করতে পারে অথবা আবশ্যকমত বায়তুল-মাল থেকে টাকা দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করা যেতে পারে। দাসপ্রথা সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স.) গোটা শিক্ষা মালিক ও দাসের সম্পূর্ণ সাম্যের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

দাসব্যবসায়ীকে সবচাইতে নিকৃষ্ট প্রাণী বলে গণ্য করা হতো ও মুসলমানকে দাসে পরিণত করা ছিল নিয়ম-বিরুদ্ধ। ইয়োরোপে ও গোটা এশিয়া মহাদেশে যখন পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার নামগন্ধও ছিল না ও এসব দেশের কৃষকসমাজ যখন দাসপ্রথার চাপে জর্জরিত ছিল, তখন ইসলামী দেশগুলোতে সত্যিকার গণতন্ত্রসুলভ স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের গোড়া পত্তন হয়।

অবশ্য এটা খুবই লজ্জাকর যে, অনেক (মুসলিম দেশের) শাসকবৃন্দ রসূলের (স.) বাণী ও নির্দেশ লংঘন করে তাঁদের দেশে বহুনিন্দিত দাসপ্রথা চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। — ওয়াদিয়া ঃ দি মেসেজ অব মুহম্মদ, লন্ডন, ১১৭ ও ১০৫ পৃষ্ঠা

দাসমুক্ত করা (ইসলামে) সবচাইতে সওয়াবের কাজ। মুসলিম নীতিতে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে দেবার সুপারিশ করা হয়েছে।

হারগ্রোনুয ঃ মোহামেডানিজম, নিউইয়র্ক, ১৯১৬, ১২৯ পৃষ্ঠা

ইসলাম বিজ্ঞানের প্রেরণা দিয়েছে ঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ইসলাম খুব গুরুত্ব দিয়েছে ও সেই কারণেই প্রকৃতি, ইতিহাস ও মানুষের মন সম্পর্কে দৃষ্টি নির্দেশ করা হয়েছে বারে বারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্ম দিয়েছেন। ইসলামী জীবনদর্শনে বাস্তব বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পরিণতি লাভ করেছে। ইসলামের মতে বাস্তব ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান মানবজীবনের পক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আধ্যাত্মিক জীবনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া যেমন বাস্তব বিজ্ঞান চরমবাদে পর্যবসিত হয়, তেমনি বাস্তব বিজ্ঞানের মাধ্যমে রূপায়িত না হলে, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান নিছক স্বপ্ন-কল্পনায় পর্যবসিত হয়। কেবলমাত্র এ ধরনের সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমেই মানব-জীবনে বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের সাধারণ রূপায়ণ ও সমাজব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগে আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানলব্ধ মৌলিক নীতি পথ নির্দেশ করবে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা (কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট উভয়ই) ও ইসলামী সভ্যতার মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, দর্শন ও সমাজের ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরকে পাশ্চাত্য সভ্যতা জীবনের ভিত্তি বলে মনে করে। কিন্তু ইসলামী সভ্যতা জীবনের মৌলিক নীতি অপরিবর্তনীয় বলে মনে করে, আর বলে যে, জ্ঞান ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে এর রূপায়ণের আকার-প্রকার বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য।

ইসলাম বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুকূলে বার বার প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু কোরানকে বিজ্ঞানের পুস্তক মনে করলে ভুল হবে। তাই নতুন নতুন আবিষ্কারের সত্যতা কোরানের সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রেরণার সঙ্গে মিলিয়ে অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করা ভাবপ্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ছাড়া বিজ্ঞান আজ যে কথাকে সত্য বলে আখ্যাত করে, আগামীকাল তা পরিহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

আল-কোরান ঃ নিশ্চয় আসমান-জমিনের সৃষ্টিতে ও দিবারাত্রের পরিবর্তনে চিন্তাশীলদের জন্যে অনেক চিহ্ন রয়েছে। —৩ ঃ ১৯০

পৃথিবী, রাত্রি ও দিনকে তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তাঁর আদেশে তারকাগুলো তাঁবেদার হয়েছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্যে অনেক চিন্তার বিষয় রয়েছে। —১৬ : ১২

জীববিদ্যা —৩২ : ৮—৯

—২৩ : ১২—১৫

নৌ-বিদ্যা —৩৬ : ৩৮

খনিজ বিদ্যা	—৫৭ :	২৫
	—১৩ :	১৭
ঐতিহাসিক পদ্ধতি	—২ :	৪৯
	— ৪০ :	৮২

হাদিস ঃ সৃষ্টির সম্বন্ধে একঘণ্টা চিন্তা করা সারারাতের উপাসনার চাইতে শ্রেষ্ঠ।

দার্শনিকদের অভিমত ঃ ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই যুক্তি ছাড়া ঐতিহ্যকে মেনে নিতে চায়নি। ধর্মীয় আদর্শের বিভিন্ন দিকে গবেষণা চালাতে ইসলাম মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছে। — (গীজোঁ)

Guizot : History of Civilization

গবেষণা করে জানা গেছে যে, প্রাগ-রেনেসাঁ যুগে কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ গ্রীকদর্শন, গণিত, আকাশবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান সম্পর্কে যে জ্ঞানলাভ করেন, তা সবই মূল আরবি থেকে লাতিনে অনূদিত পুস্তকাদি থেকে। আরব ও তাদের সমগোত্রীয়দের মধ্যেই পরোক্ষভাবে আল্-কোরান এসব গবেষণার দিকে প্রথম প্রেরণা যোগায়। — (রড্ওয়েল)

Introduction to Rodwell's Trans, to the Quran, Everymans Library, p ix, 1950.

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে আরবদের হাতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জন্মলাভ করে। এ পদ্ধতিই পরবর্তীযুগে আধুনিক গবেষকদের হাতে নব নব আবিষ্কারের পন্থা হিসেবে কার্যকরী হয়। — (সেডীল)

Sedillot : Historic des Arabes

আধুনিক সভ্যতার ক্ষেত্রে আরব সভ্যতার বৃহত্তম অবদান হলো বিজ্ঞান। গ্রীকগণ চিন্তাবিদ্যা, সমীকরণ ও যুক্তিবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু গবেষণাপদ্ধতিটা গ্রীক মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। আমরা যাকে বিজ্ঞান নামে অভিহিত করি, তা আরবদের পদ্ধতি ইয়োরোপীয় জগতে প্রবর্তনের ফলেই জন্মলাভ করে। — ব্রিফল্ট

Robert Briffault : The Making of Humanity P. 202.

আহ্‌মদ আবূ মহ্‌জীদ নামে একজন মুসলমান ভারত, লোহিত, পারস্য ও চীন সাগরে সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে যে পন্থা রচনা করেন, তার ওপর নির্ভর করে নাবিকশ্রেষ্ঠ হেনরীর পরিচালনায় পর্তুগীজরা নৌ-বিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা চালায়।

সুয়েজখাল কাটার কথা সর্বপ্রথম যার মাথায় ঢোকে, তিনি একজন খলীফা। রাজনৈতিক কারণে পরিকল্পনাটি তিনি কার্যকরী করতে পারেননি।

ত্রিকোণমিতিতে যিনি ছেদক (Secant) আবিষ্কার করেন, তিনি কোপার্নিকাস নন, তিনি আবুল ওয়াব।

ইসলামী দর্শনের চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই দৃঢ়ভিত্তি ও দিগ্বিজয়ের আশ্বাস। আরব নৌ-অভিযানের স্রোতে কৃষি সামন্ত রাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন হল সর্বত্র, বাণিজ্যভিত্তিক এক নতুন রাষ্ট্রের এই প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞান ও দর্শনের কাছ থেকে একটা সাংসারিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজন আশা করেছে, আর তারই দরুন এই বিজ্ঞান ও দর্শনকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।

ডেকার্ট-এর পাঁচ শতাব্দী আগেই দার্শনিক ও চিকিৎসক ইবনে সিনা (আবিসেন্না ৯৮০—১০৩৭) এবং তাঁর পরে বিচারক, বৈজ্ঞানিক ও বিখ্যাত দার্শনিক ইবনে, রুশদ (অ্যাভেরোজ ১১২৬—১১৯৮) ঘোষণা করেছিলেন—হযরতের মুখনিঃসৃত ঐশীবাণী ব্যতীত আর সবকিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করে নিতে হবে। ... এঁরা ছিলেন যুক্তিবাদের প্রথম প্রবর্তক।

ইব্‌নে খালদুনের "প্রোলেগমেনা" (মুকালিমা) পড়তে গিয়ে একজন পাশ্চাত্যবাসীর কাছে মনে হয় তিনি পরবর্তী তিন শতাব্দীর দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলী, ডেকার্ট ও মন্টেসক্যুর অগ্রগামী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসে শুধু নিছক কাহিনী ও বর্ণনা থাকতো—অথচ ইব্‌নে খালদুন চতুর্দশ শতাব্দীতে ব্যাখ্যামূলক ও কার্যকারণসমন্বিত ইতিহাস লেখার ধারণা দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন ঃ

আমাদের উদ্দেশ্য হল এমন একটি নিশ্চিত নিয়ম বার করা, যার দ্বারা ঘটনার মধ্যে মিথ্যা থেকে সত্যকে বাছাই করা যায়। এ এমন এক যন্ত্র, যার দ্বারা ঘটনাকে তুলাদণ্ডে যাচাই করা যায়। এ উদ্দেশ্য সাধনই আমাদের লক্ষ্য।

সাধারণ কার্যকারণের সন্ধানে আমি সর্বাঙ্গীনভাবে মানবমণ্ডলীর রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর কার্যকারণ ও উৎপত্তি বর্ণনা করেছি। যে পর্যালোচনার মধ্যে আমরা এ বিষয়টি নির্ণয় করে চলেছি, সেটি এক নতুন বিজ্ঞানের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে।

ইব্‌নে খালদুন ইতিহাসের একটি দর্শন প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি বিজ্ঞানোচিত ইতিহাসের প্রবর্তন করেন।

— রোজের গারোদি ঃ ইসলামী সভ্যতা, "কাই-এর দ্য কমিউনিজম", অনুবাদ ঃ সৈনিক, ঢাকা, ১ জুলাই, ১৯৫১

ইসলামী জীবনদর্শনের মৌলিক নীতি ঃ ইসলামের মৌলিক নীতিতে কোনও বাক-বিতণ্ডার অবকাশ নেই। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ (কালেমা, নামায, রোযা, হজ, যাকাত) ছাড়া জীবন-দর্শনের মৌলিক নীতি হলো ঃ

তৌহিদ — আল্লাহ্‌র একত্ব।

মালিকিয়াত — আল্লাহ্‌র সাবভৌমত্ব।

খিলাফত—মানবিক খিলাফত (মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা)।

রিসালাত—প্রত্যেক জাতির মধ্যে তৌহিদ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য নবী পাঠানো হয়েছে।— রসুল মুহাম্মদ (স.) শেষ নবী (বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক দিকে সমান দৃষ্টি, যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা)।

ইজ্‌তিহাদ—গবেষণা —পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নীতির রূপায়ণের পন্থা।

নীতি রূপায়ণের সাধারণ পদ্ধতি ঃ

সালাত—নামায ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র—দায়িত্বশীলতা।

যাকাত—বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।

জেহাদ—সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পথে প্রচেষ্টা।

চীনে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা

পাকিস্তানের ইসলামী আদর্শবাদকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা আজ পাকিস্তানের বুকে লাল সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অভিযানে কোমর বেঁধে নেমেছে। যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য পবিত্র কোরান ও মহানবীর (স.) সুন্নাহ্‌র নামে নর-নারী-শিশু-নির্বিশেষে অগণিত মানুষ চরম আত্মত্যাগ করেছে, তাদের পুরুষানুক্রমিক বাস্তুভিটা, এমন কি, তাদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে, সেই রাষ্ট্রই আজ হয়ে পড়েছে তার নিজস্ব বিশ্বাসের মৌল ভিত্তিভূমির প্রতি নির্মম ও নির্লজ্জ আক্রমণের লীলাভূমি। ১৯৪৭ সালের বীর শহীদানের ও ১৯৬৫ সালে কালেমার জন্য পাকিস্তানের যে বীর সন্তানেরা আমাদের চাইতে পাঁচগুণ শক্তিশালী শত্রুকে প্রতিরোধ ও পর্যুদস্ত করতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করলেন, তাঁদের আত্মারা দাবী করছে যে, পাকিস্তান শুধু ইসলামের জন্যই কায়েম থাকবে। আমাদের জন্য একমাত্র ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্তস্থল হচ্ছেন মহানবী ও তাঁর সাহাবাগণ।

আমাদের মধ্যে এমন একদল লোক আছে, যারা জোরেসোরে এই ধারণাটা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে যে, আমাদের সমস্যাদির সমাধানের জন্য সমাজতন্ত্র অপরিহার্য, তারা নিজেদের পিকিংপন্থী বলে জাহির করে এবং চীনে প্রবর্তিত সমাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে অনেক দিক থেকে মিল আছে বলে জনগণের চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে একজন এতদূর পর্যন্ত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, সে মাওকে মুহাম্মদের (স.) সঙ্গে তুলনা করে। কাজেই চীনে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি মাও সে-তুং ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সত্যিকার মনোভাব কি, তাঁর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। চীনা সমাজতন্ত্রের কুৎসিত প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করা ও চীনের মুসলমানদের প্রতি কৃত-অপরাধগুলোর প্রতি দৃষ্ট আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা আশা করি, ইসলাম ও সমাজতন্ত্রকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে ইসলামী সমাজতন্ত্র তৈরি করা যায় বলে সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে যাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন, এই নিবন্ধে উপস্থাপিত বাস্তব ও

মর্মন্তুদ তথ্যাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁরা সেই ভ্রান্তিবিলাসের মোহ থেকে মুক্তি পাবেন। এই দুই আদর্শবাদের মধ্যে শুধু দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছাড়া আর কোন সম্পর্কই কল্পনা করা যায় না।

মার্ক্স ধর্মের উপর আক্রমণ করতে গিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন ঃ "ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম।" লেনিন এই উক্তির ভাবসম্প্রসারণ করতে গিয়ে বলেন, "বিজ্ঞান ও ধর্ম দুটি পরস্পরবিরোধী ধারণা" এবং "কমিউনিস্ট রাষ্ট্র বিজ্ঞানের গৌরব বর্ধনে প্রবৃত্ত হয় এবং সেহেতু কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ও ধর্ম পরস্পরবিরোধী।" চীনের কমিউনিস্টরা এইসব উক্তির সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত। আমরা নীচে একটি সোভিয়েট গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি; চীন সরকারের অনুমোদনক্রমে এই বইটির কয়েকটি চীনা সংস্করণও প্রকাশিত হয় ঃ "ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার অনুগামী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংগঠনাদি কিছু নিত্য বা চিরন্তন বস্তু নয়; ঐতিহাসিক অবস্থাবলীর প্রেক্ষিতেই এগুলোর উদ্ভব ও অস্তিত্ব।" "শোষণভিত্তিক শ্রেণী সমাজে সাধারণ লোক অসহায় বোধ করতে থাকে, আর এই অসহায় বোধ থেকেই তাদের মধ্যে জন্ম নেয় অলৌকিকতা ও মৃত্যুর পরে সুখী জীবনের প্রতি বিশ্বাস।" [৭৭] চীনা কমিউনিস্ট ও শেনসী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন চ্যান্সেলর, প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ তেং চু-মিন বলেন ঃ "মানুষ সকল দুর্বোধ্য ঘটনার মধ্যেই একটা রহস্যবাদের সন্ধান খুঁজে বেড়ায়। এই ভীতির গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয় সম্পূর্ণরূপে মানব-সৃষ্ট বিধাতার ধারণা"। "কাজেই ধর্ম হচ্ছে একান্তভাবে মানুষের আহাম্মকিরই নিদর্শন।" [৭৮]

চীনের কমিউনিস্টরা এই সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলাম শুধু কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের কয়েকটি ধর্মবিশ্বাসের সমষ্টি মাত্র নয়, বরং এমন একটি সার্বজনীন ধর্ম, যা কেবল জাতিগত বৈচিত্র্য নয়, শ্রেণীগত বিরোধেরও ঊর্ধ্বে। চীনে তারা ইসলামের গলা টিপে মারতে উদ্যত হয়েও অত সহজে কামিয়াব হতে পারেনি। ইসলামের সাথে তাদের সংঘর্ষ অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে ১৯৪৯ সাল থেকে। এই সংঘর্ষের রূপ বিচিত্র।

চীনের ৩ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমানের কি গতি হলো?

১৯৩৮ সালে জাতীয়তাবাদী সরকার জানান যে, চীনে মুসলমানদের মোট জনসংখ্যা ৩,৮০,০০,০০০। অথচ, ১৯৫২ সালে কমিউনিস্ট সরকার তাদের

---

77. As in the original
78. As in the original

মোটসংখ্যা মাত্র ১,০০,০০,০০০ বলে উল্লেখ করেন।[৭৯] ১৯৫৮ সালে পুনরায় ঘোষণা করা হয় যে, চীনে দশটি মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছড়িয়ে আছে এবং তাদের সম্মিলিত জনসংখ্যা ন্যূনাধিক এক কোটি হবে।[৮০] চীনের মুসলমানেরা চিরতরে বংশবৃদ্ধিতে ক্ষান্ত দিয়েছে মনে হয়। স্পষ্টতই এই হিসেবগুলো একেবারে মনগড়া, আর এই শুভংকরীর ফাঁকির দ্বিমুখী উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের আত্মিক পরিশোধন করে এমনভাবে তাদেরকে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন হীন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মধ্যে লীন করে ফেলা যে, তাদের আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র থাকবে না। এই প্রচেষ্টার দুটি দিক আছে। এগুলো হচ্ছে ঃ (১) মুসলমানদের সক্রিয় প্রতিরোধকে সামরিক শক্তিবলে দমন করা। এই কার্যক্রমকে সচরাচর 'প্রতিবিপ্লবী' ও বুর্জোয়াদের উপর আক্রমণ বলে অভিহিত করা হয়। (২) মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, সামাজিক বৈষম্য, প্রয়োজনমত সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করা।

কাজাখ মুসলমানদের মর্মন্তুদ কাহিনী

চীনের মুসলমানেরা "সাহসী ও কঠোরশ্রমী লোক। অশ্বারোহণে তাদের পারদর্শিতা অতুলনীয়। সূর্যোদয়ের আগে উঠেই তারা ফজরের নামায আদায় করে এবং সান্ধ্য প্রার্থনার অব্যবহিত পরেই শয্যাগ্রহণ করে। তাদের গ্রামগুলোতে কোন কুকুর-শূয়রের অস্তিত্ব কিংবা জুয়ার আড্ডা, পানশালা বা পতিতালয়ের বালাই নাই। ঘোড়দৌড়, শিকার ও লক্ষ্যভেদ হচ্ছে তাদের প্রিয় প্রমোদক্রীড়া। ইসলাম তাদেরকে চীনের অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অভিষিক্ত করেছে।"[৮১]

মুসলিম অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ করতে গিয়ে বিজয়ী চীনা কমিউনিস্টরা সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ১৯৪৭ সালে কানসু-শানসীতে মুসলিম সেনাবাহিনী কমিউনিস্ট বাহিনীকে পরাজিত করে। কমিউনিস্টরা অস্ত্রের বলে এই এলাকাটি জয় করে নিতে পারেনি। ১৯৫০ সালে সালিশী ও সমঝোতার মাধ্যমে তারা এই অঞ্চলে প্রবেশাধিকার লাভ করে।

---

79. China Handbook, 1954-55

80. *বুরহানকৃত ব্রফণব্র ধভ উদধভট, বুরহান একজন চীনা মুসলিম। উল্লিখিত দশটি বিক্ষিপ্ত মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হচ্ছে কানসু ও হুপই প্রদেশের হুই, সিংকিয়াং-এর উইগুর এবং কাজাখ, কিরঘিজ, তাজিক, তাতার, উজবেক, তুংসিয়াং, সলা ও পাওয়ান।*

81. *হাজী ইউসুফ চাং লিখিত Islam and Communism in China.*

সিংকিয়াং-এ কাজাখ ("যারা কোন প্রভু জানে না") মুসলমানেরা কমিউনিস্টদের সাথে সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কমিউনিস্টরা তাদের শাসন-রজ্জু কষতে শুরু করলে ৪০,০০০ লোক অধ্যুষিত ৬টি কাজাখ উপজাতি তাদের ৬ লক্ষাধিক গো-বাছুরাদি নিয়ে দক্ষিণমুখে অগ্রসর হয়ে তিব্বতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত করে। অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর তাদের মৃতাবশিষ্ট ১০,০০০ জন কানসু পৌঁছতে সক্ষম হয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের ভয়ে তিব্বতীরা তাদের স্বাগত জানাতে অস্বীকার করে। তিব্বতের পথে তারা কমিউনিস্ট জংগী বিমানের হামলার শিকার হয়েছিলো। এক্ষণে তারা নিরুপায় হয়ে হিমালয়ের উচ্চতম ও শীতলতম গিরিবর্ত্মকগুলোর একটি ধরে কাশ্মীরের পথে অগ্রসর হয়। হিমাচলের দারুণ শৈত্যে একের পর এক তাদের শিশু ও বৃদ্ধেরা এবং পরে জোয়ানেরাও মৃত্যুবরণ করতে থাকে। তাদের পশুগুলো সব ধ্বংস হয়ে যায়। মাত্র ৩,০০০ কাজাখ শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়। তারা এখন তুরস্কে বসতি স্থাপন করেছে। তাদের এই ভয়াবহ যাত্রা শেষ করতে এক বছর সময় লেগেছিলো।

তবুও চীনের অভ্যন্তরে ১৯৫১ সালের ২৯ এপ্রিল উরুমচীতে কাজাখ-নেতা উ-সি-মানের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার[৮২] পরেও কাজাখদের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। তাদের এক অংশ পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় নিয়ে সুযোগ পেলেই কমিউনিস্টদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করতে থাকে। একটি মসজিদসংলগ্ন জমি বাজেয়াপ্ত করার পর এই আক্রমণের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে কমিউনিস্টরা তাদের কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৪ সংখ্যা 'সিংকিয়াং জিহ্ পাও'-এ প্রকাশিত রিপোর্টে মনে হয় কাজাখদের প্রতিরোধ তখনো পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। পত্রিকায় জনগণের কাছে আবেদন করা হয় ঃ "আমাদের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিভেদসৃষ্টির চক্রান্তে লিপ্ত কুচক্রীদের মধ্যে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান।" ইতোপূর্বে সিংকিয়াং প্রদেশের ভাইস-চেয়ারম্যান কা-চিন শানের এক রিপোর্টে আরো খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা হয়[৮৩] ঃ "তারা সর্বমোট ২০৪টি নির্বাচন বানচাল চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়। ...১৯৫৪ সালের প্রথমার্ধে ৩,৪২৯ জন প্রতিবিপ্লবীকে খুঁজে বার করা হয়।" এতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই সব প্রতিবিপ্লবী-আবিষ্কার অভিযানের শিকার যারা হয়েছিলো, তারা ইসলামেরই অনুসারী।

---

82. *সিনহুয়া মাসিক পত্রমে, ১৯৫১।*
83. *সিংকিয়াং জিহ্ পাও, ৩০-৯-১৯৫৪।*

উত্তর-পশ্চিম চীন ও পিংলিয়াং-এ বিদ্রোহ

মুসলমানেরা তাদের স্বদেশবাসীর নিকট ধর্ম রক্ষার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানায়। ১৯৫১ সালে চীনের সকল মুসলিম এলাকায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়। একটি চীনা সংবাদপত্রের রিপোর্টে বলা হয় ঃ "মে, জুন ও জুলাই মাসে উত্তর-পশ্চিম চীনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৩৭টি খুন, ১৯টি বিষ প্রয়োগ ও ১৭টি লুঠতরাজের খবর পাওয়া যায়। সিংহাই প্রদেশে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ১৮টি কূপে বিষনিক্ষেপ, খুনখারাবি, ডাকাতি, সশস্ত্র হামলা ও টেলিগ্রাফ-টেলিফোন তার কাটার ঘটনা ঘটে। ২২ ব্যক্তি হতাহত হয়। কানসু প্রদেশ থেকে কৃষি সংস্কারের সময় সশস্ত্র দাঙ্গাসংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। অনুরূপে সিংকিয়াং, শানসি ও নিংসিয়া প্রদেশ থেকে গুজব ছড়ানো, দেয়ালে প্রতিক্রিয়াশীল শ্লোগান লেখা ও অন্যান্য গোলযোগের খবর পাওয়া যায়।"[৮৪]

কানসুর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের চিং নদীর উপকূলবর্তী পিংলিয়াং হুই জাতির সবচাইতে ঘনবসতি অঞ্চলগুলোর অন্যতম। ১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে কমিউনিস্ট কৃষি সংস্কারের আমলে ইমাম চি-হো-এন হুয়ের তত্ত্বাবধানে ন্যাস্ত একটি মসজিদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়। মুসলিম জনতা অস্ত্রধারণ করে রাষ্ট্রের প্রেরিত আমলাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এপ্রিলের মধ্যে সি-চি, কু-ইউরান ও অন্যান্য এলাকায়ও গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট সূত্রের বিবরণে জানা যায় যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সরকারি শস্যাগারসমূহের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয় এবং সি-চি, লি-চুয়ান পাও ও অপর কয়েকটি শহর বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। কমিউনিস্ট "মুক্তি" বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে এবং বিদ্রোহী সেনাপতিরা নিহত হবার পর বিদ্রোহীরা দুর্গম পার্বত্য এলাকায় আত্মগোপন করে। কিন্তু রসদ ফুরিয়ে যাবার ফলে তারা জুলাইয়ের দিকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

কমিউনিস্টদের নয়া কৌশল

চীনা শাসনতন্ত্রের ৮৮ ধারায় সর্বসাধারণের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়, কিন্তু সেইসাথে ধর্মবিরোধী প্রচারণারও অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে এই দ্বিতীয়োক্ত স্বাধীনতাটাই চীনে কার্যকরী করা হয়েছে। লিউ শাও-চি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ঘোষণা করেছিলেন যে, চীনের সংবিধানে

---

84. *সিংকিয়াং জিহ্ পাও, ১৭-১২-৫১।*

'ধর্মের নাম প্রতিবিপ্লবী কার্য-কলাপ' কোনক্রমেই বরদাশ্‌ত করবে না।[৮৫] স্মর্তব্য যে, কমিউনিস্টরা কখনো 'প্রতিবিপ্লবী' কথাটার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার তকলীফ স্বীকার করে না। বাস্তবক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী ব্যক্তিমাত্রেই প্রতিবিপ্লবী বলে চিহ্নিত হয়ে যায়।

সিংকিয়াং, কানসু ও অন্যান্য স্থানে মুসলিম প্রতিরোধের মোকাবেলা করে কমিউনিস্টদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, সম্মুখ সমরে মুসলিম 'সমস্যাটির' 'সমাধান' করা সম্ভব নয়। কাজেই মাও সে-তুং নতুন নীতি নিলেন এবং এই নীতির ভিত্তি হলো দুটি নয়া কৌশল ঃ (১) সমালোচনা ও শিক্ষার মাধ্যমে ঐক্য গড়ে তোলা এবং (২) ব্যক্তিসমষ্টিকে রাষ্ট্রের বাঞ্ছিত আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও পুনর্গঠিত করে তোলা।[৮৬] কমিউনিস্টরা এবার একটা আপাত-সৌহার্দ্যের মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হয় এবং তাদের ও মুসলমানদের মধ্যে যে যে বিষয়ে মিল আছে, সে-সব বিষয়ের উপর জোর দিয়ে প্রচারণা চালিয়ে 'ঐক্য' গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করা। এভাবে তারা কিছুসংখ্যক মুসলিম তরুণকে নিজেদের দলে টানার সুযোগ পায় এবং তাদেরকে স্বজাতির লোকদের মধ্যে কাজে লাগিয়ে দেয়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি— যা 'রূপান্তরকরণ' নামে অভিহিত হয়— একটি কঠোর ও সুশৃঙ্খল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধেরই নামান্তর। বিশাল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অপরিমেয় শক্তি এবং সংবাদপত্রসহ রাষ্ট্রের গোটা প্রচারযন্ত্রটির সমর্থনপুষ্ট কমিউনিস্ট কর্মীরা মুসলমানদের মনোভঙ্গি, আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের মূলভিত্তির উপর দুর্নিবার আঘাত হানার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তারা মুসলমানদের মধ্যে বিস্ময়বিহ্বলতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে শুরু করে।

চীন ইসলামী সমিতি

মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুপ্রবেশের এবং আরব ও মুসলিম বিশ্বে চীনের একটা সুন্দর ইমেজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়। এর চরিত্রটা এই থেকেই অনুমান করা যায় যে, এর প্রতিষ্ঠাতারা সবাই ছিলেন—হয় কমিউনিস্ট পার্টির, না হয় পার্টি নিয়ন্ত্রিত অন্য কোন সংস্থার সদস্য।[৮৭] দুইজন সুপরিচিত মুসলমানকেও সদস্য করে নেয়া হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁদের নামসর্বস্ব সদস্যে পরিণত করা হয়।

---

85. *As in the orginal.*
86. *As in the orginal.*
87. *জেন মিন জিহ্ পাও, ৫–৮–১৯৫২।*

এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ঘোষণা করতে গিয়ে বলা হয় ঃ "চীনে ইসলামী সমিতির লক্ষ্য হচ্ছে, পিতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা দৃঢ় করে তোলা এবং সরকারকে ধর্মসংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়নে সাহায্য করা।[৮৮] এই সমিতির মহত্তম কীর্তি হচ্ছে আরব দেশগুলোতে প্রচারের উদ্দেশ্যে মাও-প্রণীত 'চীনা বিপ্লব ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, 'লোকায়ত্ত গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে' প্রভৃতি পুস্তকের আরবি অনুবাদ।

কোরানের নতুন ব্যাখ্যা

১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে কোরানের একটি আনুষ্ঠানিক চীনা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদিত সংস্করণের মুখবন্ধে অনুবাদক মার্ক্স বাদ-লেনিনবাদের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য কোরান থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অন্যতম মৌলিক তত্ত্ব হচ্ছে এই যে, "অস্তিত্বের পরিপার্শ্বই হচ্ছে ধারণার উৎস" এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রায়োগিক বা ফলিত অভিজ্ঞতা থেকেই সত্য আবিষ্কৃত হয় এবং বাস্তবে প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সেই সত্যের প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি লাভ সম্ভব হয়। (কোরান অবিশ্যি বলেন যে, সত্য চিরন্তন এবং নবীদের মাধ্যমে ওহীরূপে পৃথিবীতে তার স্বরূপ প্রতিভাত হয়।) কোরানের (১৬ ঃ ৭৮) উল্লেখ করে অনুবাদক মন্তব্য করেন ঃ "কোরান এ-কথা স্বীকার করেন যে, মানুষের জ্ঞান বহির্জগৎ থেকেই আসে। সূরা ১০ ঃ ৩৬-এর উল্লেখ করে তিনি আবার মন্তব্য করেন ঃ "কোরানে স্বীকার করা হয়েছে যে, নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা সম্ভব এবং আত্মনিষ্ঠ বা মনোজাগতিক ঘটনাসম্ভূত জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনের উৎস থেকেই আসে।"[৮৯] অন্যান্য সূরার উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করা হয় ঃ "বিশ্বজনীন প্রেম বলতে সৎলোকের প্রতি প্রীতিবোধও বোঝায়। জনগণের শত্রু যারা ... তাদের সাথে আমাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের প্রাপ্য দণ্ডদানে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।"[৯০]

এইভাবে পবিত্র কোরানের এই ভাষ্যের মধ্য দিয়ে চতুরতার সঙ্গে পার-স্পরিক গোয়েন্দাবৃত্তি ও "প্রতিবিপ্লবীদের" নির্মম নিষ্পেষণের সাফাই দেয়া হয়েছে।

---

৮৪. *জেন মিন জিহ্ পাও, ৫-৮-১৯৫২।*

৮৯. *অনুবাদক মা চিয়েন। সাংহাই কমার্শিয়াল প্রেস, ১৯৫২। পৃষ্ঠা ১১-১২ ও ৩০।*

৯০. *অনুবাদক মা চিয়েন। সাংহাই কমার্শিয়াল প্রেস, ১৯৫২। পৃষ্ঠা ১১-১২ ও ৩০।*

চীনে 'ধর্মীয় স্বাধীনতর 'স্বরূপ

চীনে ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাবের ব্যাপারটি চক্ষুষ্মান পর্যটকদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। জাকার্তার দৈনিক 'দূত মাশারাকাত' পত্রিকার মুসলিম সম্পাদক আসা বাফাগিহ্ চীন সফরের পর লেখেন ঃ "মসজিদ ও গির্জার বাইরে ধর্মপ্রচার নিষিদ্ধ।" মসজিদের ভেতরে তিনি যা দেখতে পান, সে সম্পর্কে বলেন ঃ "তুং সে পাইলাও মসজিদের ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেলাম, বেশকিছু লোক মসজিদের বারান্দায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়নরত। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, এরা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়েই পড়াশোনায় এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরে দেখতে পেলাম, এদের এমন গভীর অভিনিবেশের বিষয় ছিলো সমাজ সংগঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব, অর্থনীতি সম্পর্কে কমিউনিস্টদের চিন্তাধারা ও মাও সে-তুংয়ের রচনাবলী।[৯১] অন্যান্য মুসলিম সফরকারীও তাঁর এই উক্তির সমর্থন করেন।[৯২]

মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশাল চীনা জনসংখ্যার মধ্যে বেমালুম মিলিয়ে ফেলার জন্যেও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মুসলমানেরা যাতে ধর্মের অনুশাসনগত কারণে খাদ্যের ব্যাপারে বাছবিচার করতে না পারে, তার জন্য বিশেষ তৎপরতা চালানো হয়। সব মসজিদসংলগ্ন কসাইখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান থেকে মাংস সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ সবাই জানেন যে, এগুলোতে খাদ্য বাছবিচারের বালাই নাই। কাজেই মুসলমানদের হয় হারাম মাংস খেতে হবে, না হয়, নিরামিষাশী হতে হবে। রাষ্ট্রের উদ্যোগে আহূত কনভেনশনগুলোতে এবং পিপ্‌ল্‌স লিবারেশন আর্মির মুসলিম সৈনিকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কোন মুসলিম উৎসব পালনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়। স্কুলকলেজে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ; পক্ষান্তরে, সুপরিকল্পিতভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শপ্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারের বিঘোষিত নীতি হচ্ছে ঃ " বিভিন্ন জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও অব্যাহত প্রগতির জন্য স্কুলসমূহের উপর পার্টির নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।"[৯৩]

মুসলমানদের বেশির ভাগই ছিলো ছোটখাটো দোকানী ও এই ধরনের

---

91. *As in the original.*
92. *As in the original.*
93. *দৈনিক কোয়াংমিং, ৩-৯-৬২।*

ব্যবসায়ে লিপ্ত। কিন্তু সমাজতন্ত্রীকরণের ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে এদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তা'ছাড়া মুসলমান এলাকাগুলোতে হীন 'উপ-নিবেশবাদীরা বিপুলসংখ্যায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ওরা সিংকিয়াং-এর মূল মুসলমান অধিবাসীদের হীনচক্ষে দেখে। কমিউনিস্টদের আরেকটি সাফল্যমণ্ডিত কৌশল হচ্ছে অনুজাতিদের জন্য এমনভাবে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা করা, যাতে তারা নিজেদের প্রাচীন পিতৃভূমিতেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। যেমন ধরুন, মিং সিয়া হুই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। হুইদের জন্যই এই অঞ্চলটির প্রতিষ্ঠা। অথচ এমন কায়দায় এই অঞ্চলের এলাকা নির্ধারণ করা হয় যে, হুইদের সংখ্যা সেই এলাকার ২০ লাখ লোকের মাত্র এক তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়।[৯৪]

কমিউনিস্ট নীতির ব্যর্থতা

১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরী বিপ্লবের সমকালেই চীনে মুসলিম-বিরোধী ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নীতি চরমে ওঠে। মাও সেতুং দূরদর্শিতার সাথে উপলব্ধি করতে পারেন যে, নিরবচ্ছিন্ন দমন নীতির ফলে হাঙ্গেরীর মতো চীনেও ব্যাপক জনসাধারণ পার্টির প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি আপেক্ষিক উদারতার নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন এবং এই ভিত্তিতেই "শত ফুল ফুটতে দাও, শত মতের প্রকাশ হতে দাও" শ্লোগানটি উত্তোলন করেন। (পরে সংবাদপত্রের খবর থেকে জানা যায়, এই শ্লোগানটিও ছিলো সরকার-বিরোধীদের সনাক্ত করার জন্য পাতা একটি ফাঁদমাত্র) সুপ্রীম স্টেট কনফারেন্সের ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ তারিখের অধিবেশনে প্রদত্ত বিখ্যাত ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন ঃ "সরকারি হুকুম জারী করে ধর্মকে উচ্ছেদ করা যাবে না কিংবা জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস দূর করা যাবে না। ... আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শরণ নিতে হবে। সে পদ্ধতি হচ্ছে আলোচনা, সমালোচনা, যুক্তি প্রদর্শন ও শিক্ষার পদ্ধতি—বলপ্রয়োগের বা গোয়ার্তুমির পদ্ধতি নয়।"[৯৫] এই ভাষণের পরেই জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানানো হয় অকপটে কমিউনিস্ট পদ্ধতির গলৎগুলো দেখিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু এর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা ছিলো কমিউনিস্টদের কল্পনার অতীত। চারদিক থেকে সমালোচনার সয়লাভ বয়ে যায় (এগুলো চীনা সংবাদপত্রগুলোতেও প্রকাশ করা হয়)। সমালোচকরা শুধু খুঁটিনাটি ব্যাপারে অভিযোগ তুলেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা কমিউনিস্ট পার্টি ও তার

---

94. *পিকিং থেকে প্রচারিত নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর খবর থেকে, ১৬-৮-৫৯।*
95. *As in orginal.*

নীতির প্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে।

অচিরকাল মধ্যেই "দক্ষিণপন্থী"ও "প্রতিবিপ্লবীদের" বিরুদ্ধে হিংসাত্মক শুদ্ধি অভিযান শুরু করা হয়। কমিউনিস্ট সূত্রের খবরে প্রকাশ, এই সময় মুসলিম এলাকাগুলোতে বিদ্রোহ, আইন অমান্য, পার্টি বিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে জেহাদ শুরু হয়ে যায়। লিউ শিং মিং নামে জনৈক ইমামকে ধর্মীয় অভিভাষণের আবরণে "অপরাধমূলক" বক্তৃতা করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। তিনি দাবী করেছিলেন যে, চীনে সত্যিকার অর্থে কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা নাই। কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতাকারী ইমামদের তিনি হুইজাতির কলংক বলে অভিহিত করেন, কারণ তারা "উচ্চ পদের মোহে ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়েছে।"[৯৬] তবে সহযোগিতাকারীরা যে পুরোপুরি আন্তরিকভাবে কমিউনিস্টদের সমর্থক ছিলো, এমন মনে করা যায় না। হুই জাতির প্রতিনিধি মা চাং চীনা জাতীয় গণরাজনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তাঁর 'সমালোচনা' করা হয় এবং তাঁর স্বরূপ উদঘাটনের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পেশ করা হয়। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি পর পর চারটি প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহে সমর্থন যুগিয়েছে—২টি ১৯৫০ ও ১৯৫২ সালে এবং ২টি ১৯৫৮ সালের বসন্তকালে।[৯৭] "১৯৫৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে সাংহাইয়ের হুয়া লুং এলাকায় প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের অভিযোগে ১৯ জন হুই মুসলমানকে প্রকাশ্যে বিচার করা হয়। বিচারে ৫ জনের মৃত্যুদণ্ড হয় এবং অবশিষ্ট ১৪ জনকে কারাদণ্ডে বা "শ্রমের মাধ্যমে শুদ্ধি" দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৯৮]

সাংস্কৃতিক নিষ্পেশন অব্যাহত রয়েছে

১৯৫৮ সালে সরকার সিংকিয়াংয়ের উত্তর স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় আরবি হরফের পরিবর্তে লাতিন বর্ণমালা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করেন। একাধারে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তা ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র বিনষ্ট করে দেয়াই ছিলো এই চক্রান্তের লক্ষ্য। ২১ জুন (১৯৫৮) উরুমচি থেকে প্রচারিত এক ভাষণে স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মকর্তা এই পরিকল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

---

96. *দৈনিক কোয়াং সিং, ১৮-৫-১৯৫৮।*

97. *নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ইঙ্কুয়ান, ১৭-১০-৫৮।*

98. *দৈনিক সাংহাই, ১৫-১০-৫৮।*

প্রতিরোধও অব্যাহত রয়েছে

মুসলিম বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এবং চীনা প্রচারণার সুবাদে বিভ্রান্ত মুসলিমবিশ্ব কর্তৃক নিজের নির্মম ভাগ্যের নিকট সমর্পিত হওয়া সত্ত্বেও চীনের মুসলিম সম্প্রদায় বিচিত্র পন্থায় কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ করে চলেছে। তারা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিস্মরণে পরাঙ্মুখ। ১৯৫৮ সালের ১৬ জানুয়ারি নয়াচীন বার্তা বিতরণ প্রতিষ্ঠান কানসু জাতিসংক্রান্ত বিষয়াদি কমিটির অধিবেশনের এক দীর্ঘ রিপোর্ট প্রচার করে। এই অধিবেশনের লক্ষ্য ছিলো মুসলমানদের অব্যাহত জাতীয় ভাবধারণাকে অবিরত কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে প্রতিহত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। রিপোর্টে যে-সব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়, তার মধ্যে ছিলো ঃ "এই সভার মতে, কানসুর সংখ্যালঘু এলাকাগুলোতে স্থানীয় জাতিগত ভাবধারণা শুধু ব্যাপক নয়, অত্যন্ত প্রবল! এই ধরনের ভাবধারণা কয়েকটি বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। যেমন ঃ

১। পার্টির নেতৃত্ব ও বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করা। পরিবর্তনের ফলে তাদের মসজিদের দরজায় তালা পড়ছে বলে তারা অভিযোগ করে। সমবায় সংস্থাগুলো থেকে যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয়, সেগুলো মানুষের খাবার উপযুক্ত নয় বলে মিথ্যা গুজব ছড়ানো হয়েছে। বিস্তীর্ণ পশুচারণ ক্ষেত্রগুলোতে সমাজতান্ত্রিক নববিধানের বিরোধিতা করে কিছু লোক সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষগুলো টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠেছে।

২। যে-সব দেশপ্রেমিক পার্টিতে যোগদান করেছেন, তাঁদের ধর্মদ্রোহী বলে নিন্দা করা হচ্ছে।

৩। দেশের সংহতি বিনাশকারী বক্তৃতা-বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে।

৪। কিছুসংখ্যক লোক পার্টির মহান আদর্শ ও পিতৃভূমির অখণ্ড ঐক্য উপেক্ষা করে এই ধারণার প্রচার করছে যে, বিশ্বের হুইরা এক অভিন্ন পরিবার এবং তাদের ভাষা আরবি। তারা কোরানকে তাদের জীবনদর্শন বলে দাবী করে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করছে। কোরান একটি ধর্মের পুঁথিমাত্র। এই পুঁথি জনগণের রাজনৈতিক জীবনদর্শনের স্থান নিতে পারে না, এবং সে জীবনদর্শন সমাজতন্ত্র। ... হুই অধ্যুষিত এলাকায় কিছু লোক আরবিকে স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষণীয় বিষয়সূচির অন্তর্ভুক্ত করে। এটা রাষ্ট্রের শিক্ষানীতিকে ধর্মের প্যাঁচে গুলিয়ে ফেলারই অপপ্রয়াসমাত্র। আরবি শিক্ষা ধর্মশিক্ষারই অঙ্গ এবং তার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে মসজিদ।... আরবি শিখে হুই জাতির কোন উপকার হবে না।

কানসুর দৈনিক 'লানচু'-তে ১৯৫৮ সালের ২৩ জানুয়ারি সংখ্যায় মা চাং নান-এর লেখা যে চমকপ্রদ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়, আমরা নীচে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি ঃ "ধর্মসংক্রান্ত নীতি কার্যে প্রয়োগ করতে গিয়ে স্থানীয় কর্মীরা 'নিরাপত্তা' ও 'স্বাধিকার'-এর উপর এতো বেশি জোর দেয় যে, তাতে মনে হয় যেনো ধর্ম এমন একটা চীজ, যা একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নিরাপত্তাকে এতো বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, তার সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় মহলে অনেক লোক পিতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা বা আইনের বাধ্যবাধকতার কোন তোয়াক্কা রাখে না। তারা অবাধে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য-ব্যবস্থা নস্যাৎ করে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করছে এবং প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। 'স্বাধিকারে'র সীমা এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে যে, যার যা' খুশী, প্রচার করায় আর কোন বাধা নাই। তারা ধর্মীয় দাতব্য কর দাবী করে এবং নিজেদের ধর্মে বিশ্বাসের স্বাধীনতা পূর্ণতঃ ভোগ করে অপরকে বিশ্বাস না করার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে চায়।...ব্যাপার এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, প্রতিবিপ্লবীদের দমন কার্যেও বাধা দেয়া হয় এই যুক্তিতে যে, তাতে জাতীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করা হয়। মোদ্দাকথা এই যে, এইসব লোক পার্টির নেতৃত্ব অস্বীকার করে।"

মা চাং নান মশায় স্পষ্টতঃই খুব বিরক্ত হয়েছেন। তবে তাঁর খেদোক্তি থেকেই আমরা চীনা মুসলমানদের অনড় আদর্শবাদ ও মর্মন্তুদ দুর্গতির আভাস পাই। "তারা জাহির করে বেড়ায় যে, তাদের পক্ষে আর চীনে থাকা সম্ভব নয়। তাদের বেহায়াপনা এমন চরমে পৌঁছেছে যে, তারা আরবে গিয়ে বসতি স্থাপনের আশায় সরকারের কাছে দেশত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করে। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ইমামদের সরকার কায়েম করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে বলেও স্পর্ধা দেখায়!"

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্রোহ

১৯৫৮ সালের মে মাসে পিকিং পিপ্‌লস ডেইলী হুনানে একটি বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করে। পত্রিকায় বিদ্রোহের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয় নাই; তবে স্বীকার করা হয় যে, এতে বহু লোক দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দান করেন মুসলিম নেতা ইউ আও চাং সু। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানিয়ে জনগণকে হুনানের জিলা সদরদফতর ও অন্যান্য শহর দখল করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে প্ররোচিত করেন বলে জানা যায়। অপর একটি জিলায় "কয়েকজন ইমাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি ক্ষুদে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন এবং কমিউনিস্ট সরকার একেবারেই বদখৎ বলে ঘোষণা করেন।"

সিংকিয়াংয়ে কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থার সম্প্রসারণ সর্বসাধারণ, এমনকি কমিউনিস্ট সমর্থক বলে পরিচিত ব্যক্তিরাও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কমিউনিস্টরা ব্যাপক তদন্তকার্য শুরু করে এবং ১৯৫৮ সালের জুন মাসে পিকিং পিপ্‌ল্‌স ডেইলী ঘোষণা করে যে, সিংকিয়াং প্রশাসন সংস্থা থেকে ৫ ব্যক্তিকে উৎখাত করা হয়েছে এবং পার্টি থেকেও তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উরুমচির মেয়র আহ্ সাতে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট চীনের সম্পর্কের সাম্প্রতিক অবনতির সুযোগে সিংকিয়াংয়ের মুসলমানেরা আবার নতুন উদ্যমে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অগ্রসর হয়। ১৯৬২ সালের মে মাসে মুসলমানেরা তাদের অঞ্চল থেকে চীনে খাদ্যশস্য প্রেরণে বাধা দিলে তাদের কয়েকজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর ফলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। হাজার হাজার মুসলমান মার্চ করে সোভিয়েট কাউন্সিল হাউসে গমন করে এবং চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অস্ত্র দাবী করে। সোভিয়েট অফিসারেরা তাদের দাবী প্রত্যাখান করে; তবে বহু মুসলমান সীমান্ত পার হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে চলে যায় এবং সেখানে খাদ্য ও আশ্রয় লাভ করে। পিকিং রেডিও ১৯৬৩ সালের শরৎকালে এই তথ্যটি ঘোষণা করে! সেই বছরই একটি চীনা সাময়িকী প্রকাশ করে ঃ "নিংসিয়া হুই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে।"[৯৯]

সত্য বনাম সমাজতান্ত্রিক প্রচারণা

আমরা এই নিবন্ধে যে-সব তথ্য পরিবেশন করেছি, তার বেশির ভাগই চীনের আভ্যন্তরীণ প্রচারণার জন্য প্রকাশিত বিভিন্ন চীনা পত্রিকা থেকে সংকলিত; চীনত্যাগী মোহাজেররা চোরাইভাবে এগুলো হংকং ও অন্যান্য স্থানে নিয়ে আস। বহির্জগতে চীনারা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে বেড়ায় যে, চীনে মুসলমানেরা অত্যন্ত সুখে আছে। একটি পত্রিকার মতে কাজাখরা এতো সুখে আছে যে, তাদের ওষ্ঠপ্রান্ত থেকে আপনি আপনি গানের কলি বেরিয়ে আসে ঃ

"স্বাদে ও গন্ধে অপূর্ব

কাজাখের খাদ্য প্রতিটি শস্যের কণা।

মধুহেন মিষ্টি সুন্দর তার জীবন।

---

99. মাসিকপত্র Unity of Nationalities, মে, ১৯৬৩।

কমিউন আমাদের দিয়েছে

আমাদের প্রাপ্য শস্যের ন্যায্য অংশ।

ঘোটকী স্তনের অমৃতধারা

দিক আমাদের উৎসবের পেয়ালা ভরে—

গাহি সুখী জীবনের জয়গান।

আর গাহি—

আমাদের ত্রাতা

মহাচীনের নয়নমণি

সাম্যবাদী দলের জয়গান।"[১০০]

এইদিকে পাকিস্তানের সমাজতান্ত্রিক চমুরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, চীনে মুসলিম নির্যাতনের কাহিনীর পেছনে কোন সত্যতা নাই। এই নরাধমেরা লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে চীনা সমাজতন্ত্র ইসলামেরই তুল্যমূল্য এবং মাও (খোদা আমাদের বাঁচাও) ও মুহাম্মদের (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) মধ্যে কোন তফাৎ নাই বলে দাবী করে।

এইমাত্র সেদিন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিশেষ উপদেষ্টার স্ত্রী বেগম ফিদা হাসানের চীন সফরকালে চীনের প্রধানমন্ত্রী তাঁর কাছে মন্তব্য করেন যে, চীনের মুসলিম রমণীরা এখনো পশ্চাৎপদ এবং মহান সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচিতে সহযোগিতাদানে পরাঙ্‌মুখ।

পাকিস্তানের বুকে যারা নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রের পতাকা উত্তোলন করতে চায়, পাকিস্তানের জনগণ ইসলামের সেই শত্রুদের আসল স্বরূপটি চিনে নিতে পারবেন বলে আমরা আশা করি।

---

100. *The People's Daily, 13—11—1963.*

সোভিয়েট ইউনিয়নে ইসলাম

... মালাউনেরা মিথ্যা যুক্তির ভনিতা দিয়ে সত্যকে গুলিয়ে ফেলতে চায়, আমার ওহী আর আমার হুঁশিয়ারীর প্রতি উপেক্ষার হাসি হাসে তারা।

—আল-কোরান।

সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রচলিত সংখ্যাবহুল ধর্মগুলোর মধ্যে গুরুত্বের মূল্যায়নের দিক থেকে ইসলামের মতো দুষ্কর আর দ্বিতীয়টি নেই। ১৯৫৯ সালের সোভিয়েট আদমশুমারী অনুসারে বংশানুক্রমিকভাবে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী জাতিসমূহের লোকসংখ্যা ছিলো ২,৪০,০০,০০০। ধর্মীয় আনুগত্য ও ধর্মীয় অনুশাসন পালনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংখ্যার তাৎপর্য কি, তার একটা আনুমানিক সদুত্তর খুঁজে পাওয়াও দুঃসাধ্য। সোভিয়েট ইউনিয়নের যে-সব এলাকায় মুসলমানেরা সংখ্যাবহুল, সে-সব এলাকায় বিদেশী সফরকারীদের যেতে দেয়া হয় না কিংবা হলেও গিয়ে থাকতে দেয়া হয় না। ফলে তারা যে-সব ধারণা নিয়ে আসে, তা নিতান্তই ভাসা ভাসা এবং গুটি কয়েক প্রশাসনিক এলাকা ও পর্যটক-কেন্দ্রের বিবরণসর্বস্ব। সোভিয়েট মুসলমানেরা নিজেরাও তাদের সমস্যাদি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানার্জনে বিশেষ সাহায্য করছে না। রাশ্যান অর্থোডক্স চার্চ, কাউন্সিল অব এভানজেলিক্যাল ক্রিশ্চিয়ান্স (ব্যাপটিস্টস) বা আর্মেনিয়ান চার্চের মতো কোন তথ্যবহ পুস্তিকা রচনায়ও তারা অভ্যস্ত নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে ইসলামের অবস্থা সম্পর্কে বহু পরস্পরবিরোধী মতের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, সোভিয়েট ইসলাম প্রভাবে ও অনুসারী সংখ্যায় নগণ্য, কাজেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়; আবার অন্য কেউ কেউ মনে করেন, সেখানে ইসলাম এখনো একটি জোরদার কমিউনিস্ট বিরোধী শক্তি। কমিউনিস্টসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, সংগঠনগতভাবে ইসলাম সোভিয়েট শাসনের ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু তার মানে এই হতে পারে না যে, রুশ মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা দুর্বল হয়ে পড়েছে। মুহাম্মদ (স.) চার্চের মতো কোন ধর্মীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেননি, তিনি একটি

ধর্মবিশ্বাসের জন্মলাভে ধাত্রীত্ব করেছেন মাত্র। কাজেই ইসলাম কোন সমাজে সাংগঠনিক আকার ছাড়াও টিকে থাকতে পারে এবং তেমনভাবে বহু ক্ষেত্রে টিকেছেও। যাজকশ্রেণীর স্তরানুক্রমিক মান ও কেন্দ্রানুগ ধর্মসংস্থার এখতিয়ারের প্রশ্ন ক্রিশ্চিয়ানদের মতো মুসলমানদের ক্ষেত্রে ওঠে না। পোপদের বাদ দিয়ে ক্যাথলিক চার্চের ইতিহাস লেখা যায় না; প্যাট্রিয়ার্ক ও মেট্রোপলিটানদের বাদ দিয়ে অর্থোডক্স চার্চের ইতিহাস রচনার প্রয়াস কল্পনার ভ্রান্তিবিলাসমাত্র। কিন্তু ইসলামের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। শেখ ও মোল্লাদের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু তাঁদের বাদ দিয়ে ইসলামের অস্তিত্ব মোটেই কল্পনাতীত নয়। কাজেই সোভিয়েট ইউনিয়নে ইসলামের ভাগ্য নির্ণয় করতে হলে বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার উপরিস্তর ছেড়ে নজর দিতে হবে আরো গভীরে, যেখানে রেজিস্ট্রার করা মসজিদ ও সরকারি অনুমোদনধন্য মোল্লা ছাড়াও ইসলাম বেঁচে আছে। এই পর্যায়ে ইসলাম বেঁচে আছে কোরানের মৌলিক শিক্ষায় বিশ্বাস, ইসলামী পবিত্র দিবসসমূহ উদ্‌যাপন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। বহুক্ষেত্রেই ইসলামী ও প্রাক-ইসলাম বিশ্বাস পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নাই, কারণ ধর্মবিদ ও নৃতত্ত্ববিদদের মতের প্রতিকূলতাসত্ত্বেও তারা পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করে নেয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে সরকারি ও বেসরকারি ইসলামের মধ্যে যে বিভেদ বিদ্যমান, সেটাই প্রণিদানযোগ্য, অন্যত্র বিশ্বাসগত কারণে ইসলামপন্থীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিভেদ লক্ষিত হয়, সোভিয়েট ইউনিয়নে তার কোন গুরুত্ব নাই।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেতরের ও বাইরের মুসলিম জাতিদের প্রতি কমিউনিস্ট নীতির প্রয়োগ কৌশল সময় ও অবস্থানুসারে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। কাজেই সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকারিভাবে ইসলামের যে চিত্র অঙ্কন করে, তাতে সময়ের প্রয়োজনে রং ও রেখার বিন্যাসেও ইতর বিশেষ ঘটে থাকে। কিন্তু যে বিষয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না, সে হচ্ছে যে, ইসলাম ও কমিউনিজম মূলগত চরিত্রের দিক থেকে পরস্পর বিরোধী। দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা মুসলমানদের প্রতি কি নীতি গ্রহণ করে, সেটা অবিশ্যি আলাদা কথা। কখনো হয়তো তারা সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে, আবার কখনো হয়তো ইসলাম প্রবর্তিত 'কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তারা সর্বাত্মক আঘাত হানে। মুসলিমদের প্রতি অনুসৃত নীতিতেও সোভিয়েট কমিউনিস্টরা তাদের চিরাচরিত অগ্রবিবেচ্যতার আদর্শে পরিচালিত হয়; তারা সর্বহারাদের বিপ্লব ও মুক্তির আদর্শকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে অন্যান্য সমস্যাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বলে বিবেচনা করে। সোভিয়েট নাস্তিক্যবাদ যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শবাদ নয় বরং মার্ক্সিজম-লেনিনিজম নামধেয়

একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শবাদী সমাজপদ্ধতির অঙ্গমাত্র, একথাটি মনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারবো যে, তাদের মুসলিম নীতির এই আপাত স্ব-বিরোধিতা কিছুমাত্র বিস্ময়কর বা চাঞ্চল্যকর নয়।

বলশেভিকরা ক্ষমতা দখলের পর সোভিয়েট প্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে অনিবার্য সংঘর্ষটি স্থগিত রাখার চেষ্টা করেছিলো । তখন তারা ইয়োরোপীয় রাশিয়ায় তাদের ক্ষমতার বুনিয়াদ মজবুত করার চেষ্টায় এতো বেশি ব্যস্ত ছিলো যে, ইসলাম সমস্যাটি মোকাবেলা করার ফুরসৎ তাদের ছিলো না। উত্তর-ককেসাস ও তুর্কিস্তানের মুসলিম ধর্মীয় সমাজ সংবিধান ও শিক্ষা ব্যবস্থার মুখোমুখি হবার আগে তারা রাশ্যান চার্চের প্রভাব ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। আরেকটি অসুবিধা ছিলো, মুসলিম শিবিরে তাদের পর্যাপ্তসংখ্যক মিত্রের অভাব। প্রথম কয়েক বছর যাবৎ কমিউনিস্ট পার্টিতে মুসলিম সদস্যের সংখ্যা ছিলো নগণ্য, তাদের মধ্যে ধর্মবিরোধী (তথা মুসলিম বিরোধী) প্রচারণায় জড়িত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্যা ছিলো আরো অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া, মুসলিমবহুল দেশগুলোতেও কমিউনিস্ট বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে সোভিয়েট কমিউনিস্টদের আশা ছিলো। এইসব নানাকারণে প্রথম কয়েক বছর মুসলমানদের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিলো না।

ইসলামের প্রতি কমিউনিস্টদের এই প্রাথমিক মনোভাবের ফলে কিছু পরিভাষাগত বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়। সেই যুগে সোভিয়েট কমিউনিস্টরা 'মুসলিম' কথাটা অনেকটা ধর্মনিরপেক্ষ অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করে। এই অর্থ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও গৃহীত ছিলো। মুসলিম বলতে তাঁরা বুঝতেন সংস্কৃতিগত ও ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিসমষ্টি; তারা আবশ্যিকভাবে মুহাম্মদের ধর্মের অনুসারী হবে, এ ধারণা তারা পোষণ করতেন না। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৯১৭ সালে লেনিন ও স্তালিন যখন 'রাশ্যান মুসলিমদের' ও 'প্রাচ্যের মুসলিমদের' কাছে 'বিশ্বের নব বিধানের কাজে নৈতিক ও বাস্তব সাহায্যদানের' আবেদন জানান, তখন তাঁরা মুসলমানদের শুধু ঔপনিবেশিক নির্যাতনে জর্জরিত মানুষ হিসেবেই ভেবেছিলেন, মহানবীর ভক্ত অনুসারী হিসেবে নয়। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, এই আবেদনের ফলে মুসলমানেরা এই সিদ্ধান্ত করে যে, কমিউনিস্ট নেতারা তাদের বন্ধু।

বিশেষ করে লেনিনের কাছে ইসলাম ও মুসলমানেরা ছিলো একটা অজ্ঞাত শক্তি। অজ্ঞাত শক্তির প্রাপ্য সম্মানই তিনি তাদের দিতেন। তাঁর এই মনোভাবেরই

শরীক ছিলেন সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকের প্রথম প্রেসিডেন্ট জিনোভিয়েভ, এবং মিখাইল কালিনিন— একজন কমিউনিস্ট হিসেবে ধর্মীয় প্রশ্নে যাঁর সতর্ক ও সহিষ্ণু মনোভাব ছিলো অসাধারণ। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত রাশ্যান কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে লেনিন সোভিয়েট ইউনিয়নের ইসলাম-নীতি নির্ধারণ করেন। তাঁর এই নীতির অন্তর্বস্তু একটিমাত্র কথায় ব্যক্ত করা যায় ঃ "অপেক্ষা করো! কিরঘিজ, উজবেক, তাজিক ও তুর্কমেনিয়ান প্রমুখ জাতিদের ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি, যারা এখনো মোল্লা প্রভাবের কুহকে আচ্ছন্ন? এখানে রাশিয়ায় পোপদের সম্পর্কে জনগণের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার স্মৃতির সুবাদে আমরা পোপতন্ত্রের উৎখাত করতে পেরেছি। কিন্তু আপনারা জানেন, সিবিল ম্যারেজ সংক্রান্ত ডিক্রীটি কার্যকরী করার পথে এখনো কত রকমের অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত জাতিদের কাছে গিয়ে আমরা বলতে পরি, 'তোমাদের শোষকদের আমরা খতম করবো?' আমরা তা' পারি না; কারণ তারা এখনো পুরোপুরি মোল্লাদের কবলে রয়েছে। আমাদেরকে প্রত্যেক জাতির স্বকীয় বিকাশ ধারার এবং সর্বহারা ও বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বন্দ্ব প্রকট হওয়ার অপেক্ষা করতে হবে।"[১০১]

লেনিন অবিশ্যি ধর্মকে শোষণ বলেই জানতেন এবং যাজকশ্রেণী ও মোল্লাদের মনে করতেন বুর্জোয়া। কিন্তু তাঁর বাণীর নির্গলিতার্থ ছিলো সরল। তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, সোভিয়েট শাসনের শৈশবাবস্থায় ইসলাম সমস্যার মোকাবেলা করার শক্তি ও সুযোগ কোনটাই কমিউনিস্টদের ছিলো না। কোন কোন কমিউনিস্ট নেতা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মনে করতেন যে, ইসলাম দমন যে শুধু আপাততঃ স্থগিত রাখতে হবে, তাই নয়, বরং আপাততঃ চাই কি মোল্লাদের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ফলে একটা হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। একদিকে রাশ্যার খ্রিস্টানপ্রধান এলাকাগুলোতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করা হয়। অপরদিকে কোন কোন মুসলিম এলাকাতে (যথা— দাগিস্তানে) শরীয়ত আদালতসমূহের প্রতি স্বীকৃতিদানের মনোভাব প্রকাশ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে বহির্বিশ্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। কট্টর মার্ক্সবাদী দল 'জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস-ও এই অভিযোগ উত্থাপন করে রাশ্যার তীব্র নিন্দা করে। এই দলকে তৃতীয় আন্তর্জাতিকে ভিড়াবার জন্য মস্কো চেষ্টিত ছিলো। জিনোভিয়েভ

---

101. *V.I. Lenin, The National and National-Colonial Question. Moscow, 1956. PP. 478—9.*

স্বয়ং ১৯২০-এর অক্টোবর হ্যালে-তে অনুষ্ঠিত এই দলের কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন। জার্মান বামপন্থী চরমপন্থীরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে 'খিবার মোল্লাদের' প্রতি কোমলতার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করে। ('খিবার মোল্লাদের কথাকয়টি আক্ষরিক অর্থে না নিয়ে রূপক হিসেবেই নিতে হবে।) কিন্তু কিল খেয়ে কিল হজম করে জিনোভিয়েভ সাফাই দেন যে "এইসব লোকদের (অর্থাৎ সোভিয়েট এশিয়ার মুসলমানদের) সংস্কারগুলোকে সমীহ না করে উপায় নাই; কমিউনিস্টরা 'খিবার মোল্লাদের'ও আলোর পথে নিয়ে যাবে।"[১০২] জার্মান মার্ক্সিস্টদের পক্ষে 'খিবার মোল্লাদের' নিন্দা করা খুবই সহজ ছিলো। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে তারা ছিলো একটি জটিল সমস্যা—রূপক ও বাস্তব দুই অর্থেই। তাদের চাইতেও জটিলতর সমস্যা ছিলো গোটা মুসলিম মধ্য-এশিয়ার 'ধর্মীয় হেঁয়ালিপনার' সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র 'বোখারার মোল্লারা।' বোখারার মোল্লারাই সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সশস্ত্র বিদ্রোহে শেষ পর্যন্ত সমর্থন যুগিয়ে যায়। কখন এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে, বলা মুশকিল। ১৯২৪ সাল পর্যন্তও, বিশেষ করে প্রাক্তন আমীর শাসিত বোখারার পূর্বাঞ্চলে সংঘর্ষ চলতে থাকে। ১৯২২ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্তও দ্যুশাম্বে (স্তালিনাবাদ) কমিউনিস্ট বিরোধীদের দখলে ছিলো। সোভিয়েট বাহিনী ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ ১৯২৮ সাল পর্যন্তও চলতে থাকে। ১৯২৮ সালেই খিবার জুনাইফ খান পরিচালিত বিদ্রোহী দলটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়।[১০৩] এই বিদ্রোহবহ্নির শেষ স্ফুলিঙ্গ ছিলো ১৯৩১ সালে আফগানিস্তান থেকে বোখারার মুসলিম মোহাজেরদের তাজিকিস্তান আক্রমণ।

সোভিয়েট ইউনিয়নের মুসলিম অঞ্চল ও খ্রিস্টান অঞ্চলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, উভয়ের মধ্যে কোন কোন দিক থেকে কিছু কিছু মিলও ছিলো; যেমন — ধর্মীয় উপদলগত কোন্দল। রাশ্যান অর্থোডক্স চার্চের অভ্যন্তরে প্যাট্রিয়ার্ক তিখনের 'সনাতন চার্চ' ও 'জীবন্ত' বা 'সংস্কৃত' চার্চের মধ্যে যে বিরোধ ছিলো, তার প্রায় সমান্তরাল কোন্দল বর্তমান ছিলো সোভিয়েটের মুসলিম শিবিরেও। একদিকে গোঁড়া মুসলিম নেতারা নাস্তিক্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে

---

102. *B. Sinowjew, the Western Revolution and the Communist International.*

103. *L. Klimovich, Soviet Construction and Religion in the East, Moscow. 1929. P. 50.*

সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন, অপরদিকে প্রগতিশীল মুসলিম তরুণেরা এই সরকারের প্রতি সমর্থন দানের আহ্বান জানান, এবং তা প্রায়ই খুব ঘটা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে। রক্ষণশীলেরা যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো, তাদের কমিউনিজম বিরোধিতায়, সংস্কারবাদীরাও তেমনি আনুগত্যশীল ছিলো নতুন শাসকদের ও তাদের নীতির প্রতি এবং উভয় দলই নিজ নিজ ভূমিকার সাফাই দিত কোরানের বরাত দিয়ে।

উত্তর-ককেসাস অঞ্চলটি দীর্ঘকাল যাবৎ সংরক্ষণশীল মুসলমানদের প্রতিরোধের একটি প্রাচীরহীন দুর্গের মতো ছিলো, এবং 'করাচাই' এলাকাও চেচেন-ইঙ্গুইস রিপাবলিকের মতো কয়েকটি স্থানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মুসলমানদের সোভিয়েট বিরোধী বিদ্রোহের আগুন নির্বাপণ করা যায়নি। তবে সংস্কারপন্থীরা তাতারিয়া, বাসকিরিয়া ও রাশ্যান ফেডারেশনের অন্যান্য যে-সব স্থান ইয়োরোপীয় ও কমিউনিস্ট প্রভাবের উৎসের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলো, সে-সব স্থানে প্রভাব বিস্তারে সাফল্য লাভ করে। আযরবাইজানে কমিউনিস্টদের মুসলিম সহযোগী সংগ্রহে বেশি বেগ পেতে হয়নি। মধ্য-এশিয়ার রিপাবলিকগুলোতে দুটি প্রবণতাই পাশাপাশি সহ অবস্থান করতে থাকে। এইসব রিপাবলিককে স্থানীয় মোল্লাদের মনোভাবের মধ্যে শহরে শহরে বৈচিত্র্যদৃষ্ট হয়। ফারগানায় মুসলিম মোল্লা প্রমুখেরা এমনকি ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট মেডিক্যাল সার্ভিস বর্জন করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেন; পক্ষান্তরে কোখন্দের মোল্লারা সে-বছরই অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।[১০৪] ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের প্রবীণদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোষণা করেন যে, খোদার হুকুমেই সোভিয়েট সমূহের সৃষ্টি হয়েছে এবং লেনিন আগা খানেরই অন্যতম সুযোগ্য পুত্ররত্ন।[১০৫]

সোভিয়েট সরকারের পক্ষে সংরক্ষণশীলরাই ছিলো বড় আপদ। তারা জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো এবং আইন অমান্য, এমনকি, বিদ্রোহে প্ররোচিত করতো। তবে মুসলিম সংস্কারবাদীরাও (যাদের জনপ্রিয় ডাক-নাম রাখা হয় 'নয়া মসজিদের মুসল্লী' বা 'নভোমেচেতনিকী') তাঁদের পক্ষে কিছু অবিমিশ্র আশীর্বাদস্বরূপ ছিল না। অবিশ্যি প্রভাবশালী মুসলিম সংস্থাগুলো সমর্থন সূচক বক্তৃতা-বিবৃতি প্রচার করে সোভিয়েট সরকারের শক্তিবৃদ্ধিতে যে সাহায্য

---

104. Bezbozhnik, 1927, 4.
105. Klimovich, of. cit. P. 95.

দিচ্ছিলেন, তাতে তাঁদের যথেষ্ট মনোরঞ্জন হতো। তাঁরা আরো প্রীত হতেন, যখন এইসব বক্তৃতা-বিবৃতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জোরালো সমালোচনাও করা হতো; কারণ তাঁদের গোপন প্রকল্প ছিলো মোল্লা শ্রেণীর সমর্থনে ব্রিটেনকে ইসলামের প্রধান শত্রুরূপে চিত্রিত করা ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে মুসলমানদের ত্রাণকর্তা বলে প্রতিপন্ন করা। বস্তুতঃ, ১৯২৩ সালে বাকুর প্রভাবশালী মোল্লাশ্রেণী ব্রিটিশ দস্যুদের কবল থেকে পারস্য ও তুরস্ককে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েট সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মুসলিম বিশ্বের নিকট ব্রিটিশ ভেল্কিবাজীতে বিভ্রান্ত না হবার আবেদন জানান।[১০৬] পরের বছর তাসখন্দে অনুষ্ঠিত মুসলিম ধর্মীয় সম্মেলনে অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করে ঘোষণা করা হয় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ থেকে প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিদের মুক্তিসাধনের সংগ্রামে সর্বোতভাবে সাহায্য করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন কৃতসংকল্প।[১০৭]

১৯২৫—২৬ সালের শীতকালে সোভিয়েট মধ্য-এশিয়ায় ভূমিসংস্কার প্রবর্তনের সময়ও নভোমেচেতনিকীরা যথেষ্ট কাজে লাগে। এই দলের বেশ কয়েকজন মোল্লা ঘোষণা করেন যে, ভূমিসংস্কার পরিকল্পনাটি ইসলামের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। তাসখন্দের মুসলিম ধর্মীয় প্রশাসন সংসদও এই মর্মেই একটি বিবৃতি প্রচার করেন; কিন্তু তাঁদের বিবৃতিটি পুরোপুরি কমিউনিস্টদের মনঃপূত হয়েছিলো বলে মনে হয় না। কারণ তাঁরা মুসলিম জনসাধারণকে সরকারি বিধান মেনে নেয়ার উপদেশ দিলেও, ভূস্বামীদের উপদেশ দেন তাঁদের জমি ও সম্পত্তি সরকার দখল করে নেবার আগেই যেন তাঁরা জনগণের হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দেন; তাহলে এই নেক কাজের জন্যে পরকালে তাঁদের পারিতোষিক মিলবে।[১০৮] এই বিবৃতি থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, সোভিয়েট সরকারের পক্ষে তাঁদের সমর্থক মুসলমানেরা তাঁদের বিরোধী মুসলমানদের চাইতে কিছু কম বিপজ্জনক ছিলেন না। শত্রুকে শাস্তি দিয়ে শায়েস্তা করা যায়, কিন্তু বেয়াড়া প্রকৃতির মিত্রকে নিয়ে উপায়টা কি! বড়ই বেখাপ্পা ছিলেন এই মিত্ররা, কারণ তাঁরা সরকারের নীতিকে সমর্থন করতে গিয়ে তাতে একটা ধর্মীয় সুনীতি আরোপ করে বসতেন, যার ফলে সেই আদিযুগের অশিক্ষিত মুসলমান কমিউনিস্টদের বিভ্রান্তির আর সীমা-পরিসীমা থাকতো না।

---

106. *Zarya Vostoka, 17—8—24.*
107. *Pravda, 28—12—24.*
108. *২০ ডিসেম্বর, ১৯২৫ সালের বিবৃতি।*

সোভিয়েট শাসনের প্রথম দিকের মুসলিম কমিউনিস্টরা ছিলো এক অতি অদ্ভুত জীব। তারা আল্লার বিশ্বাস করতো এবং সব ধর্মকর্মও পালন করতো, এমন কি, মধ্য-এশিয়ায় আঞ্চলিক সম্মেলনাদি অনুষ্ঠানকালে নামাযের সময় হলে সম্মেলনের কাজ স্থগিত রাখা হতো, পার্টি অঞ্চলগুলোর বৈঠক ছেড়ে সদস্যরা চলে যেতো নামায আদায় করতে। ধর্মবিরোধী প্রচারণার কথা তারা ভাবতেও পারতো না। তাসখন্দ কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে প্রথম যখন এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় ১৯২৩ সালে, তখন দেখা যায় যে, উজবেক কমিউনিস্টরা তাদের মোল্লাদের চাইতেও বেশি বিচলিত হয়ে পড়ে এই প্রশ্নে। তারা নাস্তিক্যবাদী ভাষণদাতাকে প্রশ্ন করে ঃ 'আল্লাহ্ ছাড়া তোমাকে সৃষ্টি করলো কে?' ধর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে কি করে? তারা আরো মন্তব্য করে যে, একজন উজবেকের পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা রুশ স্বার্থের বেদীতে আত্মবলিদানেরই নামান্তর। তারা 'ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ' কমিউনিজম দাবী করে বসে।[১০৯] এমনকি, ১৯২৭ সালেও 'লীগ অব মিলিট্যান্ট এ্যাথেইস্টস্'-এর প্রধান ইয়ারোস্লাভস্কী প্রকাশ করেন যে, দাগিস্তান, বোখারা ও অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম বংশোদ্ভূত কমিউনিস্টরা তাদের ধর্মকর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ অব্যাহত রেখেছে।[১১০] তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, সোভিয়েট শাসনের একযুগ অতীত হবার পর সময় হয়েছে মুসলিম অঞ্চলগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টি শাখাগুলোতে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি আরো একটু বাড়িয়ে দেয়ার এবং প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে ধর্মের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার আদায় করার। কিন্তু আসলে তখনো সময় হয়নি। তখনো উত্তর-ককেসাস অঞ্চলের নাস্তিক কমিউনিস্টদের পর্যন্ত সাচ্চা মুসলমানের ভোল ধরতে হতো এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপর নিজেদের প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখার জন্য মসজিদে যেতে হতো।[১১১] পামীর অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যরা পৃথিবীর অন্য সব জায়গার ইসমাইলী ভক্তদের মতোই আগা খানকে জাকাত দিতে থাকে।[১১২]

---

109. *Pravda vostoka, P. 277, 1928.*

110. *Yaroslavsky, against religion and church, VOL. II, 1933. PP. 219—20.*

111. *Pravda, 200 xÂUqJ, 1926Ç*

112. *সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেও মুসলিম এলাকাগুলোতে এই জাকাত দান ও সংগ্রহের ব্যাপারটি খুবই চকমপ্রদ। প্রথমে সীমান্ত ছাড়পত্র নিয়ে এবং পরে বে-আইনীভাবেই ভারত থেকে আসতো জাকাত আদায়কারীরা। মুসলিম অঞ্চলগুলোর দূরতম প্রান্তগুলো থেকেও তারা আদায় করে নিয়ে আসতো জাকাত। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আদায়কারীদের গুপ্তচর অপবাদ দিয়ে জাকাত প্রদান বন্ধ করার চেষ্টা করেন। (anti-religionik, 1938, No. 8, P. 38)*

যারা যুগপৎ মুসলিম ও কমিউনিস্ট হতে চেয়েছিলো, তারা সকল যুক্তি অগ্রাহ্য করে এবং পার্টি মুখপাত্রদের প্রামাণিক ঘোষণাবলী সত্ত্বেও তাদের নিজের তৈরি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতো যে, কমিউনিজম ও ইসলামের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বরং তারা একই বস্তু দুই নামে পরিচিত। নভোমেচিতনিকীদের মতের সাথেও এই মিল ছিলো। নভোমেচিতনিকীদের অনেকে তো এমনও মনে করতো যে, কোরান ও কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো একই জিনিস।[১১৩] স্বভাবতঃই ধর্মপ্রাণ মুসলিম কমিউনিস্ট ও নভোমেচিতনিকীদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ সমঝোতা বিদ্যমান ছিলো। ফলে মধ্য-এশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি শাখাগুলোর ধর্মবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লার অপসারণ করে তাঁদের স্থলে 'প্রগতিশীল' মোল্লাদের প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই সীমিত থাকে।

এই অদ্ভুত জগাখিচুড়ি অবস্থার জন্যেই মুসলিম অঞ্চলগুলোতে পূর্ণমাত্রায় সোভিয়েট ব্যবস্থার প্রবর্তন দীর্ঘকাল বিলম্বিত হয়। এর ফলে ইসলামের পরমায়ুও দীর্ঘায়িত হয়। ইসলাম শুধু একটা ধর্মসমস্যারূপেই নয়, বরং একটা পূর্ণাঙ্গ আইনগত কাঠামো, জীবনদর্শন ও সুব্যবস্থিত অনুশাসন পদ্ধতিরূপেও সোভিয়েট পদ্ধতি সম্প্রসারণের পথে শক্তিশালী বাধার সৃষ্টি করে। ইসলামের সাথে পাঞ্জা ধরতে গিয়ে সোভিয়েট সরকার অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শগত প্রতিরোধ নিরসনের মতো দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারেননি; তাঁদেরকে বরং সতর্কতার সঙ্গে ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করতে হয়। মুসলমানদের তিনটি ধর্মীয় ও সংস্থাগত সম্পদ, যথা— মসজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি, কোরানিয়া মাদ্রাসা ও শরীয়ত আদালতসমূহ, যে পদ্ধতিতে সরকার কুক্ষীগত করেন, তাতে এই নীতির প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

১৯১৮ সালের ২৩ জানুয়ারির সোভিয়েট ডিক্রীতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করা হয়। ঐ ডিক্রীতেই আইনগতভাবে ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির বিলোপ ঘোষণা করা হয়, কিন্তু কার্যতঃ তিন দশকের শেষ পর্যন্তও ওয়াক্ফ্ সম্পত্তিগুলো টিকে থাকে; থাকার কারণও ছিলো, কেননা, যতদিন পর্যন্ত কোরানিয়া মাদ্রাসাগুলো (সরকারি ভাষায় 'প্রাচীন পদ্ধতির' স্কুলগুলো) বর্তমান ছিলো, ততদিন পর্যন্ত এগুলোও থাকার প্রয়োজন ছিলো। সোভিয়েট সরকার বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ

---

113. Yaroslavsky, OP. cit. VOL IV. P. 373.

শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা না করে এই মাদ্রাসাগুলো তুলে দিতে পারছিলেন না। তুর্কিস্তানে কর্তৃপক্ষ 'মাখকামাই শারিয়া' নামে একটি বিশেষ মুসলিম শিক্ষা সংসদ গঠনেও অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন; শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম ও কমিউনিজমের মধ্যে একটি আপোষনীতি গড়ে তোলাই ছিলো এই সংসদের লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য কার্যকরী করার জন্য সংসদকে নিজস্ব ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেয়া হয়। মোল্লারা ও অভিভাবকেরা কোরানিয়া মাদ্রাসাগুলো বহাল রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শরীয়ত আদালতগুলোর ক্ষমতা ও সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। ১৯২৫ সাল পর্যন্ত একমাত্র উজবেকিস্তানেই অনুরূপ ৮৭টি আদালত বর্তমান ছিলো, ১৯২৬ সালে কমে গিয়ে মাত্র ২৭-এ দাঁড়ায়, ১৯২৭-এর শেষে মাত্র ৭টি টিকে থাকে। ১৯২৮ সালে সমগ্র সোভিয়েট মধ্য-এশিয়ায় অনুরূপ একটি আদালতও আর অবশিষ্ট ছিলো না।[১১৪] কিন্তু সরকারিভাবে মুসলিম স্কুল ও আদালত বিলুপ্তির ঘোষণা মানে এ নয় যে, সেগুলো রাতারাতিই শূন্যে মিলিয়ে যায়। কয়েকটি দূরবর্তী অঞ্চলে, যেমন দাগিস্তানের পার্বত্য এলাকায়, এগুলো আরো কিছুদিনের জন্য টিকে থাকে।[১১৫] মুসলিম এলাকাগুলোতে প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রথমদিকে সবক্ষেত্রে নাস্তিক্যবাচক ছিলো না। সোভিয়েট রাষ্ট্রায়ত্ত স্কুলগুলোতে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকগুলোর মধ্যে কোন কোনটির সংকলনকারী ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি; এ ছাড়া, প্রথম যুগের সোভিয়েট 'ধর্মনিরপেক্ষ' শিক্ষকদের মধ্যে অনেক মোল্লাও ছিলেন।

মুসলিম এলাকাগুলোর অবস্থা দেশের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তোলার জন্য সোভিয়েট সরকার যে কয়েক দফা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, মাদ্রাসা বিলুপ্তির নীতি ছিলো তারই অঙ্গ। কেন্দ্রভিত্তিক সোভিয়েট সাম্রাজ্য বেশিদিন সহিষ্ণুতামূলক মুসলিম নীতি ও দমনমূলক খ্রিস্টান নীতি এই— দুটি মপরস্পরবিরোধী ধর্মনীতি চালিয়ে যেতে পারতেন না। কাজেই ১৯২৮—২৯ সালে যে সর্বাত্মক ধর্মবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়, তাতে বিপুলসংখ্যক মসজিদ বন্ধ, ধ্বংস বা ধর্মনিরপেক্ষ করা হয় এবং মোল্লাশ্রেণী প্রায় নিধন করে ফেলা হয়। এই অভিযানে খ্রিস্টানদের চাইতে মুসলমানরাই বেশি নির্যাতিত হয়, কারণ খ্রিস্টানদের চাইতে হারাবার মতো সম্পদ মুসলমানদেরই বেশি ছিলো। তবে খ্রিস্টানদের উপাসনালয়গুলো যেভাবে ইতোপূর্বেই কেড়ে নেয়া হয়েছিলো,

---

114. *Klimovitch, OP. cit., P. 121.*
115. *Bezbozhnik, 29—9—1929.*

মুসলমানদের মসজিদগুলো কেড়ে নেয়ার পদ্ধতি তার চাইতে বড় একটা স্বতন্ত্র ছিলো না। স্থানীয় লোকদের জড়ো করে "স্বেচ্ছায়" প্রস্তাবগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় যে, সেই স্থানের মসজিদটিকে স্কুল, ক্লাব, সিনেমা বা পাঠাগারে রূপান্তরিত করা হোক। কোন কোন ক্ষেত্রে মসজিদকে কারাগার ও হোটেলেও পরিণত করা হয়; তবে, খুব প্রাচীন ও শিল্পখ্যাতিসম্পন্ন মসজিদগুলো মিউজিয়ম করা হয়।

মোল্লাশ্রেণী ইতোপূর্বেই ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি জাতীয়করণের ফলে তাঁদের আয়ের প্রধানসূত্র থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, এখন তাঁরা বিপুল সংখ্যায় বেকার হয়ে পড়েন। কোন কোন ক্ষেত্রে 'মোল্লাবৃত্তি শোষণভিত্তিক' বলে বিবৃতি প্রচার করে মোল্লাদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। উর্ধ্বতন স্তরের মোল্লাদের গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। মধ্য-এশিয়ার সর্বোচ্চ মুসলিম পরিষদের চেয়ারম্যান ও শরীয়ত আদালতের প্রধান বিচারপতিসহ সকল সদস্যকেই উজবেক দণ্ডবিধির ১৫৬ ধারায় গ্রেফতার করা হয়। দণ্ডবিধির এই ধারাটি বিশেষ করে ইসলাম দলনের জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছিলো। "শ্রমিক কৃষক সরকারের পতন ঘটাবার উদ্দেশ্যে বা এই সরকার প্রবর্তিত আইন-কানুন ভঙ্গের প্ররোচনাদানের উদ্দেশ্যে জনগণের ধর্মীয় সংস্কারের অপব্যবহার" করার অপরাধের জন্য এই ধারায় নিম্নতম ৩ বছর কারাদণ্ড থেকে "সমাজরক্ষামূলক চরমপন্থাস্বরূপ গুলি করে হত্যা করার শাস্তি বিধান করা হয়।"[১১৬]

১৯২৮—২৯ সালে প্রারম্ভ ও কয়েক বছর যাবৎ পরিচালিত ধর্ম-বিরোধী অভিযানের ফলে ইসলাম ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্দেশ করা অসম্ভব; তবে এতে যে মসজিদ ও মোল্লা উভয়ের সংখ্যাই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে নগণ্য হয়ে পড়ে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।[১১৭] দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাসকিরিয়ায় মোল্লাদের সংখ্যা ১৯২৯ সালের ৩,০০০ থেকে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৩২ সালে ৩০০-তে দাঁড়ায়। অন্যান্য মুসলিম এলাকায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সোভিয়েটের মুসলমানেরা সহজে পরাভব স্বীকার করেনি। তারা বেআইনী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠন করে এবং স্থানে স্থানে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ক্ষেত্রবিশেষে এইসব বিদ্রোহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকলেও, মূলতঃ ইসলাম-রক্ষাই ছিলো এগুলোর মূল প্রেরণা। তাতারিয়ায় মোল্লারা "সত্যের জ্যোতিষ্ক" নামে একটি ধর্মীয় যুবলীগ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং "ইসলামের

---

116. *Uzbek SSR Penal Code, Tashkent, 1954. PP. 28, 66.*
117. *Antireligioznik., P. 35.*

সন্তান" নাম দিয়ে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ১৯২৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নেতাদের গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়।[১১৮] বাসকিরিয়ায় মুসলমানেরা এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করে। তারা "মুহাম্মদের হুকুমনামা" বলে একটা প্রচারপত্র গোপনে বিলি করে। এতে বলা হয় যে, কেয়ামত আসন্ন; আল্লাহ্ মানুষের কাছ থেকে কোরান ও ঈমান তুলে নিয়ে যাবেন, এবং এই অঘটনগুলো ঘটবে ১৯৩৭ সালের মধ্যে। তবে যাঁরা এই হুকুমনামা শহরে, বন্দরে ও মসজিদে মসজিদে বিলি করবেন, মুহাম্মদ তাঁদের রক্ষা করবেন।... এর ফলে মসজিদে জামায়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বহু মুসলমান যুবক কমসমল ত্যাগ করে এবং বহু মুসলমান তাদের সন্তানদের সোভিয়েট স্কুলে প্রেরণ বন্ধ করে দেয়।[১১৯]

ককেসাস অঞ্চলে মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলন বিশেষ হিংসাত্মকরূপ পরিগ্রহ করে। কাবাডিনো-বাল্কান স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে ১৯২৮ সালের জুন মাসে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়ে ৫ দিন স্থায়ী হয় এবং বিদ্রোহীরা বাকসান জিলা দখল করে নেয়। সরকারিভাবে এই বিদ্রোহের জন্য বাকসান জিলার প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লা ও কুলাকদের দায়ী করা হয় এবং তাঁদের কেউ কেউ 'বহির্বিশ্বের মুসলিম প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন' বলেও অভিযোগ করা হয়।[১২০] আরেকটি বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে আজহার স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রে। তুরস্ক সীমান্তের নিকটবর্তী আজহারিস্তানের মুসলমানেরা সোভিয়েট সরকারের ইসলাম-বিরোধী নীতিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য সোভিয়েট সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করতে হয়।[১২১] চেখনিয়ার মুসলিম বিদ্রোহ আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে। সেখানে কমিউনিস্ট বিরোধী ইমামেরা সম্মিলিতভাবে আল্লার শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহের শেষ নেতা ইমাম সাদৎসেভকে চেবার্দার পার্বত্যগ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তাঁর পাহাড়িয়া অনুসারীরা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে যে, আল্লাহ্ যাঁকে স্বয়ং পাঠিয়েছেন জেহাদ পরিচালনা করতে তিনি এত সহজে ধরা পড়বেন। তাদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, তিনি শূন্যে মিলিয়ে গেছেন। ফলে

---

118. *Ibid, P. 63.*

119. *Bezbozhnik, 12—5—1929.*

120. *History of Kabarda, Moscow, 1957, P. 243.*

121. *The Times, 11—4-1929,14—5—1929.*

কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাদের কয়েকশত জনকে গ্রজনী শহরে নিয়ে এসে বন্দী ইমামকে দেখান। তাঁকে বিচারান্তে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[১২২]

মধ্য-এশিয়ায় মুসলিম প্রতিরোধের যে ঘটনাটি তিন যুগ পরেও কমিউনিস্টরা ভুলতে পারেনি, তা হচ্ছে কমিউনিস্ট নেতা হাকিম জাদে (১৮৮৯—১৯২৯)-এর নৃশংস হত্যা। হাকিম জাদেই হলেন রাশ্যার মুসলিম অঞ্চলে নাস্তিক্যবাদের প্রথম ও প্রধান শহীদ। ১৯২৮ সালে উজবেকিস্তানের পার্বত্য এলাকায় শাহ্-ই-মর্দান নামে চিত্রবৎ সুন্দর একটি গ্রামে ধর্মের নাম মুছে ফেলার জন্য পার্টি তাঁকে প্রেরণ করে। কিংবদন্তী অনুসারে এই গ্রামেই খলীফা হযরত আলী সমাহিত আছেন।[১২৩] হাকিম জাদে এই গ্রামেই এসে উপস্থিত হন একে নাস্তিকদের একটি দুর্গে রূপান্তরিত করার জন্য। তিনি গ্রামের মসজিদটি বন্ধ করার ও সেই গ্রামে তীর্থযাত্রীদের আগমন বন্ধ করার জন্য প্রচারকার্য চালান এবং গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি লেনিন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে মোল্লা ও শেখের দল' তাঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে হত্যা করেন।[১২৪] হাকিম জাদের হত্যার সঙ্গে জড়িত বলে ৫৪ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয় এবং একজন শহীদ 'সোভিয়েট বীর' বলে তাঁর খ্যাতি দিগ্বিদিক্ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'হামজা'-র অনুসরণে শাহ্-ই-মর্দানের নতুন নামকরণ করা হয় 'হামজা-আবাদ।' জীবৎকালে তিনি স্কুলশিক্ষক বলেই সমধিক পরিচিত হলেও মৃত্যুর পর তাঁর লেখক ও কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর লেখার জোরালো ধর্মদ্বেষী ভাবধারা তাঁকে সোভিয়েট মধ্য-এশিয়ার প্রথম নাস্তিক লেখকের 'মর্যাদায়' সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯২৭ সালের বসন্তকালে প্রধানতঃ পর্দাপ্রথা উচ্ছেদের জন্য 'হুজ্জুম' নামে যে নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু করা হয়, সোভিয়েটের শাসনের প্রতি মুসলিম প্রতিরোধ ছিলো মুখ্যতঃ তারই প্রতিক্রিয়া। সোভিয়েট সকল মুসলিম এলাকায় পর্দাপ্রথা সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। কিন্তু উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও ট্রান্সককেশিয়াতে পর্দা প্রশ্নটি বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে।

---

122. *Bezbozhnik, 15–10–1930.*

123. শিয়া মুসলিম ঐতিহ্য অনুসারে, হযরত আলীকে বাগদাদের দক্ষিণে অবস্থিত নাজাফে সমাধিস্থ করা হয়। কাজেই নাজাফ শিয়াদের পবিত্রতম স্থান না হলেও অন্যতম পবিত্রস্থান বলে পরিগণিত হয়।

124. *Bezbozhnik, 28—4– 1929.*

৮ মার্চ কমিউনিস্ট দিনপঞ্জীতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিবস ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১৯২৭ সালের এই দিবসটিতেই হয় হুজ্জুমের সূত্রপাত। ঐদিন বিরাট বিরাট মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং এইসব সমাবেশে বিপুলসংখ্যক মহিলা ঘটা করে তাদের পর্দা খুলে ফেলে পুড়িয়ে দেয়। মুহূর্তের জন্য প্রতীয়মান হয়েছিলো যে, দিবসটি আশাতীতরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কেবল উজবেকিস্তানেই ১,০০,০০০ মহিলা পরিত্যাক্ত পর্দায় বহ্ন্যুৎসব পালন করে। কিন্তু সে শুধু 'দিবসটির' সম্মানার্থেই। কারণ পরের দিনই মাত্র ৫,০০০ জন ছাড়া তাদের সবাই আবার পর্দা ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু সেই উৎসবের ফলে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কমিউনিস্ট পরিচালিত এই নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ১৪ জন উজবেক নারীকর্মী নিহত হয় ; এছাড়া বহু নারীকর্মীকে আক্রমণ ও ধর্ষণ করা হয়; জনমত পর্দাত্যাগকে পতিতাবৃত্তির সামিল গণ্য করে।[১২৫] পরের বছর (৮ মার্চ, ১৯২৮) এই উৎসব আরো ঘটা করে পালন করা হয়; তার প্রতিক্রিয়াও হয় সে অনুপাতে আরো মারাত্মক। উজবেকিস্তানে ১৯২৮ সালে ২০০-এর অধিক প্রগতিশীল মহিলা নিহত হয় বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় এবং এই সংক্রান্ত অভিযোগে ৪৫ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেয়া হয়।[১২৬] নিহতদের বেশির ভাগই ছিলো গ্রাম পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণকারী মহিলারা। পর্দা বিলোপের সমর্থনকারী পুরুষদের মধ্যেও বেশকিছু লোক নিহত ও আহত হয়। পর্দাবিলোপের বিরোধিতা কত প্রবল ছিলো, তা এই থেকেই অনুমান করা যাবে যে, ১৯২৮ সালেও একজন পর্দাবিহীন কমিউনিস্ট মহিলার পক্ষে উজবেক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের তৎকালীন রাজধানী সমরখন্দের বিখ্যাত কেন্দ্রীয় স্কোয়ার রেজিস্তানের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করা নিরাপদ ছিলো না। মুসলিম মিলিশিয়া-ম্যানরা শুধু যে পর্দাত্যাগী মহিলাদের নিরাপত্তাবিধানে আগ্রহী ছিলো না, তাই নয়, তারা এই 'বেদীন কুত্তীদের' উপর আক্রমণে উৎসাহদান করতো।[১২৭] রাজধানী শহরের অবস্থাই যদি এই হয়, তাহলে সুদূর পল্লীপ্রান্তে কি অবস্থা বিরাজমান ছিলো, তা সহজেই অনুমেয়।

---

125. *Fannina W. Halle : Frauen des Ostens (Zurich. 1938), PP. 150—152*

126. *Isioricheskie Zapiski, No. 48 (1954) P. 140.*

127. *Bezbozhnik, 6—1—1929.*

আবার ফিরে আসে ৮ মার্চ—আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৯২৯ সাল। প্রথম ছ'মাসেই উজবেকিস্তানে ১৬৯ জন নারীমুক্তি কর্মীর হত্যার খবর পাওয়া যায়।[১২৮] দেখেশুনে মনে হয়, বছরের পর বছর যতই এই নিহতের সংখ্যা বেড়ে যায়, হুজ্জুমের উদ্যোক্তারাও যেন ততই একটা বিকৃত আনন্দ-অনুভূতিতে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। হবার কারণও আছে; কেননা, এই নিহতরা মরে গিয়ে পার্টির ভালো কাজে আসছিলো। পার্টি এই নৃশংসতাকে মুসলিম ধর্মীয় প্রতিরোধের বিরুদ্ধে প্রচারণার কাজে লাগাতো। নাস্তিক্যবাদী লীগের ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে 'ধর্মবিরোধী ফ্রন্টে যে অগণিত সৈনিক অকাতরে আত্মবলিদান করেছে', তাদের মধ্যে এই হুজ্জুম শিকারদের তালিকাও উদ্ধৃত করা হয়।[১২৯]

সোভিয়েটের সরকারি বিবরণে এইসব হত্যাকাণ্ডের জন্য মোল্লাদের দায়ী করা হয়। এই অভিযোগ সত্যও হতে পারে, যদিও শুধু পরোক্ষ অর্থে মাত্র। পর্দাবিরোধী আন্দোলন ছিলো ইসলামের প্রতি একটি সুপরিকল্পিত আঘাত; কিন্তু যে-সব মুসলিম এলাকায়, যথা—বাসকিরিয়া ও তাতারিয়ায়, পর্দা প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিলো না, সে-সব এলাকায় মোল্লারা এই আঘাতের জবাব দেন অতি সূক্ষ্ম চাতুর্যের সঙ্গে। তাঁরা নারীমুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা না করে বরং ঘোষণা করেন যে, নারীদের মুক্তি আসবে সোভিয়েট শক্তি থেকে নয়, ইসলাম থেকেই।[১৩০] কার্যক্ষেত্রেও তাঁরা প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেন যে, তাঁদের এই দাবী ফাঁকা নয়। উফার কেন্দ্রীয় মুসলিম প্রশাসন সংস্থা একজন মহিলাকে সদস্যপদে কো-অপ্ট করে নেন। তাতারিয়া ও বাসকিরিয়ায় সকল মসজিদে নারীদের প্রবেশাধিকার দেয়া হয় এবং মসজিদে বা মোল্লাদের বাসভবনে বিশেষ মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

হুজ্জুমের সময় নারীমুক্তি আন্দোলনের উদ্যোক্তারা কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট যুবলীগ সদস্যদের এক অংশের অসহযোগিতামূলক মনোভাবের ফলে ভীষণ বেকায়দায় পড়ে যান। পার্টির মধ্য-এশিয়া ব্যুরো, উত্তর-ককেশিয়া আঞ্চলিক কমিটি ও আযরবাইজান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সকল সদস্যকে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের স্ত্রী, ভগ্নী ও পরিবারের অন্য মেয়েদের পর্দা উচ্ছেদ করে দেয়ার জন্য বাধ্যতামূলক নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পালনের পরিবর্তে বহু সদস্য মোল্লাদের

---

128. *T. N. Kary-Niasov : Essays on the History of the Culture of Soviet Uzbekistan. Moscow, 1955, P. 159.*

129. *Pravda, 12—6—1929.*

130. *Kommunistichescse Prosveshchenie, 1927, P. 76.*

সাথে যোগ দিয়ে পর্দা-উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত হয় এবং সাধারণভাবে ধর্ম-বিরোধী প্রচারণা ও কার্যকলাপ সমর্থন থেকে বিরত থাকে।[১৩১] এদের দোষেই (কিংবা, বিশ্বাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এদের গুণেই) সোভিয়েট মুসলিম এলাকাগুলোতে নাস্তিক্যবাদী লীগ প্রতিষ্ঠান একটি প্রহসনে পরিণত হয়। মুসলিম এলাকায় সময়ে সময়ে এই লীগের সদস্যদের যে সংখ্যা প্রচারিত হয়, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয় না; কারণ একবছর থেকে আরেক বছর সদস্যসংখ্যার আকাশ-পাতাল তফাৎ ঘটতো। হয়তো কোন শাখায় আকস্মিকভাবে অভাবনীয়রূপে সংখ্যাবৃদ্ধির পরে পরেই আবার সমান অভাবনীয়রূপেই তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কিংবা গোটা শাখাটাই পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আযরবাইজানে লীগের সদস্যসংখ্যা ১৯৩০ সালের ৩,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩১ সালে এক লাফে ৭০,০০০-এ গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে (আযরবাইজানে) লীগ প্রায় অনস্তিত্ব হয়ে পড়ে, অথচ সে বছরের শেষ দিকে লীগের সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫,০০০ এবং এই সংখ্যাই ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে ৮৫,০০০-এ উন্নীত হয়।[১৩২] মুসলিম ধর্মোন্মত্ততার দৃষ্টান্তস্থল দাগেস্তানে ১৯৩১ সালে লীগ ৪৯,০০০ সদস্য দাবী করে (এই সংখ্যা দাগেস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগেরও বেশি), অথচ ৬ বছর পরে স্বীকার করা হয় যে, এই সংখ্যা ১,০০০-এরও কম।[১৩৩] সংখ্যায় এই উত্থানপতনের কারণ নির্ণয় করা সহজ না হলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, লীগের সাধারণ সদস্যরা, এমনকি, সোভিয়েটের মুসলিম কর্মকর্তারাও লীগের আসল চরিত্র ও কর্মসূচি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল ছিলেন না। বস্তুতঃ, ১৯২৯ সালে দাগেস্তান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত কমিসারিয়াট স্থানীয় লীগ সংগঠন কি একটি ধর্মীয় না বৈজ্ঞানিক সংস্থা, সে সম্পর্কে তদন্ত করার নির্দেশ দেন।[১৩৪]

মস্কো, বিশেষতঃ সোভিয়েট গোয়েন্দাবিভাগের (এন. কে. ভি. ডি) পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা মুসলিম কমিউনিস্টদের সম্পর্কে খুব একটা উঁচু ধারণা পোষণ করতেন না। তিন দশকের দ্বিতীয়পাদের মধ্যে মধ্য-এশিয়ার সকল কমিউনিস্ট কর্মকর্তারা শুধু বাহ্যতঃই নয়, আন্তরিকভাবেই ইসলামের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন

131. *Bezbozhnik, 3—2—1929.*
132. *Antireligioznik, 1938,12, P. 56.*
133. *Caucasian Review (Munich), 1958, 7, P. 48.*
134. *Bezbozhnik, 10—10—1929.*

করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু গোয়েন্দা-বিভাগ পুরোপুরি তাঁদের আন্তরিকতায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। তারা সন্দেহ করতো যে, প্রকাশ্যভাবে ধর্মীয় কুসংস্কারের নিন্দা করলেও তলে তলে তাঁরা মোল্লা, ইমাম ও শেখদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ইসলামকে জীইয়ে রাখার চেষ্টায় প্রেরণা যোগাচ্ছিলেন। ফলে সোভিয়েট মুসলমানদের প্রায় সকল শীর্ষস্থানীয় নেতার বিরুদ্ধেই সরকারিভাবে বৈদেশিক গুপ্তচরদের জন্য কাজ করার এবং মোল্লা ও প্রাক্তন মোল্লাদের সহযোগিতা করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। এই নেতাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তন ও বাসকিরিয়ার প্রধানমন্ত্রীগণ ও দাগেস্তান পার্টির সেক্রেটারী। তাঁদের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ করা হয় যে, তাঁরা নাস্তিক্যবাদী লীগের কার্যকলাপ ভণ্ডুল করার জন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে বেছে বেছে গোঁড়া ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন এবং সরকারি তহবিল ব্যয় করে মসজিদ নির্মাণ ও মেরামত করেন।[১৩৫] এই সব অভিযোগের কোন বাস্তব ভিত্তি ছিলো না, কিন্তু এর মধ্যে মুসলিম এলাকাগুলোতে অব্যবস্থিত অবস্থা ও ইসলামের পরমায়ুতে ক্রেমলিনের উষ্মার পরিচয় পাওয়া যায়। এর জন্য কিছু লোককে দোষী সাব্যস্ত করার দরকার ছিলো, আর সেজন্যে পুলিশকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ১৯৩৭ ও ৩৮ সালে গোয়েন্দা বিভাগ একটার পর একটা জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতে থাকে, আর এইসব ষড়যন্ত্রের অভিযুক্ত হোতারা প্রভাবশালী পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও অচিরকালের মধ্যে গায়েব হয়ে যান।

১৯৩৭—৩৮ সালের শুদ্ধি অভিযানে শুধু ধর্মবিরোধী আন্দোলনের নরমপন্থীদের অপসারণ করা হয় নাই, চরমপন্থীদেরও। উজবেকিস্তান পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারী আকমল ইকরামোভের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর অন্যতম ছিলো অতি উৎসাহের ফলে বাড়াবাড়ি করে জনচক্ষে ধর্মবিরোধী আন্দোলনকে অপ্রিয় করে তোলা। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা নাস্তিক্যবাদী চরমপন্থা গ্রহণ করে, বিশেষতঃ রাষ্ট্র ক্ষমতার জোরে পর্দাপ্রথা রহিত করার চেষ্টা করে[১৩৬] মেহনতী মুসলমানদের মনে নিদারুণ আঘাত হেনেছেন বলে অভিযোগ করা হয়। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে

---

135. *Boris kandidov : church and espionage moscow. 1938. PP. 94—96.*

136. *Antireligioznik, 1938,12. P. 14.*

তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। হুজ্জুম অভিযান শুরু করার দশ বছর পরেও যে তার সাফল্য অনিশ্চিত ছিলো, এই ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাহ্ন পর্যন্তও সোভিয়েট সূত্র থেকেই এর আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৩৯ সালে লীগ অব মিলিট্যান্ট এ্যাথেইস্টস্ ও কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েট মধ্য-এশিয়ায় তদন্ত করে দেখতে পান যে, বহু এলাকায় নারীমুক্তি তখনো পর্যন্ত কল্পনার স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এমনকি, মধ্য-এশিয়ার কলকারখানাগুলোর অভ্যন্তরেও নারীদের 'মুক্ত' করা সম্ভব হয়নি। লেনিন-আবাদ মিল্ক কম্বাইনে নিযুক্ত ২,০০০ তাজিক ও উজবেক নারী শ্রমিকের প্রায় সবাই পর্দা পরিধান করতো।[১৩৭] তাসখন্দের কাপড়ের কারখানায় অবস্থা আরো একটু ভালো ছিলো; সেখানে নারী শ্রমিকেরা কারখানার ভেতরে পর্দার ধার ধারত না, কিন্তু বাইরে যেতেই পর্দা পরে নিত।[১৩৮] স্ত্রীদের পর্দা পরাবার জন্য স্বামীদের বলপ্রয়োগের অভিযোগ বরাবর উত্থিত হতে থাকে এবং উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিয়া ও বিশেষ করে তাজিকিস্তানে পর্দাত্যাগী মহিলাদের উপর আক্রমণ সমানে চলতে থাকে। এইসব এলাকায় ১৯৩৯ সালে ১০ জন পর্দাত্যাগী মহিলা নিহত হয়। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিশিষ্ট নারীমুক্তি কর্মী রাফিয়েভা। স্তালিন-আবাদে স্বামীর হাতে তিনি নিহত হন।[১৩৯]

শুধু ধর্মবিরোধিতায় অতিমাত্রায় নরমপন্থী ও চরমপন্থী কমিউনিস্টরা নয়, ইসলামী যাজকশ্রেণীর সদস্যরাও ১৯৩৭—৩৮ সালের শুদ্ধি অভিযানের শিকার হন। রাঘব-বোয়াল ইমাম ও শেখদের ছাড়া, গণ্ডগ্রামের চুনোপুঁটি মোল্লারাও সোভিয়েট কৃষি ব্যবস্থা পণ্ড করার চক্রান্ত, পর্দাবিরোধীদের নির্যাতন প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত হন। উঁচুদরের মোল্লা ও শেখদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় জাপানী ও জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের জন্য কাজ করার, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হবার এবং নাশকতামূলক উদ্দেশ্যে সামরিক শিল্পে অনুপ্রবেশের।[১৪০] উফার মুসলিম কেন্দ্রের প্রধান মুফতী তার্দশিমানোভ এবং আযরবাইজান ও উত্তর-ককেশাসের মুসলিম নেতাদের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগই আনয়ন করা হয়েছিলো।

---

137. *Pravda 15—9 1937*.
138. *Antireligioznik, 1939, 12, P. 15.*
139. *Antireligioznik. 1939, 12, P. 31.*
140. *Antireligioznik. 1938, 8—9,. P. 66.*

কমিউনিস্টরা মনে হয়, মসজিদ উচ্ছেদ ও মোল্লা নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলামকে উৎখাত করার প্রচেষ্টায় হিসেবে ভুল করেছিলো। তারা স্বভাবতঃই শক্তির বিচার করে জনবল ও করতলগত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিয়ে। তবে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ সোভিয়েট পর্যবেক্ষক বিশেষ করে, ইসলামী সমাজের সঙ্গে পরিচিত বিশেষজ্ঞরা সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, মোল্লা ও মসজিদের সংখ্যা দিয়ে মুসলিম দেশের ধর্মীয় প্রভাবের পরিমাপ করা ভুল হবে।[১৪১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে সোভিয়েট সরকার মুসলিম তরুণ সমাজকে ধর্মের খুঁটি থেকে আলগা করে নিতে অনেকটা সফলকাম হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধ মুসলমানেরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানাদি পালনে অটল থাকেন। ইসলাম দৃশ্য ও দৃষ্টির অগোচরে নানা উপায়ে মুসলমানদের মধ্যে বেঁচে থাকে। উচ্ছেদকৃত মসজিদের স্থলে উন্মুক্ত প্রান্তর জামায়েতের স্থান করে দেয় মুসলমাদের জন্য, সাধারণ কৃষক ও কারিগরদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ, তাঁরা অভিষিক্ত হন মোল্লাদের স্থানে। ধর্মজীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ ব্যাহত হওয়ায় মুসলমানেরা অলৌকিক ঘটনাবলী ও অশরীরী জীবাত্মার কর্মকাণ্ড ইত্যাদি কুসংস্কারের দিকে বেশি করে ঝুঁকে পড়ে।

মুসলিম এলাকাগুলো সম্পর্কে নাস্তিক্যবাদী লীগের জ্ঞানগম্যি খ্রিস্টান এলাকাগুলোর পরিস্থিতি অপেক্ষা অনেক কমই ছিলো, তবু তারা মাঝে মাঝে যে-সব তথ্য প্রকাশ করতো, তা থেকেই বোঝা যেতো, মুসলিম এলাকাগুলোতে ধর্মের প্রভাব কত গভীর। তাতারিয়া থেকে খবর পাওয়া যায় যে, কি মুসলমান, কি খ্রিস্টান, অনুন্নত শ্রেণীর সব লোকের মধ্যেই ধর্মের প্রভাব অপরিসীম।[১৪২] মসজিদ পুনরুদ্ধারের গোপন আন্দোলনের[১৪৩] খবর পাওয়া যায় কাজাকিস্তান থেকে। কিরঘিজিয়ায় ১৯৩৮ সালেও ১০৬টি মসজিদ, ৪৩টি গির্জা ও ১০২টি মজহাবী এবাদতখানা ছিলো।[১৪৪]

মুসলিম রাশ্যার দূরবর্তী অঞ্চলগুলো থেকে ধর্ম-বিরোধী আন্দোলনের ব্যর্থতার সাক্ষ্যবহ বহু অলৌকিক ঘটনার কাহিনী শোনা যায়। ১৯৩৯—৪০ সালে পামীর পার্বত্য অঞ্চলের ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য ও

---

141. *sovetskaya etnografiya, 1932, 5—6,.P. 190.*
142. pravda, 19—7—40.
143. kazakhstanskaya pravada, 17—5—1940.
144. Antireligioznik, 1938, 7, P. 23.

উন্মাদনা দেখা দেয়, কারণ তাদের মধ্যে গুজব রাষ্ট্র হয়ে পড়ে যে, তাদের "জীবন্ত খোদা" আগা খান পামীর রাজ্যে দর্শন দিয়েছেন এবং জনৈক যুবককে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।[১৪৫] পামির স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের রাজধানী খোরোগে ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত ধর্মবিরোধী সম্মেলনে এই বিষয়টির উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয় যে, প্রদেশটি শত শত মসজিদ, মন্দির ও মাজারে ছেয়ে আছে এবং তরুণ-প্রবীণ সবাই এগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকে।[১৪৬]

তাজিকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন ও প্রচারণা সম্পাদক বোঝধান গাফুরোভ (গফুরভ বাবাজান) ১৯৩৮ সালে প্রকাশ করেন যে, তাজিক প্রজাতন্ত্রের ক্ষুদে জিলা ইউরা তায়ুবীতে ৫০টি মসজিদের মধ্যে মাত্র ২৯টি ছিলো রেজিস্ট্রার করা। অবশিষ্ট ২১টিই ছিলো বেআইনী।[১৪৭] তাজিকিস্তানের ৩৯টি জিলায়, সমগ্র সোভিয়েট মধ্য-এশিয়ায়, তথা সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল মুসলিম এলাকায় এ রকম বেআইনী মসজিদের সংখ্যা হতে পারে?

১৯৪২ সালে ধর্মীয় পরিস্থিতির একটা অনুকূল চিত্র তুলে ধরা সোভিয়েট সরকারেরই স্বার্থের অনুকূল ছিলো। সে সময়ে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে, সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে মোট ১,৩১২টি মসজিদ রয়েছে।[১৪৮] ১৯২৭ সালের আগে একমাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাসকিরিয়া অঞ্চলেই যতগুলো মসজিদ ছিলো, এ সংখ্যা তার অর্ধেকেরও কম। তবে যতদূর সম্ভব, এ সংখ্যায় শুধু সরকারিভাবে রেজিষ্ট্রার করা মসজিদগুলোকেই ধরা হয়েছিলো। সে বছরই সোভিয়েট ইউনিয়নে মোল্লা, শেখ ও অন্যশ্রেণীর মুসলিম ধর্মনেতাদের যে সংখ্যা (৩,৮৬২) প্রকাশ করা হয়, তা-ও অত্যন্ত অল্প; কেননা, বিশ দশকের ধর্মীয় নির্যাতন শুরুর প্রাক্কালে একমাত্র বাসকিরিয়াতেই মোল্লা শ্রেণীর সংখ্যা ছিল ৯,০০০ এবং দাস্তোনে ৪০,০০০-এর মতো।[১৪৯] কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সোভিয়েট ইউনিয়ন শুধু সরকারিভাবে রেজিষ্ট্রার করা মোল্লাদের সংখ্যাই উদ্ধৃত করতে সক্ষম হয়েছেন; তাঁদের এই হিসেবের বাইরে রয়েছে নাম-না জানা আরো অনেকে।

---

145. Antireligioznik. 1939,12. P. 31.
146. Kommunist Tajikstan, 22—10—1940.
147. *Antireligioznik, 1938,12, P. 32.*
148. *Soviet War News, 16—5–1942.*
149. *As in the Original.*

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মুসলিম জাহানের সর্বত্র বিরাজমান সৈয়দ শ্রেণীর মুসলমানদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতেন না। এই শ্রেণীভুক্ত মুসলমানেরা শেষনবীর সাক্ষাৎ বংশধর বলে দাবী করেন এবং সেহেতু মুসলিম সমাজে তাঁদের বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়। সাধারণ মুসলমানেরা ভীতিশ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের উপদেশ ও মধ্যস্থতা মেনে নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পর সাধু-সন্তের মতো তাঁদের স্মৃতিতর্পণ করা হয়।[১৫০] সৈয়দরা সচরাচর যূথবদ্ধ হয়ে একই গ্রামে বসবাস করে। ত্রিশ দশকেও সোভিয়েট আযরবাইজানে অনুরূপ বহু সৈয়দ পল্লী ছিলো, এবং এই পরিস্থিতিদৃষ্টেই জনৈক ধর্মবিরোধী লেখক মন্তব্য করেন যে, মোল্লারা নয় বরং সৈয়দরাই হচ্ছে দেশের অভিশাপ।[১৫১] মোল্লারা সমাজে স্বনামে চিহ্নিত বলে তাদের সনাক্ত করে উচ্ছেদ করা সহজ ছিলো না, কিন্তু সাধারণ কৃষকের মতো জীবনযাপনকারী সৈয়দদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ অনেকটা অসহায় ছিলেন। এই সৈয়দদের দেশময় ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসটাও কর্তৃপক্ষের বিরক্তির কারণ ছিলো, অথচ বাকুর মতো সর্বহারাদের নগরীতে উদয় হবার মতো স্পর্ধাও এদের ছিলো। কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেশের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে কতজন সৈয়দ ও অখ্যাত মোল্লা রয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা প্রধান মুফতীর পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিলো, পুলিশ প্রধানের পক্ষেও তেমনি।

মুসলমানদের সংখ্যাশক্তি সঠিকভাবে নির্ধারণের পথে আরেকটি বাধা ছিলো শিয়া সম্প্রদায়ের ' তাকিয়া' নীতি। এই নীতির অর্থ হচ্ছে বিপদ বা ক্ষতির আশঙ্কা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ধর্মীয় মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকা। এমনকি নিজের ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধী উক্তি বা কার্যে যোগদান করেও শিয়ারা এই নীতি পালন করে থাকে। তাকিয়া নীতিকে নৈতিক দিক থেকে যতই গর্হিত মনে করা হোক না কেন, বৈরীভাবাপন্ন ধর্মনিরপেক্ষ সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে শিয়া মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস রক্ষার জন্য এই নীতি একটি অমোঘ অস্ত্রের মতো কাজ করে।

মুসলিম এলাকাগুলোতে ধর্মীয় প্রতিরোধের শক্তি উপলব্ধি করে জার্মান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কয়েক মাসে নাস্তিক্যবাদী লীগ মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে তাদের তৎপরতা অভূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি করে। যেখানেই সম্ভব,

---

150. *As in the Original*
151. *As in the Original*

লীগের নতুন শাখা স্থাপন করা হয়। উজবেকিস্তানে দুই বছরের মধ্যে এক লক্ষাধিক নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হয়[১৫২] এবং তাতারিয়ায় সদস্যসংখ্যা ১৯৩৮ সালের ২৬,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৪০ সালে দাঁড়ায় ৪৫,০০০-এ।[১৫৩] তাসখন্দে মধ্য "এশিয়ায় মুসলিম মোল্লা সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা এবং জারপন্থী উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে তাদের দাসসুলভ সহযোগিতা" সংক্রান্ত চিত্তাকর্ষক নিদর্শনসমৃদ্ধ একটি মিউজিয়ম স্থাপন করা হয়।[১৫৪] এই নতুন পর্যায়ের মুসলিম বিরোধী অভিযানের ফল হয়তো সুদূরপ্রসারী হতো, কিন্তু ১৯৪১ সালের ২২ জুন নাৎসী জার্মানীর আক্রমণের মুখে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বপ্রকার ধর্মবিরোধী প্রচারণা থেকে বিরত হতে বাধ্য হয়।

"লাল মুফতী" গোষ্ঠী

নাৎসী-সোভিয়েট যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে সোভিয়েট শক্তি ও ইসলামের মধ্যে এবং নতুন সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে। এই নতুন সম্পর্কের ফল ইসলামের পক্ষে সর্বক্ষেত্রে শুভ হয়েছে বলা যায় না; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ফল বিষময় হয়েছে। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ইসলামকে একটি বিধিবদ্ধ সামাজিক সত্তা হিসেবে নির্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলো। কিন্তু ক্রেমলিনের নয়া মুসলিম নীতির প্রারম্ভকাল ১৯৪১ সাল থেকে ইসলামকে টিকে থাকতে দেয়া হয় এবং এভাবে টিকে থাকার জন্য সোভিয়েট নীতির একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়ে রাশ্যার ইসলাম বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে হেয়প্রতিপন্ন হয়।

১৯৪১ সালে যে ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়, তার মুখ্য ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় নাস্তিক কমিউনিস্ট সরকারের সমর্থনে বিবৃতি ও আবেদন প্রচার করা। বলা যেতে পারে যে, ক্রেমলিনের নবোদ্ভিন্ন ধর্মনীতির প্রধান প্রসাদভোগী রাশ্যান অর্থোডক্স চার্চের ক্ষেত্রেও এই উক্তি প্রযোজ্য। কিন্তু এই রকম সমান্তরাল টানা ঠিক হবে না। প্রথমতঃ রাশ্যান চার্চ যুদ্ধসংঘাতের মতো সংকটকালে দেশাত্মবোধের খাতিরে স্বভাবতঃই যে-কোন ধরনের রাষ্ট্রকেই সমর্থন দেবে, তা সে নাস্তিক কমিউনিস্ট হলেও। হতে পারে, চার্চ ক্ষেত্রবিশেষে বাড়াবাড়ি করেছে এবং খ্রিস্টান সহানুভূতির

---

152. *Pravda Vostoka, 16—2—1941.*
153. *Pravda, 19—7—1940.*
154. *Pravda, 22—3—1941.*

জন্য অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে বিরূপ হয়েছে, কিন্তু সোভিয়েট সরকারের প্রতি প্রদর্শিত চার্চের আনুকূল্যে আন্তরিকতার অভাব ছিলো না। প্যাট্রিয়ার্কাল চার্চের এই আন্তরিকতা মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থনে ছিলো কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে (মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত জাতিগুলো ছিল সংখ্যালঘু)। তাছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সোভিয়েট সরকারের প্রতি সমর্থনদানের জন্য মুসলমানদের চাইতে অর্থোডক্স চার্চ শিরোমণিদের কারণ ছিলো অনেক বেশি জোরালো। একদিক থেকে বলা যায় যে, অর্থোডক্স চার্চও সোভিয়েট বিজয়ের শরীক হতে পেরেছিলো; সোভিয়েটের সামরিক বিজয়ের ফলে অর্থোডক্স চার্চের এখতিয়ারও সম্প্রসারিত হয়। পক্ষান্তরে, মুসলমানেরা যুদ্ধে পরাজিত হয়; তার প্রমাণ যুদ্ধাবসানে পাঁচ পাঁচটি মুসলিম জাতির নিঃশেষ বিতাড়ন। এরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও ধর্মানুগত্যে প্রবল ছিলো। পরিশেষে, অর্থোডক্স চার্চ রাষ্ট্রানুগত্যের পারিতোষিকরূপে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা লাভে সক্ষম হয়। লক্ষ কোটি মানুষের আধ্যাত্ম জীবনের নায়কত্বে অভিষিক্ত হয়ে চার্চ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। সেই তুলনায় মুসলমানেরা তাদের সহযোগিতার বিনিময়ে যা পায়, তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তারা কোন ক্রমেই একটি শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। সোভিয়েট সহযোগী অর্থোডক্স চার্চের নেতারা নিজের অধিকারে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁদের মুসলিম সহযোগীরা বা তথাকথিত " লাল মুফতীরা" ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েট প্রচারযন্ত্রের সৃষ্টি। তাঁরা ছিলেন সিপাই ছাড়া সিপাহ্সালার।

লাল মুফতীদের মধ্যে সর্বপ্রথমে যিনি সুবিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করেন, তিনি হচ্ছেন উফার আবদুর রহমান রাসুলায়েভ। যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁকে "সোভিয়েটের ইসলামী ধর্মীয় কেন্দ্রসমূহের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রধান" বলে অভিহিত করা হতো; বেসরকারিভাবে তিনি "সোভিয়েট মুফতী" নামেই সমধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন। যুদ্ধের প্রথমদিকে সলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সোভিয়েট সমর্থক ও নাৎসী বিরোধী বিবৃতিদানের জন্য একজন মুসলমানের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাসুলায়েভ সন্তোষজনকভাবেই এই ভূমিকা পালন করেন, তবে বাসকিরিয়া ও তাতারিয়ার বাইরে তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিলো কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। নাৎসী আক্রমণের অব্যবহিত পরেই রাসুলায়েভের দেশপ্রেমিকোচিত কার্যকলাপ শুরু হয়। সোভিয়েটের মুসলিম জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম ভাষণ

প্রচারিত হয় ১৯৪১ সালের ১৮ জুলাই। এই ভাষণে তিনি "মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে লাল ফৌজের বিজয়ের জন্য মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করার এবং ন্যায়াদর্শের জন্য সংগ্রামরত সন্তানদের আশীর্বাদ করার জন্য সোভিয়েট মুসলমানদের নিকট আবেদন জানান। এর ছয় সপ্তাহ পরে প্রচারিত দ্বিতীয় আবেদনে তিনি মুসলমানদের কাছে "ধর্মের নামে" সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।[১৫৫]

সোভিয়েট বেতার ও বৈদেশিক প্রচারণার জন্য নিয়োজিত অন্যান্য মাধ্যম রাসুলায়েভকে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ যত্ন নেয়। জেরুজালেমের নাৎসী সমর্থক গ্র্যান্ড মুফতী আলহাজ আমীন-আল-হোসাইনীর স্বপক্ষে পরিচালিত নাৎসী ও অক্ষ-শক্তির প্রচারণাকে অকার্যকরী করাই ছিলো এর প্রধান লক্ষ্য। "সোভিয়েট মুফতী কর্তৃক হিটলার মুফতীর স্বরূপ প্রকাশ" শিরোনামে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে রাসুলায়েভ তাঁর নাৎসী প্রতিপক্ষের নিন্দা করে বলেন যে, এই ধর্মদ্রোহী মুফতী তাঁর পূর্বপুরুষের ধর্মের প্রতি অবমাননা করে স্বেচ্ছায় নাৎসী দেবতা, ওটানের পূজায় আত্মনিবেদন করেছেন।[১৫৬]

১৯৪২ সালের মে মাসে সোভিয়েট ইউনিয়নের ৮৫ জন মুসলিম ধর্মনেতার এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে রাসুলায়েভ অতিথি সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য ছিলো মুসলমানদের নিকট আবেদন ঘোষণা করে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সমর্থ দান করা। সম্মেলনের ঘোষণায় কোরানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, "শত্রুর সাথে আপোষ করো না, বিজয়লাভে অগ্রসর হও" এবং "শত্রুকে যেখানে পাও, খতম করো।"[১৫৭] স্মৃতিচারণপ্রসঙ্গে পরে রাসুলায়েভ প্রকাশ করেন যে, সম্মেলনে ক্রিমিয়ার নাৎসী নৃশংসতার লোমহর্ষক বিবরণ প্রচার করা হয় এবং কমিউনিস্টরা ইতিপূর্বেই যে-সব অপরাধের কুখ্যাতি অর্জন করেছিলো, নাৎসীদের সে-সব অপরাধের জন্য নিন্দা করে "মসজিদ ভাঙ্গা, পবিত্র নিদর্শন অপসারণ, এবাদত নিষিদ্ধকরণ" এবং "সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুসলমানদের জাতীয় ও ধর্মীয় রীতি নীতি পদদলনের" অভিযোগ করা হয়। আরো অভিযোগ করা হয় যে, নাৎসীরা মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো পুড়িয়ে ফেলেছে এবং মুসলমানদের নবজাত

---

155. *Stanley Ewen : The Churches of the USSR, P. 151.*
156. *As in the Original.*
157. *As in the Original.*

শিশুদের ইসলামী প্রথা-অনুসারী নামকরণ বন্ধ করে দিয়েছে।[১৫৮] উফার এই সম্মেলনের প্রবক্তারা নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রারম্ভের প্রাক্কালেই কমিউনিস্টরা নিজেরাই ক্রিমিয়ার ইসলামের প্রায় নামনিশানা মুছে দিয়েছিলো, নাৎসীদের ধ্বংস করার জন্য তেমন কিছু আর অবশিষ্ট ছিলো না। বস্তুতঃ ক্রিমিয়ার তাতার জাতীয়তাবাদীরা জার্মান দখলকারী কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার ফলেই নতুন করে ৫০টি মসজিদ চালু করতে সক্ষম হয়।[১৫৯] সোভিয়েট বাহিনীর ক্রিমিয়া পুনর্দখলের পর এই মসজিদগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ক্রিমিয়ায় তাতার মুসলমানদের পাইকারীভাবে সোভিয়েটের অন্যান্য এলাকায় নির্বাসিত করা হয়।

১৯৪৩ সালে রাসুলায়েভ ও তাঁর সদর দফতর উফার প্রাধান্য স্তিমিত হয়ে আসে। সেই বছরই অক্টোবর মাসে তাসখন্দে মধ্য-এশিয়ার ৫টি সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের মুসলিম যাজক ও নেতাদের এক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসেই মধ্য-এশিয়া ও কাজাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য ধর্মতাত্ত্বিক প্রশাসন সংগঠন করা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে এই সংগঠনই মুসলমানদের সোভিয়েট সমর্থনমূলক বিবৃতি প্রচারের মাধ্যমে পরিণত হয় এবং রাসুলায়েভের প্রভাব ক্রমশঃ ম্লান করে দিয়ে এই সংগঠনের চেয়ারম্যান মুফতী আহসান বাবাখান ইব্‌ন আবদ আল-মাজদ খান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী জিয়া আল-দীন বাবাখানোভ প্রধান "লাল মুফতীর" স্থান অধিকার করেন।

১৯৪৪ সালের মে মাসে ট্রান্সককেশিয়ান মুসলমানেরাও স্বতন্ত্র পন্থার অনুসারী হয়। বাকুকে তাদের এক কংগ্রেস (কুরুলতাই) অনুষ্ঠিত হয় এবং আযরবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া থেকে ৬০ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসের একটি বাণী চরম দাসসুলভ মনোবৃত্তির জন্য বিশেষ উল্লেখ্য। বাণীতে স্তালিনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে তাঁকে "ঐশী প্রেরিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান" বলে অভিহিত করা হয়।[১৬০] ট্রান্সককেশিয়া মুসলিম কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ফলে আরেকজন "লাল মুফতীর" আবির্ভাব ঘটে। ইনি হচ্ছেন শেখ-উল ইসলাম আখুন্দ আগা আলী জাদে। সোভিয়েট সরকার এঁকে প্রধানতঃ পারস্য ও ইরাকের

---

158. *As in the Original.*
159. *As in the Original.*
160. *Soviet War News, 31-5-1944.*

শিয়া মুসলমানদের মধ্যে সোভিয়েটের সুখ্যাতি প্রচারের জন্যই ব্যবহার করেন।[১৬১]

যুদ্ধের শেষদিকে আরো একটি মুসলিম কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ককেশাস ও দাগেস্তানের জন্যই হয় এটির পত্তন। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েই এঁর যাত্রা শুরু হয়; কারণ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ক্ষণকাল পূর্বেই এই পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত তিনটি মুসলিম অনুজাতিকে পৈতৃক বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। এরা হচ্ছে বালকার কারাচাই, চেচেন ও ইনগাশ অনুজাতিত্রয়। যদিও এরা মুখ্যতঃ জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগেই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের অসন্তোষের পাত্র হয়ে পড়ে, তবুও এদের দুর্বিপাকের আসল কারণ হলো ইসলামের প্রতি এদের অনড় আনুগত্য, এবং এজন্যে সোভিয়েট সরকার এদের বরাবরই সন্দেহের চক্ষে দেখতেন।

তাসখন্দ, বাকু ও বুইনাকস্ক (দাগেস্তান)—এ তিনটি মুসলিম কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ফলে উফা মুফতীর এলাকা ও প্রভাব ভল্গা-উরাল অঞ্চল, সাইবেরিয়া ও রাশিয়ার বৃহত্তর শহরগুলোর মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। এর ফলে প্রাক্-বিপ্লব জার শাসনামলের অবস্থারই পুনরাবর্তন ঘটে এবং উফার মুফতীর প্রভাবাধীন এলাকার ব্যাপ্তি জার আমলের সমায়তনিক হয়। উফার (বা সাবেক ওরেনবুর্গের) মুফতী পদটির সৃষ্টি ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে, রুশসম্রাজ্ঞী, দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে।

সোভিয়েট ইসলাম রফতানী প্রচেষ্টা

যুদ্ধকালে আরো কয়েকটি বিভিন্ন সোভিয়েট মুসলিম সংস্থার প্রতি সরকারি স্বীকৃতি আকৃষ্ট হয়। যুদ্ধপরিস্থিতির বিশেষ প্রয়োজনে গড়ে উঠলেও এই সংস্থাগুলোর দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও ছিলো। যুদ্ধের সময়েই মিসর, ইরাক ও সিরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি মুসলিম দেশের সঙ্গে সোভিয়েট কূটনৈতিক সম্পর্কের সম্প্রসারণ ঘটে এবং সৌদী আরবের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে ইসলাম ধর্মের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিশ্বস্ত ও অনুগত মোল্লাদের প্রচারণার ফলে মুসলিম বিশ্বে সোভিয়েট প্রভাব বৃদ্ধি অনিবার্য ছিলো। বিভিন্ন মুসলিম কংগ্রেসের অনুষ্ঠান সোভিয়েট কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের, বিশেষতঃ কায়রো ও তেহরানের সোভিয়েট মিশনগুলোর হাতে অমূল্য প্রচারণাসম্পদরূপে ব্যবহৃত হয়। এই তৎপরতাসম্ভূত অনুকূল প্রতিক্রিয়ায় সোভিয়েট সরকারের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে,

161. *Societ War News, 11—10—52.*

সোভিয়েট ইসলাম ভাবসম্পদের বিনিময় বাণিজ্যে একটি মূল্যবান রফতানী পণ্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। যুদ্ধোত্তর যুগে হয়েছিলো তাই। সোভিয়েট মুসলিম নেতারা স্বদেশে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রহিসেবে বিবেচিত না হলেও, সকল গুরুত্বপ্রশ্নে ক্রেমলিনের নীতিকে প্রাচ্য জাতিসমূহের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপিত করার জন্য কমিউনিস্ট সরকার তাঁদের অনবরত ব্যবহার করেন। সোভিয়েট মুসলিম সংস্থাবলী এবং শীর্ষস্থানীয় মুফতী ও ইমামদের রাজনৈতিক বিবৃতির সংখ্যা বেশুমার। এগুলোর প্রকৃতি ও প্রতিপাদ্যের প্রতিধ্বনিমূলক কয়েকটি নমুনার উদ্ধৃতিই যথেষ্ট হবে। আন্তর্জাতিক সমস্যাদি সম্পর্কে কমিউনিস্টদের বিতর্কমূলক রচনায় যে-সব ধারালো কথার অঢেল ব্যবহার হয়, এইসব বিবৃতিতেও সেই সব কথা চুটিয়ে ব্যবহার করা হয়। এইসব বিবৃতির নিন্দার বিষয়বস্তু ছিলো "মার্কিন ও ব্রিটিশ জঙ্গীবাদদের ধৃষ্টতা", "মার্কিন সৈন্যদের অমানুষিক অপরাধ।" "মানবতার বিরুদ্ধে মার্কিন বর্বরদের নতুন অপরাধ" প্রভৃতি (শেষোক্তটি কোরীয় যুদ্ধ প্রসঙ্গে)। "মার্কিন আগ্রাসীদের চাপ ও প্ররোচনায় আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ লঙ্ঘন" ও পশ্চিম জার্মানীতে "জঙ্গীবাদ পুনঃস্থাপনের" জন্য লজ্জাকর চুক্তিসম্পাদনের নিন্দা করে নাটো, সীটো ও সেন্টো এবং জাপানের সঙ্গে সানফ্রানসিস্কো চুক্তি সম্পাদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। বিশ্ব-শান্তি পরিষদের সকল উদ্যম, আবেদন ও কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। ১৯৫৬ সালের ইঙ্গ-ফরাসী ইসরাইলী সুয়েজ আক্রমণকে "সর্বশক্তিমানের অলঙ্ঘ্য বিধানের বিরুদ্ধে" অপরাধ বলে নিন্দা করা হয় এবং ১৯৫৭ সালে "সিরিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্কের সশস্ত্র হামলার" নিন্দা করা হয় (যদিও সোভিয়েট প্রচারবিদদের কল্পনারাজ্যের বাইরে এই হামলার অস্তিত্ব ছিলো না)।[১৬২] ১৯৬৮ সালে এইসব বিবৃতিতে আলজিরিয়ার মুসলমানদের নির্যাতনের নিন্দা করে তাদের জন্য সেই স্বাধীনতার দাবী করা হয় যার আস্বাদ থেকে সোভিয়েটের মুসলিম জাতিগুলো চিরবঞ্চিত।[১৬৩]

এই বিবৃতিগুলোর কোন কোনটি সোভিয়েট প্রচার যন্ত্রগুলো থেকে প্রচারিত হতো, কিন্তু অন্যগুলো "লালমোল্লারা" নিজেরাই পাঠ করতেন আরবি ও ফারসীতে তাঁদের প্রচারমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। সাধারণভাবে সোভিয়েট বহির্ভূত প্রাচ্যের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এই সব বিবৃতিতে বহুসংখ্যক বিদেশী মুসলিম ধর্মনেতার নামও উল্লেখ করা হতো। রাজনৈতিক গালিগালাজের মাঝে মাঝে

162. মস্কো বেতারের আরবি অনুষ্ঠান, ২৫-১০-৫৭।
163. মস্কো বেতারের অনুষ্ঠান, ৭-১০-৫৮।

কোরানের উদ্ধৃতির ফোঁড়নও দেয়া হতো প্রচুর, এবং আল্লাহ্‌র কাছে নির্বন্ধাতিশয্যে আবেদন করা হতো সোভিয়েট ইউনিয়নের শত্রুদের নিপাত করার, আরব জাতির মাতৃভূমি থেকে ইঙ্গ-মার্কিন অশুভ শক্তি বিতাড়নের কিংবা ইঙ্গ-ফরাসী-ইসরাইলী শক্তিচক্রকে চরম নির্যাতনে পর্যুদস্ত করার জন্য।

সোভিয়েট রাষ্ট্র পত্তনের পর বহুকাল পর্যন্ত সোভিয়েট মুসলমান নেতাদের কাছ থেকে শুধু বক্তৃতা বিবৃতির সাহায্যই প্রত্যাশা করা হতো, কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে সোভিয়েট ও কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার হবার সাথে সাথেই তাঁদেরকে আরো নানারকম সেবায় নিযুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন থেকেই "লাল মুফতীরা" বৈদেশিক মুসলিম প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনায় নিজেদের ভূমিকা পালন ও পবিত্র স্থানসমূহ জেয়ারতের আবরণে বিদেশে প্রচারণামূলক সফরে গমন করতে শুরু করেন। বৈদেশিক মুসলিম প্রতিনিধিদলের জন্য আয়োজিত কূটনৈতিক অভ্যর্থনায় মস্কো মসজিদের ইমামের উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে লাল মুফতীরা স্বচ্ছন্দে বিদেশী মুসলমানদের সাহায্যের জন্য অর্থ প্রেরণ করার অধিকারও লাভ করেন। এভাবেই তাঁরা সুয়েজ হামলার শিকারদের ও পাকিস্তানের বন্যার্তদের জন্য সাহায্য প্রেরণে সক্ষম হন। তাসখন্দে সফরকারী মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের জন্য মধ্য-এশিয়া ও কাজাকস্তানের প্রধান মুফতীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার একটি রুটিন ব্যাপারে পরিণত হয়ে যায়। অনুরূপ তাসখন্দ সফরকারী মুসলিম রাষ্ট্রানায়কদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ (১৯৫৬)[১৬৪] ও যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসেরের (১৯৫৪)[১৬৫] নাম করা যেতে পারে।

নাসের যে প্রধান মুফতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনি ছিলেন জিয়া আল-দীন বাবাখানোভ। এই মহাপুরুষের অমৃত নাম ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থোডক্স চার্চে তাঁর তুল্য পদে অধিষ্ঠিত নিকোলায়ের অনুধ্যানে তাঁকে "মুসলিম মেট্রোপলিটান নিকোলায়ে" বলা যেতে পারে। সোভিয়েটের সেবায় প্রভুভক্তির ক্ষেত্রে তাঁরা শুধু একেই অন্যের তুলনা হতে পারেন। বাবাখানোভ এই সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন প্রথমে তাঁর বৃদ্ধ পিতার আড়ালে আসল শক্তিরূপে (এই বুড়ো খুনখুনে ৯৮ বছর বয়সে ১৯৫৭ সালে এন্তেকাল করেন) ও পরে সোভিয়েটের বৃহত্তম মুসলিম সংগঠনের নির্বাচিত প্রধান হিসেবে। ক্রেমলিনের আশীর্বাদে তিনি

---

164. *প্রাভদা ভোস্টক, ৫-৯-৫৬।*
165. *প্রাভদা, ৫-৫-৫৮।*

সোভিয়েট আরব মৈত্রী সমিতি প্রভৃতি আধা-সরকারি সংগঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে এবং সরকারি ও আধা-সরকারি কাজে প্রচুর বিদেশভ্রমণ করতে সক্ষম হন। তিনি দামেস্কে যান একজন লালপন্থী শেখকে সোভিয়েট শান্তিপদকে ভূষিত করতে, স্টকহলমে যান কমিউনিস্ট উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগদান করতে এবং দিল্লী যান বিশ্ব-ধর্মকংগ্রেসে অংশগ্রহণ করতে, মক্কা ও মদীনায়ও তিনি পদার্পণ করেন হজ উপলক্ষে। সোভিয়েট সরকার শুধু বাবাখানোভকে নয়, আরো বহুসংখ্যক পদস্থ মুসলিম ধর্মনেতাকে হজে গমনের অনুমতি দেন।

বহু বছর বিরতির পর আবার হজে গমনের অনুমতি দান সোভিয়েট নয়া মুসলিম নীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম হজ যাত্রী দলটিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ত্যাগের অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত হজ গমনেচ্ছুদের এইভাবে অনুমতি দেয়া হতে থাকে, কিন্তু সে বছরই কলেরা মহামারীর জন্য অনুরূপ অনুমতিদান অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্তালিনের জীবনের শেষ কয়েক বছর হজযাত্রা বন্ধ করে দেয়া হয়, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীরা শুধু এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেননি, একটা প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে তাঁরা সাগ্রহে হজযাত্রায় উৎসাহদান করতে শুরু করেন। তবে যাকে তাকেই হজযাত্রায় অনুমতি দেয়া হতো না; কমিউনিস্টদের সমর্থক বলে যে-সব মুসলমান পরিচিত ছিলেন এবং যাঁরা এই হজযাত্রার উপলক্ষকে প্রচারণার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে অন্যথা করবেন না বলে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করতেন, শুধু তাঁদেরই হজযাত্রার অনুমতি দেয়া হতো। সরকারিসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার কখনো একবারে ২/৩ ডজনের বেশি লোককে হজে যাওয়ার পারমিট দিতেন না, আর এই ভাগ্যবান ২/৩ ডজনকেও পারমিটপ্রার্থীদের মধ্য থেকে সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করা হতো।

আরব-বিশ্বে সোভিয়েট হজযাত্রীদের প্রচারণার ত্রিধারা হচ্ছে : সোভিয়েট ইউনিয়নে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা জাহির করা,[১৬৬] দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েট মুসলমানদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্বের গুণকীর্তন করা[১৬৭] এবং তৃতীয়তঃ সোভিয়েট ইউনিয়নকে শান্তির অজেয় দুর্গ ঘোষণা করে মুসলিম দেশগুলোকে সোভিয়েট সমর্থনপুষ্ট শান্তি আন্দোলনে যোগদানে প্রলুব্ধ করা। তারা প্রায়শঃ প্রত্যাবর্তনের পথে কায়রো গিয়ে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন

166. As in Original Text.
167. As in Original Text.

করতো এবং "মুসলিম ধর্মচেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাবসম্পন্ন" সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি শুভেচ্ছা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন ও সংবর্ধনার আয়োজন করতো।

যুদ্ধোত্তর যুগে সোভিয়েট ইউনিয়নে ইসলাম

যুদ্ধোত্তরকালে আনুষ্ঠানিক সংস্থাগতভাবে ইসলাম কোনমতে টিকে থাকে, তবে মধ্যপাচ্যে ক্রেমলিনের তৎপরতা ও প্রভাব বৃদ্ধির ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। যুদ্ধের সময় স্তালিন যে নয়া ধর্ম-নীতির উদ্বোধন করেন, তার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বহুসংখ্যক মসজিদকে পুনরুন্মুক্ত করা হয়। প্রধানতঃ তাতার জাতীয় মুসলিম সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গোর্কী, ওমস্ক, নবোসিবির্স্ক ও অন্যান্য শহরে ১৯৪৪ সালের শেষদিকের মধ্যেই প্রায় সব মসজিদই আবার সজীব হয়ে ওঠে। রাসুলায়েভ সগর্বে ঘোষণা করতে পারতেন যে, একমাত্র তাঁর এলাকার মধ্যেই দশ দশটি নতুন মসজিদ গড়ে উঠেছে। তাঁর নির্বিশেষ প্রভুভক্তির বিনিময়ে এই "বখশিস" খুবই কম ছিলো বলতে হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে আরো বহু মসজিদ পুনরুন্মুক্ত হয় কিংবা তাদের অস্তিত্ব আইনসম্মত করে দেয়া হয়। অর্থোডক্স ধর্ম সম্প্রদায়গুলোর ভারপ্রাপ্ত সোভিয়েট কর্মকর্তা পোলিয়ানস্কি ১৯৪৭ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা ৩,০০০ বলে ঘোষণা করেন। এই সংখ্যা যুদ্ধের প্রারম্ভকালীন সংখ্যার চাইতে প্রায় ১,৭০০ বেশি।[১৬৮] তিন বছর পর মধ্য-এশিয়ার প্রধান মুফতী বিদেশী সফরকারীদের কাছে এই সংখ্যার পুনরুক্তি করেন।[১৬৯] স্তালিনের মৃত্যুর পর এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৫৭ সালে মুফতী বাবাখানোভ "অতি সম্প্রতি" কেবল মধ্য -এশিয়াতেই ৫০টি "নয়া গ্র্যান্ড মসজিদ" উদ্বোধন করা হয়েছে বলে ঘোষণা করতে সক্ষম হন।[১৭০] সেই বছরই একটি সোভিয়েট সরকারি সংস্থা ঘোষণা করে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে ৮,০০০টি "মুসলিম সম্প্রদায়" রয়েছে।[১৭১] "সম্প্রদায়" কথাটি "মসজিদ"-এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। সম্প্রদায় বলতে হয়তো মুসলমানদের বিভিন্ন গ্রুপ বোঝানো হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে পুরাতন, নতুন ও পুনরুদ্‌ঘাটিত মসজিদসংক্রান্ত পরিসংখ্যান অত্যন্ত অপ্রতুল, অনির্ভরযোগ্য ও প্রায়শঃ পরস্পরবিরোধী, তবে

---

168. *As in Original Text.*
169. *As in Original Text.*
170. *As in Original Text.*
171. *মস্কো নিউজ, ১৩-৩-৫৭।*

পঞ্চাশের দশকে সোভিয়েট ইউনিয়নে ইসলামের অবস্থা সম্পর্কে বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যাবলী। অসাবধানতার সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনা ও যাচাই করে দেখলে যে-চিত্রটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

বহুসংখ্যক রুশপ্রধান শহরে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় চেতনা এতোই প্রবল যে, সে-সব শহরে ধর্মীয় নির্যাতনের আমলে বন্ধ করা মসজিদগুলো সরকার পুনরুদ্‌ঘাটিত করতে বাধ্য হন। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উফা-র মসজিদ (এখনো পর্যন্ত ইউরোপীয় রাশ্যার ও সাইবেরিয়ার প্রধান মুসলিম ধর্মীয় কেন্দ্র)। এ ছাড়া মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মসজিদের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবের দিন উফা-র মসজিদে তিন-চার হাজার লোকের জমায়েত হয়। মস্কো মসজিদটি সাধারণ শুক্রবারের জমায়েতেও ঠাসাঠাসি ভর্তি হয়ে যায় (এই মসজিদে একসঙ্গে ২,৫০০ লোকের জমায়েতের ব্যবস্থা আছে)। মস্কোর লক্ষাধিক মুসলমানের জন্য এই একটিমাত্র মসজিদ মোটেই যথেষ্ট নয়।

মুসলিম বিশ্বে সোভিয়েট প্রচারণার ক্ষেত্রে মস্কো মসজিদটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মস্কোস্থ সকল মুসলিম কূটনৈতিক মিশনের সদস্যগণ এই মসজিদের জমায়েতে মিলিত হন এবং প্রায় সকল সফরকারী মুসলিম প্রতিনিধিদলই এই মসজিদ পরিদর্শন করে যান।[১৭২] কাজেই মস্কোর ইমাম সোভিয়েট মুসলিম নীতির সাধারণ কাঠামোর ভেতর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ক্রেমলিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। তাঁর খোৎবায় একটা প্রবল রাজনৈতিক সুর ধ্বনিত হয়। জার আমলে বোখারার আমীরকর্তৃক নির্মিত লেনিনগ্রাদ মসজিদটি ১৯৫৬ সালে সংস্কার করে পুনরুদ্‌ঘাটিত করা হয়। লেনিনগ্রাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রয়োজনের প্রতি সোভিয়েট সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, কিন্তু লেনিনগ্রাদ সফরকারী বৈদেশিক মুসলিম প্রতিনিধিদল সমূহের সংস্কার সম্পর্কে উদাসীন থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ফলে লেনিনগ্রাদের ইমামও সোভিয়েট প্রচারণায় একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেন এবং সোভিয়েট বেতারে প্রায় মস্কো ইমামের সমান গুরুত্বসহকারে তাঁর বাণীর উদ্ধৃতি দেয়া হতো, তাতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নাই।

ককেশিয়া ও ট্রান্সককেশিয়ার মুসলিম ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারি

---

172. *মস্কো নিউজ, ১৩-৩-৫৭।*

সূত্র থেকে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। আযরবাইজানের শিয়া মুসলমানদের সাথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ সুন্নীদের চাইতে অনেক কম। এর মানে এই নয় যে, এসব অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য ছিলো। বিদেশী পর্যটকদের শুধু বাকু প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ শহরে সফর করার অনুমতি দেয়া হতো; তাঁদের প্রায় সবার বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, এ-সব এলাকায় ধর্মের চিহ্নমাত্রও মুছে ফেলা হয়েছিলো।[১৭৩] কিন্তু সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ অবগত ছিলেন যে, বাকুর মুসলমান জনসাধারণের ও এপশেরোন অঞ্চলের শ্রমিক বসতিগুলোতে গোপনে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান পুরোদমেই চলছিলো।[১৭৪] তাঁরা আরো জানতেন যে, "বেআইনী" মোল্লারা তাঁদের অনুসারীদের জন্য নিজের বাসস্থানকেই প্রার্থনালয়ের মতো ব্যবহার করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে টেপ রেকর্ডিংয়েরও ব্যবহার করতেন। খুবই আশ্চর্যের কথা এই যে, "বেআইনী" মোল্লাদের মধ্যেও বহুসংখ্যক মহিলাও ছিলেন।[১৭৫]

আযরবাইজানের প্রোলেতারিয়ান ও আন্তর্জাতিকীকৃত রাজধানী অপেক্ষা দূর পল্লী প্রত্যন্তেই ইসলাম জীবিত থাকে বেশি প্রাণশক্তি নিয়ে। আযরবাইজানের মানচিত্র জুড়ে অনেকগুলো "কৃষ্ণচিহ্নিত" স্থান আছে। এই সব স্থানের অধিবাসীদের বিরুদ্ধেই কর্তৃপক্ষ বরাবর নিন্দা করে আসছেন যে, এরা বড়ই পশ্চাদপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ধর্মের পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এসব জায়গায় মুসলিম পুরনারীরা এখনো পর্দাবৃত থাকেন, মোল্লারা অব্যাহত প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং স্থানীয় কমিউনিস্টরা এখনো ক্রেমলিনের বিশ্বাসভাজন হতে পারেনি। এই "কৃষ্ণচিহ্নিত" অঞ্চলগুলো হচ্ছে নাখিচেভান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, উত্তর-আযরবাইজানের নুখা ও কুবা শহর ও পারস্য সীমান্তের নিকটবর্তী লেনকোরান, লেরিক ও য়ারডিমলী জিলা।[১৭৬]

সরকারি সূত্রের তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহু বছর পরেও আযরবাইজান শিয়া মুসলমানদের পূর্বোল্লিখিত "তাকিয়া" নীতি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষ বারংবার আবিষ্কার করেন যে, "অনুন্নত জনসাধারণের" নিকট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তাঁরা স্থানীয় সোভিয়েট কর্তাব্যক্তিদের উপর

173. *As in Original Text.*
174. *As in Original Text.*
175. *As in Original Text.*
176. *As in Original Text.*

নির্ভর করতে পারেন না। এঁদের অনেকেই প্রকাশ্যে নাস্তিক্যদর্শন প্রচার করলেও গোপনে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপ্রাণ। এই রকম আদর্শের দ্বৈতবাদ যখনই আবিষ্কার হয়ে পড়তো, কমিউনিস্ট হেডকোয়ার্টারে তখনি অপার বিস্ময়ের সঞ্চার হতো; কিন্তু এ সব আবিষ্কার থেকেই আমরা কমিউনিস্টদের ইসলাম নিরোধ প্রচেষ্টার জটিলতা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারি। কয়েকটি "আবিষ্কারের" চমকপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা যাক। নাস্তিক্যদর্শনের জনৈক খ্যাতনামা প্রবক্তা গোপনে তাঁর "ভূতে-পাওয়া" ছেলের ভূত তাড়াবার জন্য মোল্লার শরণনেন।[১৭৭] শহর কমিটি কমসমলের জনৈক ফার্স্ট সেক্রেটারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষিকাকে বিয়ে করতে গিয়ে শরীয়তের সকল নিয়মকানুন পুংখানুপুংখরূপে পালন করেন।[১৭৮] এই রকম আরো যে কত ঘটনা অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নাই। আযরবাইজানের মতো "উন্নত সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের" অবস্থাই যদি এই হয়, তাহলে রক্ষণশীলতার জন্য সুবিদিত উত্তর-ককেশিয়ার অবস্থা কি হতে পারে, তা দেখার মতো। উত্তর-ককেশাসবাসী মুসলমানদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোকদের ১৯৪৪ সালে মধ্য-এশিয়ায় নির্বাসিত করা হয়, কিন্তু ১৯৫৬ সালে ও তার পরে তাদের সাবেক পার্বত্য বসতিতে পুনর্বাসিত করা হয়। যারা এই বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলো, তারাই হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। এদের মধ্যে ছিলো দাগেস্তানী, কাবার্ডিনীয় ও চারকেস মুসলমানেরা। স্তালিন এদেরকে পাইকারী হত্যার জন্য চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু অন্য অপেক্ষাকৃত কম উপদ্রুত মুসলিম সম্প্রদায়গুলো থেকে এদের মধ্যেই ইসলাম বেঁচে থাকে বেশি সবলতার সঙ্গে। চেচেন ও ইনগাসদের এক যুগেরও অধিককাল ধরে পারিয়ার মতো ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের কাজাকিস্তানের সমবায় ও রাষ্ট্রায়ত্ত কৃষি খামারগুলোতে দিনমজুরের মতো নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক দীক্ষাদানের যোগ্য বলেও বিবেচনা করা হয়নি এবং তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা করাও সবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হয়নি। বারো বছর নির্বাসনের পর মাতৃভূমিতে পুনর্বাসিত হওয়াসত্ত্বেও ইসলামে তাদের অনুরাগের গভীরতা এবং সোভিয়েট শাসনের প্রতি তাদের বীতশ্রদ্ধার

---

177. *As in Original Text.*
178. *As in Original Text.*

তীব্রতা যেমনকার, তেমনি থেকে যায়। পুনঃস্থাপিত চেচেন ইনগাস স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রকে আবার "প্রতিক্রিয়াশীলদের" বিশেষ করে প্রাচীন রীতিনীতি ও শরীয়তের পাবন্দ্ মুসলমানদের, "মানুষ" করার কাজে কোমর বেঁধে লাগতে হয়।[১৭৯]

চেচেন-ইনগাস প্রজাতন্ত্রের মুসলিম ধর্ম-জীবনের একটা বিশেষ সমস্যা হলো "কুন্তা হাজী সম্প্রদায়" নামে একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব। কুন্তা হাজী নামে জনৈক মুসলিম সন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত বেশির ভাগ লোকই ছিলো দরিদ্র চাষী। গৃহযুদ্ধের সময় এরা কমিউনিস্টদের পক্ষ সমর্থন করেছিলো; তাই এই সম্প্রদায়কে দমন করা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। সোভিয়েট শাসন, নির্বাসন, পুনর্বাসন, এতসব বিপর্যয় সত্ত্বেও এরা পর্যুদস্ত না হয়েও বরং তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় এবং সরকারের ধর্মবিরোধী প্রচারকদের একটি বিরাট মাথা-ব্যথার কারণ হয়ে থাকে।

অ-নির্বাসিত পাহাড়ী মুসলমানদের ধর্মজীবন সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য আমরা ছোট্ট শহর দারবেন্তের অবস্থাকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। এই শহরের মসজিদে ৫,০০০ লোকের জমায়েতের ব্যবস্থা আছে এবং প্রতি শুক্রবার লোকের ভিড়ে মসজিদটিতে তিলধারণের স্থান থাকে না।[১৮০] এই থেকেই দাগেস্তানী পার্বত্য বসতিগুলোতে মুসলমানদের ধর্মজীবনে প্রাণচাঞ্চল্যের অনুসিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। মনে হয়, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এই ধারণায় উপনীত হন যে, দাগেস্তানীদের যতদিন পর্যন্ত তাদের দুর্গম পার্বত্য আবাসভূমিতে থাকতে দেয়া হয়, ততদিন পর্যন্ত তাদের ইসলাম দমন করা সম্ভব হবে না, তাই ১৯৫৮ সালে তাঁরা সমতল ভূমিতে তাদের বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের অধিবাস মধ্য-এশিয়ার চিত্রটি নানা স্থানীয় বৈচিত্র্যের রং-এ রঞ্জিত। কাজাকিস্তানেই ইসলামের প্রভাব ক্ষীণতম ছিলো বলে মনে হয়। স্থানীয় সোভিয়েট সমর্থক মুসলিম নেতারাই স্বীকার করেছেন যে, এই প্রজাতন্ত্রে মোটে ৬টি মসজিদ রয়েছে এবং এগুলোর অধিকাংশই আলমা আতা, সেমিপালাতিনেক, তুর্কিস্তান ও ঝাম্বুলে। আলমা আতার সাবেক ১৮টি মসজিদের মধ্যে এই একটিই মাত্র টিকে আছে। এটি একটি সাধারণ ধরনের

---

179. *গাওজেনস্কীই, ৩১-১-৫৮।*
180. *মস্কো বেতারের আরবি অনুষ্ঠান, ২৩-১১-৫৯।*

কাঠের দালান মাত্র—মসজিদ বলে চেনা যায় শুধু এর চূড়োয় চাঁদতারার প্রতীক দেখে। কাজাকিস্তানের মসজিদগুলোতে ইসলামিক পবিত্র দিবসগুলোতেও জমায়েত হয় খুব ছোট। তার মানে এ নয় যে, এখানে ইসলাম দমন প্রয়াসের ব্যাপ্তি এতো বেশি ছিলো যে, পুনরুদ্ধার প্রয়াস দুরূহ হয়ে পড়েছে। আসলে মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য স্থায়ী বসতিকারীদের, বিশেষতঃ উজবেকদের চাইতে সাবেক যাযাবর কাজাকদের মধ্যে ইসলামের প্রভাব বরাবরই অনেক কম ছিলো।

উজবেকিস্তানে এখনো মধ্য-এশিয়ার, এমন কি, সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। এখানে একটি ভীতচকিত ইসলামিক পুনর্জাগরণ সংঘটিত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাসখন্দ শহরে আবার ১৭টি বড় ও ৫০টি ক্ষুদ্র মসজিদের উদ্বোধন করা হয়েছে। এগুলোর মিলিত সংখ্যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালীন সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের সমান। তাসখন্দের কেন্দ্রীয় মসজিদ (তিল্লাহ্ শেখ মসজিদ)-এ গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দিবসগুলোতে ন্যূনাধিক ১০,০০০ লোক নামাযের জমায়েতে শরীক হয়।[১৮১] এমনি সাধারণ শুক্রবারগুলোতেও ৩,০০০-এর কম লোক হয় না। মধ্য-এশিয়ার প্রধান মুফতী এই মসজিদেই ইমামতী করে থাকেন।[১৮২]

ইসলামের আদিযুগের পবিত্র স্মৃতিধন্য সুপ্রাচীন সমরখন্দ শহরের সাবেক ১০৫টি মসজিদের মধ্যে মাত্র ৭টি টিকে আছে। তবে সমরখন্দের মসজিদের সংখ্যাতত্ত্বের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বসম্পন্ন হচ্ছে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিসৌধ শাহ-ই-যিন্দ্ ("জিন্দা শাহ")। কিংবদন্তী আছে যে, মহানবীর খুল্লতাত কুসম-বিন-আব্বাসের দেহাবশেষের উপরই এই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত। ইনিই সমরখন্দে ইসলামের বাণী বহন করে আনেন। শাহ-ই-যিন্দ্কে একটি গবেষণাকারী, দর্শক ও পর্যটকদের আকর্ষণমাত্রে পরিণত করার ঐকান্তিক সরকারি প্রচেষ্টাসত্ত্বেও এটি এখনও সোভিয়েট ইউনিয়নে ইসলামের একটি অম্লান স্তম্ভ হিসেবে টিকে রয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে সরকারিভাবে প্রচারিত এক তথ্যেই প্রকাশ করা হয় যে, ১৯৫৪ সালে রমযানের অবসান উদ্‌যাপনের জন্য এই মাজারের অঙ্গনে ২০ সহস্রাধিক লোক জমায়েত হয়।[১৮৩]

উজবেকিস্তানের অপর পবিত্র ইসলামী শহর বোখারায় মুসলিম ধর্মজীবনের

---

181. *মধ্য-এশিয়া ও কাজাকিস্তান মুসলিম বোর্ডের বিবৃতি : তাস ৩–৬–৫৪।*
182. *As in the Original*
183. *তাস, ৩-৬-১৯৫৪।*

আবশ্যিক উপাদানসমূহের খুব কমই ধ্বংসাবশিষ্ট রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এই নগরীর প্রাকারের অভ্যন্তরেই ছিলো ৩৫৪টি মসজিদে ও ১৫৮টি মক্তব মাদ্রাসা। এগুলোর মধ্যে এখন কার্যকরীভাবে টিকে আছে শুধু মাদ্রাসা মীর-ই-আরব, এবং বহু বছর ধরে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে এটিই ছিলো মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র। বোখারার প্রাচীন মুসলিম গৌরবমণ্ডিত ভবনগুলোর অনেকগুলো এখনো বিদ্যমান রয়েছে, তবে ধর্মকর্মের জন্য নয়, এবং এগুলো যে-সব রাস্তায় বিরাজমান, তাদের নতুন নামকরণ করা হয়েছে প্যারী কম্যুন, লেনিন, স্তালিন, কার্ল মার্ক্স, মারাট, ক্লারা জেৎকিন, থাইলমান প্রমুখ পাশ্চাত্য নিরীশ্বরবাদের পূজনীয় পুরোধাদের স্মৃতি অমর করার উদ্দেশ্যে। সরাসরি "নিরীশ্বরবাদী" (বেজভজনায় স্ট্রীট) নামেও একটা সড়ক আছে বোখারায়।[১৮৪]

মধ্য-এশিয়ার মুসলমানদের অন্য যে-সব পবিত্র স্থান রয়েছে, তাদের অধিকাংশই উজবেকিস্তানে অবস্থিত। যথা: — আন্দিজান, ফারগানা, কোকন্দ, খিবা ও কারো-কল্পক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের চিম্বাই। এইসব শহরেই মসজিদ রয়েছে। তাজিকিস্তানেও মুসলমানদের ধর্মজীবন যথেষ্ট প্রাণচঞ্চল মনে হয়। স্তালিনাবাদের শাহ্ মনসুর সমজিদে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ লোকের সমাগম হয়ে থাকে বলে জানা যায়।[১৮৫] বিদেশী শ্রোতাদের জন্য সগর্বে এই হিসেব প্রচার করা হলেও দেশী পাঠকদের জন্য সোভিয়েট পত্রিকাদি সংক্ষেপে উল্লেখ করে যে, স্তালিনাবাদের মসজিদে প্রার্থনায় যোগদানকারী "তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা কিছু নগণ্য নয়", এবং এমনকি, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদেরও এই মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়।[১৮৬]

ইসলামের সত্যিকার দুর্ভেদ্য দুর্গ রয়েছে শহরগুলোতে নয়, বরং তাসখন্দে অধিষ্ঠিত কমিউনিস্ট প্রশাসন সদর দফতরের প্রত্যক্ষ ক্ষমতার নাগালের বাইরে সুদূর পল্লী প্রত্যন্তে ও সমবায় খামারগুলোতে। এ-সব অঞ্চলেই রয়েছে বিপুলসংখ্যক "অস্বীকৃত" অ-রেজিস্ট্রিকৃত মসজিদ। এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল, কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠার ভয়ে তাঁরা কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছেন না। কিরগিজিয়ার একটিমাত্র প্রদেশেই এই রকম

---

184. *Bukhara—Short Reference and guide Book, 1956, PP. 77—81.*
185. *মস্কো বেতারের ফারবী অনুষ্ঠান, ১৩-৫-৫৬।*
186. *Kammunist Tadzhikistan, 27—7—58.*

বহুডজন " বেআইনী" মসজিদ আবিষ্কৃত হয়।[১৮৭] তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিয়ায়ও প্রায় একই পরিস্থিতি বিদ্যমান। তাজিকিস্তানের প্রায় প্রত্যেক কিশলাকেই (পল্লীতে) একটি মসজিদ আছে বলে পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। তুর্কমেনিয়ায় সোভিয়েট পত্র-পত্রিকা ও বেতার মোল্লাদের আহ্বানে সাড়া না দেবার জন্য " কোলখোজনিকদের" অহরহ সাবধান করে থাকে।[১৮৮]

বেআইনী মসজিদগুলোকে জীইয়ে রেখেছেন বেআইনী ইমামেরা। এঁরা ছাড়াও রয়েছেন পল্লী অঞ্চলে ভ্রাম্যমান প্রচারক ও মোল্লারা; তাঁদের কাজ কৃষকদের ঘরে ঘরে গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা ও আনুষ্ঠানিক কৃত্যাদিতে সাহায্য করা।[১৮৯] এঁদের কেউ কেউ বিনা বিজ্ঞাপনে খোলা ময়দানে মহ্ফিলের অনুষ্ঠান করেন। কর্তৃপক্ষ অবিশ্যি তাঁদের কার্যকলাপ সুনজরে দেখেন না। এমনকি, ক্রুশ্চেভের উদার নৈতিক যুগেও এঁদের ধরে ধরে জেলে পোরা হতো। তুর্কমেনিস্তানে এই শ্রেণীর দুই ব্যক্তিকে ২০ বছর ও ১৭ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[১৯০] সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মুফতী ও ইমামদের নমনীয় ও সুবিধাবাদী ভূমিকার সাথে এঁদের মনোভাবের তুলনা করা যেতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্য-এশিয়ার গ্রামাঞ্চলে মোল্লাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দৃষ্টে সমবায় কৃষিখামারের চেয়ারম্যানেরা তাঁদের সাহায্য নিতেন কোলখোজে (খামারে) শ্রমিকদের শৃংখলা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। ধরা পড়লে অবিশ্যি উর্ধ্বতন কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের গঞ্জনা সইতে হতো তাদের।[১৯১] কোলখোজ কর্তারা পর্যন্ত মোল্লাদের প্রাধান্য স্বীকার করে নিলে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার আর কি আশা থাকতে পারে? কয়েকজন গেঁয়ো মুফতীর দুঃসাহসিক উদ্যমে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ হতভম্ব হয়ে যান। সোভিয়েট শাসনের চার যুগ অতীত হবার পরেও কিরগিজিয়ার জনৈক মোল্লার পক্ষে একটি স্কুলভবনকে রাতারাতি মসজিদে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিলো। স্থানীয় লোকের সায় না থাকলে তাঁর পক্ষে অবিশ্যি একা একাজ করা সম্ভব হতো না। বস্তুতঃ তিনি শেষ পর্যন্ত স্কুলঘরটি ছাড়তে বাধ্য হলেও গ্রামের

---

187. *Sovetskaya Kirghiziya. 19—4—59.*
188. *আশখাবাদ বেতারে প্রচারিত কথিকা : "ইসলাম ও তার প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা", ১২-৮-৫৪।*
189. *Sovetskaya Kirghiziya, 19—4—57.*
190. *Turkmenskayy Iskra, 25—7—58.*
191. *D. Kishbekov: On Feudal Survival And How to Overcome, Them, Alma-Ata PP. 55—6.*

লোকেদের আনুকূল্যে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরো আশ্চর্যের কথা, তাঁর অন্তরঙ্গতম সুহৃৎদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্থানীয় একটি পার্টি সংস্থার সেক্রেটারী। কোরানখানির মজলিসে তিনি ধরা পড়েন।

পবিত্র স্থানসমূহ

কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম একটি বহুমুখী অভিশাপ। সরকার স্বীকৃত মোল্লারা ও তাঁদের মসজিদগুলো তাঁদের আসল শত্রু নয়, আসল শত্রু হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের "দুরারোগ্য" ধর্মপরায়ণতা, যার প্রকাশ ঘটে অজস্র ধর্মীয় উৎসব উত্থাপন ও বিধিনিষেধ পালনে। "পবিত্র স্থান" ও মাজারসমূহের প্রতি মুসলমানদের অনিরুদ্ধ আকর্ষণই হচ্ছে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সবচাইতে বড় মাথাব্যথার কারণ। সোভিয়েট নৃতাত্ত্বিকেরা এই আকর্ষণের উৎস ইসলাম অপেক্ষা প্রাগৈসলামিক কুসংস্কারই বেশি বলে মতপ্রকাশ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, শুধু সন্ত ও তাঁর সংশ্লিষ্ট কিংবদন্তীর নামাবলীই ইসলামের; কিন্তু মাজার জেয়ারতে যে-সব কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করা হয়, তার বেশির ভাগই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশ্বাস সম্ভূত। আর এই বিশ্বাসের প্রেরণা হচ্ছে প্রকৃতি পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জৈবচেতনা যাদু।[১৯২] কিন্তু এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, এতে কর্তৃপক্ষের বাস্তব সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আবহমান কালের মতো এখনো তেমনি লোকের ভিড় হয় মাজারগুলোতে। সমগ্র মধ্য-এশিয়া ও আযরবাইজানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মাজার ও পবিত্র স্থান। এইসব মাজার দর্শনের অসংখ্য অলৌকিক ফজিলতের ওপর লোকের অটল বিশ্বাস। কোন মাজারে জেয়ারতের ফলে রোগ সেরে যায়, আবার কোনটির উপর নির্ভর করে বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি এবং অন্য কোনটি হয়তো-বা চক্ষুরোগের নিরাময়কারী। কোন কোন পীরের মাজারে জেয়ারতে যায় সন্তানকামী বন্ধ্যা নারীদল। মাজারের মাটিরও অনেক গুণ আছে বলে মনে করা হয়; তার মধ্যে একটি হচ্ছে আশুরোগমুক্তির ধন্বন্তরী মহাশক্তি। সোভিয়েট পত্রিকাগুলোর নিন্দার তীব্রতা থেকেই প্রধান মাজার ও পবিত্র স্থানগুলোর জনপ্রিয়তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই নিন্দার বিশেষ শিকার হচ্ছে তাজিকিস্তানের হোজাওবি-কাম মাজার ও হিসার দুর্গ, উত্তর-তুর্কমেনিস্তানের কুন্‌য়া-উরগেঞ্চ এবং অবিশ্যি সমরখন্দের শাহ্-ই-যিন্দ্, যার কথা সোভিয়েট নিন্দাবাদে সর্বদাই সযত্নে উল্লেখ করা হয়। সমরখন্দের বিবি-খানুম মসজিদের

---

192. *Sovetskaya Etnografiya. No. 2, 1957, PP. 61—67.*

চত্বরে অবস্থিত বিরাট মার্বেল শ্বেত-পাথরের স্তূপটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানেই অসংখ্য সন্তানকামী মুসলিম রমণীকে নতজানু হতে দেখা যায়। কাজাক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের তুর্কিস্তান শহরে অবস্থিত আহমদ য়াসুঈ স্মৃতিসৌধটিও শাহ্-ই-যিন্দের সমগোত্রীয় একটি জেয়ারতের স্থান। মুসলিম ওলী ও বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মগ্রন্থের প্রণেতা আহমদ য়াসুঈ দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরলোকগমন করেন। তৈমুরলঙ্গ তাঁর কবরস্থানে একটি মনোরম মসজিদ নির্মাণ করেন। কমিউনিস্টরা এই মসজিদটি বন্ধ করে দেয়, কিন্তু য়াসুঈর পুণ্যস্মৃতির চুম্বক আকর্ষণ রোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রতি বছর হাজার হাজার মুসলমান জেয়ারতে এসে নিকটবর্তী অন্য একটি ছোট মসজিদে জমায়েত হয়। এই মসজিদটি কমিউনিস্টদের কোপানল থেকে রেহাই পেয়েছিলো।[১৯৩]

কিরগিজিয়ার ওশ্ শহরের নিকটবর্তী তখ্‌ত্-ই-সুলাইমান পাহাড়টিও ভক্ত মুসলমানদের গভীর শ্রদ্ধার বস্তু। বাদশাহ্ সুলাইমান এই পাহাড়ের চূড়ায় বসেই এবাদাত করতেন এবং এইখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয় বলে তাদের বিশ্বাস। সর্বরোগ সংহারক বলে এই পাহাড়টির খ্যাতি আছে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বহু সাধ্যসাধনা করেও তখ্‌ত্-ই-সুলাইমানের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ নিরসন করতে পারেননি। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে পর্যন্ত এই পাহাড়ে জেয়ারতকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্য ২০ জন শেখ বাস করতেন।[১৯৪]

মধ্য-এশিয়ার পবিত্র স্থান জেয়ারতের রেওয়াজ আযরবাইজানের স্থানীয় ধর্মজীবনেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। এমনকি, আযরবাইজানের কমিউনিস্ট যুবলীগের সদস্যদের মধ্যেও জিয়ারতে যাওয়ার রেওয়াজ অব্যাহত থাকে।[১৯৫] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহু পরে পর্যন্তও নুখা শহরের উপকণ্ঠে " মোহাম্মদ এফেন্দীর" কবরস্থানে অগণিত মুসলমানের মিছিল এসে ভিড় জমাতে থাকে এবং "সোভিয়েট কনেরা" বরের ঘরে যাবার আগে এই কবরস্থানে এসে মোনাজাত করে যেতে থাকে।[১৯৬] এ-সব কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র ছিলো না, কারণ ১৯৫৭ সালে আযরবাইজান পার্টির সেক্রেটারী মুস্তাফায়েভ "জনসংগঠন ও পার্টি কর্মীদের কাছে"

---

193. *As in the Original*
194. *As in the Original*
195. *As in the Original*
196. *As in the Original*

এইসব পবিত্র স্থান জেয়ারতের প্রথা রোধ করার জন্য আবেদন জানান।[১৯৭] মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের আবেদন প্রচার করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে "গণদাবীর অনুরোধে" পবিত্র স্থানে জেয়ারত নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। পীর আওলিয়াদের শক্তির অলীকতা সপ্রমাণ করার জন্য তাঁদের মাজারের কাছে বেশি ঘটা করে ধর্মবিরোধী প্রচারণা চালানো হয়। বহুক্ষেত্রে নানা অজুহাতে মাজারের তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাঁকে জিলা থেকে নির্বাসিত করে দেয়া হয়।

সোভিয়েট দৃষ্টিকোণ থেকে "পবিত্র স্থানগুলোর" ক্ষেত্রে সবচাইতে বিভ্রান্তিকর সমস্যা হচ্ছে এই যে, এগুলো বিকৃত অতীতের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে স্বতঃই স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে বলে অপেক্ষমান থাকা যায় না। কারণ, এমনকি সোভিয়েট যুগেও বহু নতুন মাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যথা— বাকুর সন্নিকটে এক গণ্ডগ্রামে সৈয়দ আলী এল-আগার গোরস্থান। ১৯৫০ সালে এল-আগার মৃত্যু হয় এবং তখন থেকেই স্থানীয় মুসলমানেরা তাঁর গোরস্থানকে একটি পবিত্র মাজার বলে গণ্য করতে থাকে, যদিও কমিউনিস্ট প্রচারকেরা তাঁকে সরলবিশ্বাসী জনগণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সুযোগ গ্রহণকারী ভণ্ড পেশাদার পীর বলে নিন্দা করে।[১৯৮] ১৯৫৭ সালে তাসখন্দে এ ধরনেরই একটি মাজার প্রতিষ্ঠিত হয় বজ্রাঘাতে নিহত একটি তরুণের কবরকে কেন্দ্র করে।[১৯৯]

পবিত্র দিবস ও অন্যান্য উৎসব উদযাপন

সাধারণতঃ পবিত্র রমযান মাসে, অন্যান্য পবিত্র দিবসে এবং বিশেষ করে ওলীদের জন্মবার্ষিকীতেই তাঁদের মাজারে দর্শনার্থীদের সমাগম হয় সবচাইতে বেশি। মুসলমানদের মাজার জেয়ারতের মতো এইসব পবিত্র দিবস উদ্‌যাপনেও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ নিদারুণ শঙ্কাবোধ করতেন। মুসলমানদের প্রধান উৎসব ছিলো কোরবান বায়রামী (কোরবান আইৎ বা ঈদুল আজহা)। খ্রিস্টান এলাকায় বড়দিন ও ঈস্টারের বিরুদ্ধে পরিচালিত নাস্তিক্যবাদী প্রচারণার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিলো মুসলিম এলাকায় এই উৎসবের বিরোধী প্রচারণা। কোরবান বাইরামী ছাড়া, পবিত্র রমজান মাস পালনের বিরুদ্ধেও কমিউনিস্টরা জোর প্রচারণা চালায়। কোরবান

---

197. *As in the Original.*
198. *As in the Original.*
199. *As in the Original.*

বায়রামী ও রমযান উদ্‌যাপনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট প্রচারকেরা তাদের তূনের সকল বাণই নিক্ষেপ করে। ব্যঙ্গ কবিতা, কার্টুন, জনসভা ও মঞ্চে প্রহসনের অভিনয় করে, তারা প্রচারণা চালায়। শিয়াদের পবিত্র শোক-দিবস ১০ মহররমের বিরুদ্ধেও তারা এমনি প্রচারণা চালায়।[২০০] এই দিবসে শিয়ারা খলীফা হযরত আলীর পুত্র হাসান ও হোসেনের শাহাদতের স্মৃতিতে শোক-শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করে এবং শোভাযাত্রায় শোক প্রকাশ করতে গিয়ে আত্মনিগ্রহের এক অতি বিভৎস দৃশ্যের অবতারণা করে। এই কারণেই শিয়াদের পীঠস্থান পারস্যের সরকার তাদের এই আত্মনিগ্রহ প্রদর্শনীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করতে বাধ্য হন। কাজেই সোভিয়েট সরকারও অনুরূপ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিভৎসতার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন, তা নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং প্রশংসনীয়ই বলতে হবে। কিন্তু তাঁরা এই সৎকর্মটি করতে গিয়ে ইসলাম ধর্মের মূল উক্তির যথার্থের উপর কটাক্ষপাত করতে প্রয়াস পান। অন্য কোন মুসলিম পবিত্র দিবস কমিউনিস্টদের ধর্মবিরোধী প্রচারণায় এমন মোক্ষম যুক্তির উপহার দিতে পারেনি; কাজেই তারা সেগুলোকে অনুরূপ নিষেধাজ্ঞার প্রতিদান দিতেও সক্ষম হয়নি। কিন্তু এই অক্ষমতা থেকেও সুনামের এনাম নিতে তারা ছাড়েনি: কোরবান বায়রামী উৎসবের অব্যাহত উদ্‌যাপনকে তারা কমিউনিস্ট শাসনে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রচার করে।

কোরবান বায়রামীর বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা শুধু ধর্মসংস্কারগত নয়, অর্থনৈতিক যুক্তিও প্রদর্শন করে। কোরবানীর জন্য শ্রমিকদের কাজে অনুপস্থিতি এবং আল্লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পশু জবাইয়ের ফলে সোভিয়েট অর্থনীতির মারত্মক ক্ষতি সাধিত হয় বলে তারা দাবী করে। সোভিয়েট পত্রপত্রিকায় প্রায়ই কোন খামার থেকে কতগুলো পশু বলি দিয়ে অযথা অপচয় করা হয়েছে, তার পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়। রমযানের রোযার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ যে, ওর ফলে জন-স্বাস্থ্যের অবনতি অবধারিত।

মধ্য-এশিয়া ও কাজাকিস্তানের মুসলিম ধর্মীয় অনুশাসন সংস্থা কমিউনিস্ট নাস্তিকেরা কোরবান বায়রামী ও রমযানের বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি উত্থাপন করে, তার মোকাবিলা করেন সুনিপুণ চাতুর্যের সঙ্গে। ১৯৫৪ সালে তাসখন্দের চীফ মুফতীর দফতর থেকে প্রচারিত এক ফতওয়ায় বলা হয় যে, কোরবানীর জন্য পশু জবেহ

---

200. *ডি, হাজীবালী: Anti-Islamic Propaganda and its Methods in Azerbaizan, PP. 24—36.*

করা আবশ্যিক নয়, এবং কৃষিকাজ শুরুর আগে অতি প্রত্যূষে মসজিদে জামাতের অনুষ্ঠান করা উচিত। রমযানের রোযা পালন প্রসঙ্গে সোভিয়েট মধ্য-এশীয় মুসলিম নেতাদের প্রচারিত আরেকটি ফৎওয়ায় বলা হয় যে, অসুস্থ ব্যক্তি, পর্যটক, সদ্যপ্রসূতি ও কঠোর কায়িক শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য রোযাপালন ফরজ নয়।[২০১]

মুসলিম আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির বিরুদ্ধে উত্থাপিত পুরাতন যুক্তিগুলো বাসী হয়ে যাবার পর কমিউনিস্টরা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারে ব্রতী হয়। মুসলিম ছুটির দিনগুলোকে উচ্ছেদ করার জন্য কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় "ধর্মনিরপেক্ষ" ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়; যথা— বাসকিরিয়ায় ও তাতারিয়ায় "লাঙ্গলের উৎসব" (Sabantive), দাগেস্তানে বসন্ত, পুষ্পাসব ও চেরি-বৃক্ষের উৎসব এবং উজবেকিস্তানে তুলা উৎপাদকদের উৎসব (পাখতা-বায়রামী)। ১৯৫৬ সালে এই শেষোক্ত উৎসব ও দিবসটি ঘোষণার পর থেকেই এটি বিপুল পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে কমিউনিস্টরা দাবী করে।[২০২]

মুসলমানদের যুগবন্দিত আরেকটি প্রথার বিরুদ্ধেও কমিউনিস্টরা জোর প্রচারণা চালায়, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তাদের প্রয়াস বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এই প্রথাটি হচ্ছে মুসলমানদের পুরুষ সন্তানদের জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগের ত্বকচ্ছেদন। এমনকি মধ্য-এশিয়ার কমিউনিস্টরাও এই প্রথাটি পালন করে থাকে, তবে কর্তৃপক্ষের নিন্দার জবাবে তারা সাফাই দিয়ে থাকে যে, তারা এটা করছে কোন ধর্মীয় কারণে নয়, স্বাস্থ্যগত কারণে; এবং ত্বকচ্ছেদন উৎসবেও তারা কোন মোল্লাকে আমন্ত্রণ করে না, শুধু সমমনা পার্টি সদস্যদেরই আপ্যায়ন করে থাকে।[২০৩] কমিউনিস্টদের প্রধান আপত্তির কারণ এই যে, এর ফলে মুসলমান নাগরিকদের সাথে অন্য নাগরিকদের একটা সুস্পষ্ট দেহগত পার্থক্য সূচিত হয়। কিন্তু একটা সভ্যসমাজে ন্যূনতম সাধারণ পরিধেয় আবৃত নাগরিকদের মধ্যে এই ধরনের একটা দেহগত পার্থক্য কিভাবে 'সুস্পষ্ট' হতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁরা কিছুমাত্র আলোকপাত করেননি। কমিউনিস্ট লেখকেরা স্বয়ং এ কথা স্বীকার করেছেন যে, এই প্রথাটি শুধু মুসলমানদের (এবং ইহুদীদের) মধ্যেই প্রচলিত নয়; অন্য বহু জাতি-উপজাতির মধ্যেও এটি প্রচলিত, যথা— পলিনেশীয় ও মার্কিন

---

201. *As in Original Post.*
202. *As in Original Post.*
203. *As in the Original Text.*

আদিবাসীরা।[২০৪] কোরানের শিক্ষা অনুসারে মধ্য-এশিয়ার মুসলমানেরা এখনো শূয়োরকে নাপাক জানোয়ার বলে মনে করে। পশুপালনক্ষেত্রে শূয়োর পালনই হচ্ছে সবচাইতে লাভজনক শাখা—এই মর্মে জোর প্রচারণা সত্ত্বেও সরকার মুসলমান খামার-মালিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শূয়োর-পালনের প্রচলন করতে পারেনি। এমনকি, যে-সব মুসলমান শূয়োর পালনে সম্মত হয়েছে, তাদেরকেও শূয়োরের মাংস খেতে রাজী করানো সম্ভব হয়নি। কাজাকিস্তানের একটি জিলায় (সিজাক) ১৯৫৬ সালে পর্যন্ত শূয়োর পালনের প্রচলন করা সম্ভব হয়নি।[২০৫]

মুসলিম এলাকায় ধর্মীয় ও ধর্ম-বিরোধী শিক্ষা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন বলপ্রয়োগের পরিবর্তে শিক্ষা ও প্রচারণার মাধ্যমে ইসলামের মূলোৎপাটনের নয়া নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি অনুসারে কমিউনিস্টরা ইসলাম-বিরোধী প্রচারকদের এক বিরাট বাহিনী নিযুক্ত করে এবং ধর্ম-বিরোধী প্রচার পুস্তক, পুস্তিকা, সাময়িকী প্রবন্ধ ইত্যাদির প্লাবন বইয়ে দেয়। এর মোকাবেলায় ভক্ত মুসলমানদের হাতে অস্ত্র ছিলো কমই; কারণ বলতে গেলে ধর্মীয় সাহিত্যের প্রায় কিছুই তাদের হাতে অবশিষ্ট ছিলো না—যা কিছু ছিলো, তা শুধু এজন্যে যে, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও সাহিত্য একেবারে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দিলে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে নিরপেক্ষ সমতাভিত্তিক নীতি অবলম্বনের দাবীটি ধোপে টেকানো কমিউনিস্টদের পক্ষে মুশকিল হতো। তবে এই ধ্বংসাবশেষকে বিদেশে প্রচারণার কাজে লাগাতে অবিশ্যি তারা কুসুর করেনি। সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে ধ্বংসাবশিষ্ট দুটি মাত্র ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র বোখারার মীন-ই-আদব মাদ্রাসা ও তাসখন্দের বরাক খান মাদ্রাসা বিদেশী সফরকারীদের জন্য আবশ্যিক দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু এই দর্শকদের বিবরণ প্রায়শঃই অসম্পূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে। বোখারার মাদ্রাসাটির পরিকল্পনা ১৯৪৮ সালে চূড়ান্ত করা হলেও ১৯৫৬ সালের আগে এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়নি। এখানে ছাত্ররা মাত্র ৫ বছর অধ্যয়ন করার পর বাকী অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তাসখন্দে। বোখারা মাদ্রাসার শিক্ষাসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে কোরানের ব্যাখ্যামূলক তফসীর, নবীকুলের চরিতামৃত “মাসকাত”, ইসলামী

---

204. *As in the Original Text*
205. *As in the Original Text*

আইনের বিকাশমূলক ইতিহাস, সোভিয়েট সংবিধান, রুশ ভাষা, এবং প্রায় অর্ধেক ছাত্রের মাতৃভাষা উজবেক।[২০৬]

বোখারা মাদ্রাসার শিক্ষণপদ্ধতির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে আরবি শিক্ষার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ। পাঠ্যসময়ের এক তৃতীয়াংশের মতো (১২,০৮১ ঘন্টার মধ্যে ৪,৩৯২ ঘন্টা) ব্যয়িত হয় আরবি পঠনপাঠনে। এতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই মাদ্রাসার স্নাতকোত্তীর্ণ কিছুসংখ্যক ছাত্রকে অন্ততঃ সরকার আরব বিশ্বে প্রচারণার কাজে লাগাবেন। আরো একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ফারসী। এই ভাষাশিক্ষার জন্য ৩৮৪ ঘন্টা নিয়োজিত হয়। প্রাক্-সোভিয়েট আমলে উচ্চতর মুসলিম শিখ্যায়তনগুলোতে আদৌ ফারসী শিক্ষার রেওয়াজ ছিলো না।[২০৭] কাজেই মনে হয়, শুধু মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার সৌকর্য বিধানই মীর-ই-আদব মাদ্রাসা পুনরুজ্জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো না।

এটা খুবই সম্ভব যে, এই দুটি মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র দল আছে : একদল সোজা কথায় সরকারের দালাল, আরেক দল হচ্ছে সত্যিকার ধর্মপ্রাণ তরুণ ছাত্র। এই শেষোক্তদের অস্তিত্বটা সহ্য করাই কর্তৃপক্ষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তুর্কমেনিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান একবার খেদ করে বলেছিলেন, "আমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক তরুণ সোভিয়েট স্কুলে তাদের হাতেখড়ি হবার পরই মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর দিকে ধাওয়া করে।"[২০৮] তবে বাস্তবিকপক্ষে সোভিয়েট কর্তাদের উদ্বেগের কোন কারণ নাই; কেননা এই মাদ্রাসাগুলোতে পড়ুয়াদের সংখ্যা খুবই কম। বোখারার মাদ্রাসায় এ পর্যন্ত কোন বছরই ছাত্রের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। তাসখন্দে ছাত্রের সংখ্যা আরো অনেক কম।

মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার চাইতে ধর্মীয় সাহিত্যের অবস্থা আরো শোচনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মধ্য-এশীয় মুসলিম কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিজস্ব একটি সাময়িকী প্রকাশ করবেন বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু এটির মাত্র দুটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয় বলে মনে হয়। এছাড়া, তাসখন্দ থেকে ২,৫০০ থেকে ১০,০০০ কপির সংস্করণে মুসলিম ক্যালেন্ডার ও উফার মুফতী কর্তৃক তাতার ভাষায় ৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত "ইসলাম ও এবাদত" নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়

---

206. *অন্য যে-সব অনুজাতিভুক্ত ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করে, সংখ্যাগত গুরুত্বের ক্রমানুসারে তারা হচ্ছে : তাজিক, তাতার, কাজখ, কিরগিজ ও আর্মেনীয়।*

207. *As in the Original Text.*

208. *As in the Original Text.*

বলে সময়ে সময়ে প্রচারিত সোভিয়েট সূত্রের খবরে জানা যায়।[২০৯] উফা ও তাসখন্দে কোরানের দুটি সংস্করণ মুদ্রণ করা হয় বলেও জানা যায়। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের পক্ষে এই 'সোভিয়েট কোরান' এক রকম দুর্লভ হয়ে পড়ে। তবে সফরকারী মুসলিম নেতাদের এবং বিদেশে মুসলিম ধর্মীয় আচার্যদের এর বহু কপি উপহার দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।[২১০]

সোভিয়েট ইউনিয়নের মুসলিম এলাকাগুলোতে ধর্মবিরোধী প্রচারণা ১৯৪৭ থেকে 'অখিল-ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসার সমিতির' হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এই সমিতির ইতিহাসে বহু উত্থান-পতন ঘটে। সমিতি ধর্ম উচ্ছেদের ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি বলে সময়ে সময়ে এর কঠোর সমালোচনা করা হয়। মুসলমানদের জবানে ধর্মের বিরুদ্ধ যুক্তিসম্বলিত পুস্তিকাদি প্রকাশ করা ছাড়াও এই সমিতি ধর্মবিরোধী প্রচারক ও বক্তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে। ১৯৫৬ সালে এই ট্রেনিংয়ের কর্মসূচি আরো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হয়। সে বছরই দুটি আন্তঃপ্রজাতন্ত্র ধর্মবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাকু ও তাসখন্দে। প্রচারকার্য জোরদার করার জন্য স্থায়ী সংস্থা হিসেবে আলমা-আতায় "নিরীশ্বর ভবন" ও বাকুর "রাজনৈতিক শিক্ষা ভবনে" "নাস্তিক পাঠচক্র" (ক্যাবিনেৎ আতে ইস্তা) প্রতিষ্ঠা করা হয়। আশকাবাদে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম " বৈজ্ঞানিক নাস্তিক্যবাদের বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়।[২১১] সোভিয়েট মুসলিম বিরোধী প্রচারণাকে আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ, তথ্যসমৃদ্ধ ও সে অনুপাতে মারাত্মক করে তোলাই ছিলো এই সব সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

কিন্তু মুসলিম অঞ্চলগুলোতে ধর্মবিরোধী প্রচারণা কিছু সহজ কাজ নয়। অমুসলিম প্রচারকদের দিয়ে কাজ চলবে না, কারণ তাদের কথায় মুসলমান শ্রোতারা কান দেবে না। পক্ষান্তরে, নিরক্ষর মুসলমান শ্রোতাদের নিকট বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করতে গিয়ে মুসলমান নাস্তিক বক্তারাও বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। সোভিয়েট প্রাচ্যের নিরক্ষর শ্রোতারা সভায় যায় গল্প ও কথকতার আস্বাদ লাভের আশায়, আর তাদের প্রাচ্য কমিউনিস্ট বক্তাও অভিভূত হয়ে বিস্তারিতভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও 'কোরানের কিংবদন্তী' বয়ান করতে শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য অবিশ্যি "মহৎ"; তিনি চান ধর্মীয়তত্ত্বের অসারতা প্রদর্শন করতে। কিন্তু তিনি যতই ইসলাম সম্বন্ধে নিজের জ্ঞানগম্যি প্রকাশ করেন, ততই উৎসাহিত হয়ে শ্রোতারা

---

209. *As in the Original Text.*
210. *As in the Original Text.*
211. *As in Original.*

তাঁর কাছ থেকে কোন উৎসব কিভাবে পালন করতে হবে এবং কি কারণে এই পয়গাম্বর বিখ্যাত এবং ঐগুলোর প্রসিদ্ধি, সে সম্পর্কে জানতে চায়। ফলে ধর্মকে উৎখাত করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি ধর্মের খুঁটিকে আরো পোক্ত করতেই সাহায্য করে বসেন।[২১২]

মোদ্দা কথা

সোভিয়েট শাসনের গত কয়েক যুগের ধর্মবিরোধী প্রচারণার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কমিউনিস্টরা তাদের আক্রমণ বেশির ভাগই চালিয়েছে ইসলামের মূল ধর্মদর্শন বাদ দিয়ে তার দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষঙ্গগুলোর বিরুদ্ধে, যথা— পর্দা প্রথা, মাজার জেয়ারত, মুসলিম উৎসব উদ্‌যাপনে অমিতব্যয়ীদের অপচয় ইত্যাদি। বাহ্যদৃষ্টিতে এইসব প্রথার বিরুদ্ধে সোভিয়েট লোকদের হাতে ধরে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন, তাদের আহ্বান জানাচ্ছেন প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্জ্ঞেয়তাবাদী কুসংস্কারে পঙ্কিলতা ত্যাগ করে এক নতুন, প্রগতিশীল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবনের পথে। কিন্তু এই বাহ্য লোকের চোখে ধূলো দেয়াই তাদের প্রচারণার এই কৌশল প্রয়োগের উদ্দেশ্য। কারণ, কমিউনিজমের আসল উদ্দেশ্য ধর্ম-জীবন থেকে কতিপয় অবাঞ্ছনীয় প্রথার উচ্ছেদ সাধন নয়, বরং ধর্মেরই জড়েমূলে উচ্ছেদসাধন। শিয়াদের মহর্‌রম উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শাখসেই-বাখসেই শোকমিছিলের আত্মনিগ্রহাত্মক বীভৎসতা, রমযানের উপবাসে স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য নয়, মূল লক্ষ্য হচ্ছে তৌহিদের মর্মবাণী : আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, পরম করুণাময় ও ভক্তবৎসল, "স্বর্গমর্ত্যের স্রষ্টা অধিপতি, সর্বজীবের আধার, জ্ঞানময় ও সর্বশক্তিমান।" পবিত্র কোরান বলেন : " শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণ ও ঈমানদারদের পুরস্কৃত করবেন, এবং অবিশ্বাসীদের দণ্ডদান করবেন।" রুশ মুসলিম পাঠকদের কাছে কোরান একটি অচল পুঁথি নয়, বর্তমানের অনেক সমস্যা সমাধানের সূত্রখুঁজে পাওয়া যায় কোরানের বাণীতে : "অবিশ্বাসীরা অপরকে আল্লার পথ থেকে সরিয়ে নেবার প্রচেষ্টায়ই তাদের সম্পদ নিঃশেষ করে ফেলবে। এজন্যে তারা একদিন দুঃখিত হবেই। কিন্তু তারা ক্ষমতাচ্যুত হবে। অবিশ্বাসীরা জান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" কোরানে অনুরূপ আরো বহু বাণী আছে, যাতে বিশ্বাসীদের ধৈর্য ও তিতিক্ষার উপদেশ এবং পরিণামে অবিশ্বাসের উপর বিশ্বাসের জয় সুনিশ্চিত বলে আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

---

212. *As in Original.*

রাশ্যার মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস কেবল বিশুদ্ধ অধ্যাত্মচেতনা থেকে নয়, অন্যান্য সূত্র থেকেও প্রাণরস সংগ্রহ্ করে। ইসলাম একটি বিশ্বধর্ম; এই মুসলিম বিশ্বের এক অংশে যা-কিছু ঘটে, অপরাপর অংশের উপর তার প্রভাব পড়ে অবিসংবাদিতরূপে। বহুসংখ্যক মুসলিম রাষ্ট্রের আবির্ভাব, এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মধ্যে একটি যোগসূত্র হিসেবে ইসলামের ভূমিকা, কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের সুবিদিত ইসলাম প্রীতিসত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নে তাঁদের সম্মান, এ-সবই রাশ্যার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত প্রীতিকর ও উৎসাহব্যঞ্জক। আর যারা ধর্মপ্রাণ নয়, এমনকি যারা মনে-প্রাণে কমিউনিজমে দীক্ষা নিয়েছে, তাদের মনের ওপরও এর একটা প্রভাব পড়তে বাধ্য, এবং তাদের নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হচ্ছে, আফ্রো-এশীয় জাতিগুলোর মুক্তি-আন্দোলনের মেরুদণ্ডস্বরূপ ইসলামকে অত সহজে একটা "প্রতিক্রিয়াশীল" শক্তিরূপে বাতিল করে দেয়া যুক্তিযুক্ত হচ্ছে কিনা। এই বুদ্ধিজীবীরাই এমন কি তাদের ইসলামী ঐতিহ্যের জন্য গর্ববোধ করতে পারে এবং ইসলামকে নতুন ও সংশোধিতরূপে শরীয়তবিহীন ইসলামরূপে বরণ করে নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে আধুনিক তুরস্কের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কামালপন্থী তুর্কী তরুণ সম্প্রদায় বিশ ও তিরিশের দশকে চরম নির্মমতার সঙ্গে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় সংগঠন সংবিধান থেকে নির্বাসিত করেন। কিন্তু রাষ্ট্রের বিকাশের পরিণত পর্যায়ে ধর্মকে আবার স্বকীয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়, অথচ এজন্যে তুরস্কের আধুনিক রাষ্ট্রের চরিত্র বিসর্জন করতে হয়নি। সোভিয়েট মুসলিম অঞ্চলগুলোতেও এই রকমের একটি পরিণতিই বাঞ্ছনীয়, তবে তা সম্ভব হতে পারে শুধু সোভিয়েট প্রশাসন ব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী উদারনীতি প্রবর্তনের ভিত্তিতেই।

পুস্তক পরিচিতি

যে-সব বই থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির নাম দেয়া হলো :

!! এক !!

কমিউনিস্ট প্রকাশিত

Joshua Kunitz : Dawn Over Samarkand, General Pub. Ltd. Calcutta, 1943.

B. P. L. Bedi : Muslims in the USSR. Lahore, 1947.

Samursky : Daghestan, Moscow, 1925.

Lenin : Selected Works, English edition, Vol. II.

Lenin : On Religion, Peoples' Publishing House, Bombay, 1944.

A Short History of the Communist Party of the USSR.

The Soviet Political Dictionary.

Trainin, Menshagin and Vyshinsky ; Commentaries on the Criminal Code.

Marxism and the Question of Nationalities : (Marx-Lenin-Stalin Series, No. 14. Peoples' Publishing House, Bombay).

Soviet Criminal Code.

Soviet State and Law.

Vyshinsky : Soviet Law.

Stalin : Problems of Leninism.

National Problem and Lenin, Vol. II.

History of the USSR Vol. II, Moscow, 1944.

Smirnor : Essays from the Study of Islam in the USSR.

China in Transition, Selected Articles 1952—1956. Peking, 1957.

The Soviet Encyclopedia.

G. Spasov : Freedom of Religion in the Soviet Union, 1954.

Khrushchev : Report of the Central Committee : 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union, February 14, 1956.

Nokolai Maikhailov : 16 Soviet Republics, May, 1955.

Y. Umarsky : Constitutional Rights of Soviet Citizens.

The Soviet Constitution, Moscow, 1947.

The Essentials of Lenin, Lawrence and Wishart, London, 1947.

Lenin : Left-wing Communism, an Infantile Disorder, Selected Works, London, 1938, Vol. 10
Lenin : Imperialism, the highest stage of capitalism, Selected Works : London, 1936, Vol. 5.
Stalin : Marxism and the National and Colonial Qusestion, Lawrence and Wishart, London, 1942.
The Constitution of the Peoples, Republic of China, Peking 1954.
Marx-Engels Correspondence : Lawrence and Wishart, (1846-1895) London, 1943, PP. 64, 68.
Religious Freedom in the Rumanian Peoples Republic, Bucharest, 1953.
(কমিউনিস্ট পত্রিকাদি : পত্রিকার তালিকা দেখুন)

!! দুই !!

সাধারণ

Muhmmad Fazlur Rhhman Ansari : The Communist Challenge to Islam, Durban, South Africa,
Muslims in USSR : A Bullentin of the Pakistan Committee for Cultural Freedom No. 3, January, 1959.
Ivar Spector : The Soviet Union and the Muslim World (1917—1956).
Walter Kolarz : Russia and Her Colonies, London, 1952.
Muhammad Emin Bugra : Muslims Under Russian and Chinese Domination, Karachi, 1958.
Isa Yusuf Alptakin : Iron Curtain in Eastern Turkistan, Lahore, 1952.
Olaf Caroe : The Soviet Empire, Macmillan, 1955.
W. Gurian : Soviet Imperialism : its origin and tactics, Notre Dam, 1953. PP. 75—89.
Gopal Mittal ; The March of a Conspiracy, The National Academy, Delhi.
William O. Douglas : Russian Journey.
Tao Li : Forgive Us Our Youth, Chico Yu Press, Hongkong, 1958.
The Storm, China Viewpoints, Hongkong, 1958.
Godfrey Lias : The Kazak Exodus Evans Bros. London, 1956.
Eugene Schuyler : Turkistan, Vol. I. London 1876, Chaps. II-IV and VI; Vol. II, IX—X and XIV—XV.
Akhtar Ali Khan : Assimilation and Genocide of Muslims in Sovet Russia and its Satellite States, Karachi.
Robert Briffault : The Making of Humanity.

Draper ; The Intellectual Development of Europe, Vol. I.
Leeky : History of Rationalism, Vol. II.
Edgar Snow : Red Star over China.
Stanley Powell : Soviet Attitude Towards China, Vora & Co. Bombay. 1945.
M. N. Roy : Revolution and Counter Revolution in China, Calcutta, 1946. P. 163.
Moore : Soviet Far-Eastern Policy, Owen Lattimore : The Pivot of Asia, 1950.
Hans Kohu : Nationalism in the Soviet Union.
Kulski : The Soviet Regime, Syracuse University Press, 1954, PP. 104—109.
Roger N. Baldwin : A Slavery : Forced Labour, The Communist Betrayal of Human Rights, Ocena, 1953.
Hugh Seton Watson : The Pattern of Communist Revolution, Methuen & Co, London 1953.
H. A. Frend ; Russian From A to Z. Augustan & Robertson, 1945.
Katthleen Stahl : Britain and Soviet Colonial Systems, Faber & Faber. London, 1951.
Ella R. Christie : Through Khiva to Golden Samarkand, London, 1925.
Bosworth Godman : The Red Road Through Asia.
Lt. Col. P. T. Ellerton : In the Heart of Asia, London, 1925.
T. B. Brown : Excavation in Azerbaijan, 1948.
Vambery : History of Bokhera, London, 1875. Travels in Central Asia, London, 1864.
হাসান জামান ঃ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম, ঢাকা ১০৫৩।
Bernard Pares ; Russia.
Lucian Taire : Shanghai Episode, Rainbow press, Hongkong.
The International Commission of Jurists, Socialist Legality in Czechoslovakia, March 1955.
Yang Irfan : Islam in China. Hongkong, 1957.
Ann Van Wynan Thomas : Communism vs. International Law, 1954.
K. L. Gauba : The Prophet of the Desert. Lahore, 1949.
Lenczowski : Russia and the West in Iran, Cornell, 1949.
Lawton : The Russian Revolution Macmillan, 1927.
R. N. Carew Hunt : Theory and practice of Communism, London, 1950.
P. Luknitzki : Tadzhikistan, 1954.
Stefan Wurm : Turkic Peoples of the USSR.

N. A. Baskakov : The Turkic Languages of Central Asia.
George Padmore : How Russia Transformed Her Empire, London, 1946.
Leonard Barnes : Soviet Light, on the Colonies, Penguin, London, 1944 (PP. 197—211).
W. Barthold : Turkistan down to the Mongal Invasion Tr. Prof.
H. A. R. Gibb, London, 1928.
Bates ; Soviet Asia, London, 1942.
A. Barnes : Travels in Bokhara, London, 1835.
Crankshaw : Russia by Daylight.
Encyclopedia of Islam : Articles on Islam, Turks Barthold, Amu Darya and others.
Gibb : History of Ottoman Poetry. Vol. V. London, 1900 .
Jarring : Uzbek Texts from Afghanistan, Lund-Leipizig, 1938.
Krist : Alone Through The Forbidden Land. Tr. Lorimer, 1939. (Samarkand and the Soviets).
Latlimore : Inner Asian Frontiers of China, New York, 1951.
Frank Lorimer : Population of the Soviet Union, League of Nations, Geneva, 1946. (1926 and 1939 Census).
F. Maclean : Eastern Approaches, London, 1948.
Beveridge (Mrs.) : Memoirs of Babar.
Leyden and Eskrine : Memoirs of Babar, London, 1921.
Mandel : The Soviet Far-East and Central Asia, American Institute of pacific Relation, 1944.
C. P. Skrine : Chinese Central Asia. London, 1922 (The Basmachi Movement).
Toynbee : Study of History. 6 Vols, London, 1946. Abridgment by Somervell.
J. Wolff : Mission to Bokhara, London, 1846.
Mustafa Chokai : Turkistan Under Soviet Domination, Paris, 1935.
Prof. Togan : Turkistan To-day, Istanbul, 1952.
George Fisher : Soviet Opposition to Stalin, Cambridge, Harvard University Press, 1952.
A. G. Park : Bolshevism in Turkistan Columbia University Press, (1917—27) 1957.
Dinko Tomasic : The Impact of Russian Culture on Soviet Communism, Free Press. 1953.
George N. Schuster : Religion Behind the Iron Curtain, New York, 1954.
R. Pipes : The Formation of the Soviet Union, Harvard University Press, 1954.

Allen and Miratoff : Caucasian Battlefields, Cambridge University Press, (1828—1921), 1953.
D. Duff : Russian Realities and Problems, London, 1917.
Hans Kohu : Nationalism in the Soviet Union. London, 1937.
Rysakoff : The National policy of the Soviet Union.
W. H. Chamberlain : Soviet Russia, 1931. D. M. Wallace Vol. I, London, 1877.
Stephen Graham : Russia and the World, London, 1877.
K. Mehnert ; Russia (Tr. M. Davids), London, 1933.
C. G. Benningsen; Religion in Russsia, London, 1940.
John buchan (Ed.) : The Baltic and Caucasian States London. 1923.
Dallin : The Changing World of Soviet Russia, Yale University Press, 1956, PP. 264, 274.
Walter Badel Smith : Mission to Moscow, 1950, Ch, XII: Religion in Russia, PP. 253, 265.
K. Mehnert : Stalin vs. Marx, London, 1952.
Barnabas : Christian Witness in Communist China, London, 1951.
A. M. Rehwinkel : Communism and the Church, Missouri, 1948.
Mitrany : Marx Against the Peasant, London 1952.
Uralov The Reign of Stalin (Tr. from Fr. by Z. J. Smith). London 1913, Caucasia 140—159, History 104, Law 127, Minorities 148.

!! তিন!!

পত্রিকা

Asian Review, July 1955, Uzbekistan : The Congress of Historians.
Problems of the Peoples of the USSR, I : League for the Liberation of the USSR, Munich, 1958.
Islamic Review, May, 1951, P. 30.
Islam in Western Europe on the eve of the Mongol Invasion (1011-1023) by Arslan Bohdanowicz.
Islamic Review : April, 1949—Islam in China by Prof. Ahmad Ali.
Islamic Review : October 1949. The Muslims of USSR and Pakistan by Fareed S. Jafri, P. 14.
Islamic Review ; August 1951, P. 45.
Islamic Review : 1953.
Bulletin of the Institute for the Study of the History and Culture of the USSR. Vol. II, July, 1955.
Vol. January, 1955.
Vol. June, 1955.
Vol. III, January, 1956.

The Anglo-Soviet Journal.
Pravda, 24th July, 1954, 16th August, 1951.
The Caucasian Review, (2),
Munich, 1956. Spring—Genocide in the Northern Caucasus by R. Karcha. PP. 74—84. (4) Munich, 1956.
The Central Asian Review, Central Asian Research Centre, London.
Soviet Survey, April-June, 1958.
The Royal Central Asian Journal. 1950—1957.
July-Oct, 1957 (Language) January, 1956.
July 1933. January 1943. October, 1951,
Vol. XLL. 1954, Cultural Devlopments in Soviet Central Asia by Lt. Col. G. E. Wheeler,
Vol. XLI, 1954, The Great Kazak Epic by M. Philips Price.
The Central Asiatic Journal (Monton & Co, Olto Harrassowitz Weisbaden).
The Pakistan Times, Lahore, Chinese Muslims and Liberation War, (Tr. into Bengali by Abdul Gafur. Sainik, Dacca, 25th February, 1949, P. 5)
The Evening Times, Karachi, December 7, 1951, P. 4.
The New York Times, June 7, 1951.
The Redical Humanist, 23rd. December, 1951.. The Reign of Terror in China by Robert Guillain.
The Civil and Millitary Gazette, 1949, 3rd May, 30th April,
The Hindusthan Times, August 25, 1958.
Bolshevik, July, 1950.
July, 1947.
June, 1946.
February 1955.
Current Affairs, Peking, No. 17. September 17, 1956.
Law Review (2) : 1938.
European Messenger, March, 1873.
Literaturnaya Gezeta.
Kommunist, Baku, June 6, 1958.
Komsomolskaya Pravda 1954, July 1.
Pravda Vostoka,
December 28, 1957.
March 1956.
January 3, 1956.
June, 1955.
Sovetskaya Kirghizia, November 11, 1955.
Turkmenskaya Iskra, September 21, 1951, January 5, 1956.

The Voice of Islam, May 1955. Communist Decimation Policy—by Isa Yusf Alptakin.
Dawn, March 28, 1959. Upheavals in Central Asia.
Izvestia, November 25, 1954.
The Middle Eastern Journal. 1955, PP. 147—62, 295—300.
Al-Islam, Karachi, February 1958—Soviet influence on Islamic Peoples by Ivar Spector . june 1, 1958—Plight of Islam in Soviet Turkistan by Dr. Bay Mirza.
Hayat. November 5, 1958—Religion in Soviet Russia.
The Students Voice, Karachi, June 30, 1958, Turkistan under Communist Shackles by Muhammad Amin Bugra, (First Deputy GG of Eastern Turkistan and Leader of National Independence Party of Eastern Turkistan).
Soviet News : Vol. 5. November, 1958.
July, 1958
October, 1958.
Charles Ashleigh : Religion in USSR, Hindusthan Standard, Puja Number, Calcutta 1945.
Current History, August 1949, P. 118.
New Times.
Soviet War News.
Soviet Monitor.
International Affairs, July 1948, PP. 380—385, McLean-Sinkiang, Today,
The Asiatic Review, Vol. 24, PP. 273—5 . The Basmachi Movement in Turkistan by Mustafa Chokayev.
Voprosi Istorii : November 1951, Yakunin : The Pokrovsky School of History .
The Russian Review, (Russian Research Centre, Harvard University) October 1950. The Bashkir Liberation Movement by R. E. Pipes.
The Russian Review, January, 1956.
Soviet Nationality Policy by H. Seton-Watson. PP. 3–12. April 1054, Emigre Anti-Soviet Enterprises and Splits by Chamberlain .
The Round Table, December 1952. Soviet Imperialism.
International Affairs, July 1928, The Soviet Muslim Republics in Central Asia.
Pacific Affairs : The Curriculum in Chinese Socialist Education—An official bibliography of Maoism, September 1958. PP. 286— 299,
December 1998 : Soviet Oriental Studies and the Asian Revolution by O. Edmund Glubb.

Soviet Survey : Soviet Cultural Propaganda in the Near and Middle East, London, June-July, 1957.
Problems of Leninism : The Soviet Impact on Central Asia—Richard E. Pipes, Vol. VII. No. 2. March-April 1957.

(ভূমিকা লিখতে যে সব বই এর সাহায্য নেয়া হয়েছে)

V. Yefremov and A. Gabarov': The Land of Soviets-Moslems in the Soviet Union, Moscow, 1959.
Problems of the Peoples of the USSR, No. 1. and 2. League for the Liberation of the Peoples of the USSR, Munich, 1959.
The East Turkic Review : No. 2, 1959, Munich, 1959.
The Russian Review : january, 1956. Soviet Nationality Policy, H. Seton Watsen, PP. 3—12, October 1954, Russian Attitude toward Asia, E. Sakisyanz, April 1954, Emigre Anti-Soviet Enterprise & Split, W. H. Chamberlain.
Emin Bugra : Muslims under Communist and Chinese Domination. Karachi, 1957.
Hans Kohn : Nationality in the Soviet Union, London, 1933.
International Affairs, July 1928, The Soviet Muslim Republic in Central Asia.
W. H. Chamberlain : Soviet Russia, London, 1931. Ch. 13.
Rysakoff : The National Policy of the Soviet Union. London, 1924.
Constitution of the People's Republic of China, Peking, 1954.
Pravda, march 1929. The Anti-Religious Struggle in the School by Anatole Lunacharsky.
D. M. Wallace : Russia, London, 1877, Vol. I.
Kathleen Gibbard : Seviet Russia, London, 1946.
Stephen Graham ; Russia and the World, London, 1917.
Benningsen : Religion in Russia, London, 1940.
John buchan (Ed.) : The Baltic and Caucasian States, London, 1923.
Lawton : The Russian Revolution, London, 1927.
Lenczowski : Russsin and the West in Iran, Cornell, 1909.
Lt-Col. P. T. Ellerton : In the Heart of Asia, Newyork, 1926.
Walter Kolarz : Soviet Russia and Her Colonies, London, 1952.
Olaf Carol : Sovet Empire, London, 1953.
Vambery : Travels in Central Asia, London, 1864.
Joshua Kunitz : Dawn Over Samarkand, Calcutta, 1945.
G. Spasor : Freedom of Religion in the Soviet Union, Moscow, 1954.
Soviet Encyclopedia, Vol. XVIII, 1953.

Gaston Gaillard : The Turks & Europe, London, 1921.
Eudin and North : Soviet Russia and the East, 1920—1927, Tr Saford Univerrity Press, 1957.
J. C. Hurewitz : Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record : 1914—1956, Vol. II, Newyork, 1957.
Survey of International Affairs, London, 1935 (The Islamic Congress—Jerusalem, December, 1931).
Brun : Troublous Times, London, 1930.
Nazarov; Hunted through Central Asia, London, 1932.
Richard Pipes : Moslems of Soviet Central Asia Camp. Mass. 1954.
A. L. Strong : Red Star in Samarkand, Newyork, 1929.
Faizullah Khodaev : Delimitation of National Boundaries in Soviet Central Asia.
Communist International, No. 9. 1925, PP. 73—87
Slavonic and East European Review : No. 21, 1943. PP. 33—38.
Social Research, Newyork, XI, No. 2, May 1944, PP. 168—201.
Allen and Muratoff : Caucasian Battlefields, 1828—1921, Camb. 1953.
Baldwin : Advetures in Transcaucasia and Anatolia (1920—21), London, 1925.
Second Year Book of the League of Nations, January. 1921 to Fev. 6, 1922, Newyork, 1922.
The Caucasian Review, Munich, 1956—59.
Bullentin of the Institute of the Study of the USSR, 1954—1959.
Owen Latlimore : Solution in Asia, London, 1945, P. 90.
The Heart of Asia (Sinkiang).
Kathleen Stahl : British and Soviet Colonial System, Faber & Faber, 1951.
Fazlur Rahman Ansari : The Communist Challenge to Islam, Dorban.
Edgar Snow : Red Star Over China.
Gide & Others : The God That Failed Douglas Hyde : I Believed.
Chravchenks : I Chose Freedom.
Arthur Koestler : Darkness at Noon.
Soviet Survey : London, June-July 1957 (Soviet Cultural Propaganda in the Near & Middle East).
Richard E. Pipes : The Soviet Impac on Central Asia- Problems of Communism, Vol. VI, No. 2. March-April, 1957.
Richard E. Pipes : The Formation of the Soviet Union, Harvard University Press, 1954.

G. N. Schuster : Religion Behind the Iron Curtain, Newyork, 1954.

Dinko Tomasic ; The Impact of Russian Culture in Soviet Communism, Free Press 1953.

Alexander G. Part (1917 — 1927) : Bolshevism in Turkistan, Columbia University Press, Newyork 1958.

Gurian : Soviet Imperialism, Notre Dam, 1953.

Dallin : The Changing World of Soviet Russian, Yale University Press 1956.

Pacific Affairs : September 1958. The Curriculum in Chinese Socialist Education (Maoism) 286—299.

Klaus Mehnert : Stalin vs, Marx, London, 1952.

Barnabas : Christian Witness in Communist China, London, 1951.

Rehwinkel : Communism and the Church, Missouri, 1948.

Religious Freedom in the Rummanian People's Republic, Bucharest, 1953.

Schlesinger : Marx, his time and ours, London. 1950.

Marx-Engels Correspondence, London 1846—1895, London, 1945.

Uralov : The Reign of Stalin (Tr. by L. J. Smith), London, 1943.

Pacific Affairs : Soviet Oriental Studies and the Asian Revolution, December, 1958.

E. R. Christie : Through Khiva to Golden Samarkand, London, 1925.

The Proceedings of the Conference of the Institute forth Study of the History and Culture of the USSR, Newyork, March, 1953.

The Aims and Methods of the Research of the USSR, Munich, 1953.